টানা-পোড়েন

সমরেশ বসু

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬১

মুদ্রাকর
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

'ক'ড়ে বউমা, অ ক'ড়ে বউমা, ছুটি বুট কলাই ভিজা দিবেক নাই কি গ? অ ক'ড়ে বউমা।' জগত বুড়ো শিশুর মতো আবদারের স্বরে, ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে। ঘরের দাওয়া বলতে কিছু নেই। খড়ের চালের ছায়ায়, মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। দাঁত নেই। কালো রঙ করা তসরের সুতোর দলার মতো গাল চোপসানো, ঠোটের ফাঁক দিয়ে, লাল জিভ থেকে থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠোঁটের কষে লালা গড়ায়, তা-ই চেটে চেটে নিয়ে জিভটা মুখের ভিতরে টেনে নিচ্ছে। মুখের গহ্বরে জিভটা যেন দলা পাকিয়ে পড়ে থাকছে, কাঁপছে মাঝে মাঝে। সামনে তার কেউ নেই। সামনের দিকে তাকিয়ে, ঘষা কাঁচের মতো চোখ জোড়া অপলক। আসলে সে চোখে দেখতে পায় না। একেবারেই দেখতে পায় না, এমন না। বছর দুয়েক আগে ডান চোখের ছানি ছিলানো হয়েছিল। কাল করেছিল চশমা। ছানি কাটা চোখে সবই দেখতো রোদ ঝলকানো জলের মতো ঝকঝকে। মাথা ভিরমি যেতো। আর বাঁ চোখের কাঁচের ভিতর দিয়ে সবই দেখাতো কিম্ভুত, বিরাট, ঢেউ খেলানো। বুঝ হে ব্যাপার! চোখের ছানি ছিলানো আর চশমা নেবার কী তামাশা। ছোটখাটো নাতী-নাতনী-গুলোকে দেখাতো দৈত্যাকৃতি। কাছ দিয়ে ঘুরে গেলে মনে হতো, হেলে বলদ ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে। গাছের দিকে তাকালে দেখা যেতো, চোখের সামনে আকাশ জোড়া মেঘের চাংড়া নেমে আসছে। ক্যানে? জগত তো নলি না পরিয়ে কখনো চরকা ঘুরায়নি? নলি পাকাবার চরকা মিছিমিছি ঘোরালে, ক্ষয় ক্ষতি গণ্ডগোল হয়।

ঘোবাতে নেই। জগত কখনো ঘোবায়নি। তাঁতীব ব্যাটা তাঁতী সে, মায়েব পেট থেকে পড়েই ও সব বিধিনিষেধ জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁতী ঘবেব সকলেবই জানা হয়ে যায়।

তবে? বুড়ো বয়সে এক চোখেব ছানি ছিলিয়ে, দুচোখে ভোজ-বাজী! বইল তুমাব চশমা। জগত কীতেব কাঁচেব ঠুলিব দবকাব নেই। সেই যে চোখ থেকে চশমা খুলে কুলুঙ্গিতে বেখেছিল, আব কখনো হাতে কবেনি। এখন সবই ঝাপসা, সময়ে চোখ ধাধানো ঝলক। তবু মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায়, কুকুবকে কুকুব। গাছকে গাছ, আকাশকে আকাশ। এখন আব তাব কাজ কিছু নেই। নেই বলতে, কবতে পাবে না, কিন্তু তাঁতেব সামনে বসলে টানা ভবনা, জমি-পাড-আঁচল-বুটি, সবই অস্পষ্ট চোখে পডে। যেমন এখন চোখে পডছে, চটা পাখীগুলো তাব সামনে এসে বসছে, আবাব ফুড়ুৎ কবে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। তখনই হয়তো কাবোকে দেখা যাচ্ছে, সামনে দিয়ে চলে যায়। কেউ একজন যায় বলেই, চড়াইপাখীগুলো ভয়ে ওড়ে। কেউ একজন মানেই, জগত বুড়োর ধাবণা, পাঁচুব বউ। পাঁচুব বউকে বিয়েব পব থেকেই সে ক'ডে বউমা বলে ডেকে আসছে। ছোট ছেলে পঞ্চাননেব বউ, ছোট বউ। ক'ডে বউমা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, ক'ড়ে বউমা মনে হলেই, ক্ষুধার্ত অসহায় শিশুব মতো ডাকছে, 'ক'ডে বউমা, হা শুন গ, অ ক'ডে বউমা, দুটি বুট কলাই ভিজা দিবেক নাই কি গ? সিনান বেলা হয়ে গেল যে।'

জগতেব খালি গা, পুবনো কালো ফিতা পাড় কোঁচকানো তসরের মতো গা। পুরনো হলেও, খাঁটি তসবে যেমন একটা জেল্লা থাকে, তাব বুড়ো রেখায় সে বকম জেল্লা। ভুরুতে চুল প্রায় নেই। মাথায় সাদা ধবধবে ছোট নরম চুল। কালো ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্যে জিভটা বড়

বেশি লাল দেখায়। কয়েকদিনের না-কামানো সাদা খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি ভরা মুখ। তার সামনে খোলা জায়গায় রোদের বুকে ছায়া দুটো দেখে সে চিনতে পারে, দুটো বনা। পাখী দুটো উড়ে এসে বসে, আবার তৎক্ষণাৎ উড়ে চলে যাবার আগে একটা হুঁশিয়ারি ডাক দিয়ে যায়। বাড়ির ভিতর দিক থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। সেই জন্যই শালিক দুটো উড়ে গেল। জগত ডাকলো, 'কে, ক'ড়ে বউ মা? দুটি বুট কলাই ভিজা—।'

ঠিনঠিনিয়ে কাঁচের চুড়ি বেজে ওঠে, তার সঙ্গে আতর তেলের গন্ধ। জগত চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করল, কপালে ভাঁজ পড়লো অনেকগুলো। রোদে চোখ ধাঁধালেও চিনতে পারলো, গজুর বড় বিটি। আজকাল এই রকমটি হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিলে, কোল জোড়া ছেলে থাকতো। বিয়ে হয়নি, তো শাড়িও গায়ে ওঠেনি। গা কোমর ঢাকা, হাঁটুর ওপর অবধি জামা। একে বলে ফরক। এই-রকমটি এখন ঘরে ঘরে। গজাননের দোষ কী? দোষ কারো না। গজানন তার বড় ছেলে, পঞ্চানন সব থেকে ছোট। মাঝখানে চার বিটি। বড় বিটির শ্বশুরঘর মেদিনীপুরের গড়বেতায়। মেজোটির বাঁকুড়ার ছাতনায়, সেজোটির সোনামুখী, ছোটটির বিষ্ণুপুরের মধ্যেই, কিষ্টগঞ্জে। সব মেয়েরই বিয়ে হয়েছে বটে তাঁতী ঘরে। এদানি তো আবার ইদিক উদিকও হচ্ছে। ঘরে বরে বিটি কুলে মিলমিশ থাকে না। তাঁতীর বিটি বামুনের সঙ্গ নেয়, আগুরির বিটি চলে যায় পোদের ঘরে। লোহার কাহারে ভেদাভেদ থাকে না। ক্যানে? না, মন করেছে। ও গুলানকে বিয়ে বলে কী না, জগত জানে না। মন করা আর বিয়ে করায় ফারাক নাই কী?

কিন্তু জগতের সব মেয়েরই বিয়ে হয়েছে জাতের ঘরে। দুই

ছেলেরও। তবে গড়বেতায় আর ছাতনায় কুটুমবাড়িতে তাঁত নেই। জাত ব্যবসা উঠে গিয়েছে অনেককাল আগেই। জমিজিরেত চাষবাস, তার সঙ্গে ছোটখাটো দোকানদারি। এক জামাইয়ের মনোহারী, আর এক জামাইয়ের মুদী দোকান। জমির আয়ে চললে কেউ দোকানদারিতে যায় না। দোকানদারিও যদি তেমন রমরমা গদিঘর হতো, তার একটা কথা ছিল। না, সে-সব নেই। দোকানদারির ছিরি হল টিমটিমে ঝিমঝিমে। টানায় বিস্তর ফাঁক, ভরনায়-পোড়েনেও আঁট নেই। অমন কাপড়ের বাইরে নজরকাড়া ঠাট থাকতে পারে, টেনে মেলে ধরলে জাল। না এদিক, না ওদিক। বড় আর মেজো মেয়ের সংসারের জমিন মোটে খাপি না।

খাপি জমিনের সংসার কি তবে সোনামুখী আর কিষ্টগঞ্জের বিটিদের ঘরে? হুঁ, উয়াদের ঘরকে দুই জোড়া তাঁত আছে। কিন্তু তাঁতীর সংসারে কে কবে খাপি জমিনের মতো ঘর দেখেছে! টানায় বাঁধে, ভরনায় মারে, মজুরি ছাড়া কোনো স্বত্ব তার নেই। তবে অই বল ক্যানে, তাঁতীর ঘর তো বটে! উয়াতেই জগতের মনের শান্তি।

অশান্তি এই লাতীন। এক লাতীন না, সব লাতীন। সকলেরই দেখ, ওই এক ফরক। কী বা পাঁচুর বিটি আর কী বা গজুর বিটি। ইদারার ধারে, রোদে দাঁড়িয়ে থাকা গজুর বিটির দিকে তাকিয়ে যতোই চোখ ধাঁধিয়ে যাক, জগতের ঘষা চোখের ঝাপসা নজরে সবই একরকমের স্পষ্ট। হাঁটু থেকে পায়ের গোছা দেখ, উদিকে কোমরের ফাঁদ, জামা আঁটা বুকে রোদ চলকানো জলের ঢেউ। মাথার দুপাশে দুই বিনুনি। বংশের ধারাটিও দেখতে হবে। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কতখানি! লাতীনের বয়সও কিছু অজানা নেই জগতের। টানার ঘর-গোনা সুতোর মতো, এখনো সব হিসাব আঙুলের ডগায়। এই

বয়সে গজুর মা যখন চরকা কাটতে কাটতে বা তাঁতের সামনে জল মুড়ি দিয়ে পিছন ফিরে চলে যেতো, জগতের জোয়ান বুকে খটখটির মাকু চলতো, রক্তে লাগতো রেশমী সুতোর ঝলক। সোহাগে স্নেহে বিগলিত প্রাণ, মনে মনে বলতো 'অই, কি গতর গ মাগীর!' লাতীনের এই বয়সে ওর বাপ আর বড় পিসীর জন্ম হয়ে গিয়েছে। পেটে আর একটা আসবো আসবো করছে। তাও ইটি গজুর বড় মেয়ে না, মেজো। ষোল ছাড়াই ছাড়াই। যেমন তেমন একখানি শাড়ি জড়ালে কেমন লখুমায়ীর মতো দেখাতো! গায়ের রঙটিও মাজা মাজা, নাক চোখ মুখ কিছু একেবারে পাচপাঁচি না।

জগতের কান খাড়া হলো। লাতীনের হাতে বেলোয়ারি চুড়ি বাজলো ঝিনিঝিনি, না কি হাসির ঠিনিঠিনি বুঝতে পারলো না। শুনতে পেল তার চটুল স্বর, 'ক্যানে?'

'সদরে দাঁড়িয়ে রইচ তাই জিগেস করছি।' বিটাছেলের গলা। রাস্তার ওপারে হরির ঘরের খটখটি তাঁতের খটখট শব্দের মধ্যে, জোয়ান পুরুষের স্বর স্পষ্ট শোনা গেল!

জগত চোখ তুলে তাকালো। জিভটা লটকিয়ে পড়লো লাল হড়কানো ঠোঁটের বাইরে। হুঁ, রাস্তার এধারে বড় ছায়া, বড় চেহারা। মাথায় কাল ঝোপসা চুল। হিলহিলে খালি গা, রোদে ঝলক দিচ্ছে। পরনে লুঙ্গি, কোমরের পাছা সাপটে গামছা বাঁধা। কে, কার বিটা? তাঁতী, না বামুন, না সদগোপ, না আগুরি?

'এখন ক্যানে যাব?' আবার হাসি বাজালো লাতীনের স্বর, 'তুমার এখন সিনান বেলা, আমার হয় নাই। ভাইকে পাঠিয়েছি দুকানকে, আসে কী না দেখতে আঁইচি।' কথার সঙ্গে সঙ্গে জগত দেখলো, লাতীন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটুর ওপর ছড়ানো

জামায় পচি বাতাসের ঝটকা। বুকে রোদ চলকানো জলের ঢেউ। জগতের বুকে ঢাক বেজে ওঠে। এ ঢাক শ্মশানকালীর বুক-কাঁপানো দগর। জোয়ান বিটার স্বর শোনা গেল, 'তুমার সিনানবেলাতক যমুনার জল থেক্যা উঠব নাই।' অহ হে, হাড়িকাঠ মেমায়, না ছাগল মেমায়? কে কাকে খেতে চায়? লাতীনের শরীর কি বাতাসে কাঁপে? বলে, 'ইস'। তারপরেই হঠাৎ হরির ঘরের খটখটি বন্ধ, মজা হাঁকড়ানো স্বর ভেসে এলো, 'অ্যাই, অ্যাই ক্যাল্লাইটা কী এত বুলছিস র‍্যা, অ্যাঁ'; এই কথার শেষ হতে না হতেই, যেন পিয়ারডোবার জঙ্গলের ময়না শিস্ দিয়ে উঠলো কোথা থেকে। জগত কিছু বুঝে ওঠার আগেই, রাস্তার ধার থেকে বড় ছায়াটা দোড় দিল। যাবার আগে বলে গেল, 'অ ফুড়কি, তুমার ভাই লয় বাপ খাইচে।' ফুড়কি —জগতের লাতীনেরও পায়ে ঘোড়ার দৌড়। পিছন ফিরেই, কাঁচের চুড়িতে ঠিনঠিনিয়ে আওয়াজ তুলে বাড়ির ভিতরে ফুড়ুত্। হরির খটখটি তাঁতের খটখট শব্দের সঙ্গে, তার কলসী ওলটানো বগবগে হাসি ভেসে এলো।

ক্যাল্লাই? কেন্নো আবার কারো নাম হয় নাকি? জগতের বুকে তখনো ঢাক পিটছে, কিন্তু ভাবনা দিশাহারা। জিজ্ঞেস করলেও হরি জবাব দেবে না। কেউ তার কথার জবাব দেয় না, পাঁচু, ক'ড়ে বউমা, আর উয়াদিগের ছেলেমেয়েরা ছাড়া। ঘরের কোলে ঘর, তার পিঠে ঘর। বিঘেখানেক জুড়ে, জগতের তিন ভাইয়ের বিটা বউ লাতী লাতীন নিয়ে। খড়ের চাল আর মাটির খোপে খোপে, এক কুড়ি মানুষের ওপর বাস। একপাশে আকন্দ আর বেড়াগাছের জঙ্গল ঘেরা পচা-গোড়া। নোংরা জলের ডোবা যাকে বলে। বুড়া বাচ্চা বউ বিটিদের ঘাট যাওয়ার জায়গা। শহরের মধ্যখানে হলেও, পায়খানা বলতে

পচাগোড়ার জংলা পাড়। তবু এই খোপে খোপেই তাঁত ভাত পাত জন্ম মৃত্যু বিয়ে ভুজনা যাবতীয়। তবে কী না, বড়র দল সবাই যমুনা বাঁধে যায়। সেখানেই ঘাট যাওয়া, সেখানেই সিনান। কিন্তু জগতের সঙ্গে কেউ কথা বলে না, বলার দরকার মনে করে না। জগত এখন বাতিল। জগতের বাকি দু ভাই বেঁচে থাকলে, তারাও বাতিল হতো। জগত বাতিল হলেও, পাঁচুর কাছে না। সে এখন ছোট ছেলের পুষ্যি। এই বড় আনন্দ, বুড়ো বয়সে এই বড় সুখ, তার চাইতেও বেশি, জগত কাঁতের বড় গবব, বিষ্টুপুরের পঞ্চানন কাঁত তার বিটা, তাতীর সেরা তাঁতী। এমন বাদশাহী আমলের নকশাদার বেনারসেও মিলবেক নাই। খবর লাও যেয়ে ক্যানে, দিল্লি বোমবাই কলকাতায়। বিষ্টুপুরের ঈশ্বরদাস মারোয়াড়ির গদিতে পাঁচুর ফটো ঝোলে দেওয়ালে। বড় ছেলে গজানন খটখটি তাঁতী, ও সব রেশনের থান বোনে। মাঝে মধ্যে আলপাকার কাজ করে পরের নকশা নিয়ে. না তো ছোট ভুজনা। মামা ভাত খাবার ছোট কাপড়। সবই নকল আর ঝুটা রেশমের। জগতও তাই ছিল, উ কুন কথা লয়। কিন্তু গজানন বুড়া বাপকে ঘরের দাওয়া থেকে নামিয়েই খালাস না। বাপ বলে ডাকে না, বাপ ডাকলে জবাব করে না। দুটো ভালো কথা বলতে গেলে, খিঁচিয়ে তেড়ে আসে। বাপ না, যেন শত্রু। ক্যানে?

বোঝে, জগত বোঝে। সব কিছুর মূলে পাঁচু—নাম যার পঞ্চানন কাঁত। জগত কাঁতের ছোট বিটা। সে কেন এত গুণী? তার কেন এত নাম? সে কেন বাপকে পোষে? সকল তাঁতীর এক মহাজন, খাদি রেশম সেবা সদনের মহারথী ঈশ্বরদাস দেওড়া বাবু কেন এত খাতির করে? কেন বা পাঁচুই অভয় খান ওস্তাদের সব থেকে বড় চ্যালা? পাঁচু কেন হেসে বলে? দশজনের সঙ্গে বোতল নিয়ে বসে হৈ হৈ

করে ? তার ওপরে আরও বৃত্তান্ত—মূল বৃত্তান্ত, কেন হু পয়সা কামায় বেশি ? হুঁ, এক বাপের বীজে জন্ম বটে, তবু গজাননের আঁতে পোড়ানি। পাঁচুর দোষে বাপ চক্ষুশূল। বড় বউ লাতী লাতীনদেরও তাই-ই, জগত উয়াদের চরকার কিচকিচ, ইস্পাতের নলির মরচে ফাঁদালির জট, লাটায়ের ভার। জগতের সঙ্গে তারাও কথা বলে না।

জগত তবু তার ঘষা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে ঝকঝকে রোদের দিকে। গজাননের আসার অপেক্ষা করে। না, ফুড়কির কথা সে গজুকে বলবে না। হিতে বিপরীত হবে! 'আমার বিটির সঙ্গে কার গজর লেগেছে উতে তুমার কী হে বুড়া ?' জগতের শোনবার দরকার নেই। না শুনেও সে গজুর ব্যাতের কথা আন্দাজ করতে পারে। তা বটে, ফুড়কি যদি কারো সঙ্গে পীরিত করে, জগতের কিছু বটে, কিন্তু সে কিছু বলতে পারবে না। তবু বড় কৌতূহল জগতের, গজু কি ফুড়কির গজর দেখতে পেয়েছে ? দেখে কি তার রাগ হয়েছে ? সে কি হুমকিয়ে আসছে ? যদি আসে, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলবে না তো ? মাথাখানিও যে তপ্ত খোলা। চোটপাট লেগেই আছে। পাড়ার লোকের সঙ্গেও বিশেষ বনিবনা নেই। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে তো নেই-ই। এমনিতেই তো নাকি কথায় কথায়, বড় বড় ছেলে মেয়ের গায়ে লাটাই চরকা ভাঙে।

জগতের চোখের ওপর দিয়ে রাস্তার ঝলকানো রোদে অনেক ডাগর মাঝারি ছোট ছায়ারা এলো গেল, গজু এলো না। ক্যানে ? লুঙ্গি পরা হিলহিলে শরীর ছোঁড়াটা ফুড়কিকে ভাঁওতা দিয়ে গেল নাকি ? এমনও কি হয় ? জগতের হাসি পেল। মুখের ভিতর দলা পাকানো জিভটা কাঁপতে লাগল। বয়সকালে গজর করার ঝোঁক কোন বিটা ছেলের না চাপে ? নাঙিন করা এক কথা, পীরিত আর

এক। বিয়ে হলে, বউ থাকলেই নাঙিন করা হয়। তার আগে গজর। উঠতি বয়সে, এদিক ওদিকে একটু নজর করা, বিশেষ করে, বাউরিপাড়ায় গিয়ে চেলা আর মূলা মদে গলা ভিজিয়ে, বাউরি মেয়ের শিয়রচাঁদা সাপিনীর মতো রঙ করা দেখলে, কোন শালার মনে না ছোপ লাগে? জগতের লাগেনি? কেবল লাগেনি, পাকা রঙের রেশমের মতো মোক্ষম লেগেছিল। যে সে বাউরির বউ না, অঘোর বাউরির বউ। তার বউ যদি শিয়রচাঁদা সাপিনী তবে সে চন্দ্রবোড়া সাপা। চন্দ্রবোড়া হলো মরদ সাপ, সে কখনো মেয়ে হয় না। শিয়রচাঁদা যেমন শুধুই সাপিনী।

জগত এখন আর মনে করতে পারে না, অঘোর বাউরির বউ বেস্পতি তার সঙ্গে প্রকৃত গজর করেছিল কী না। তবে উয়ার হাতের চেলা-মূলার জুড়ি ছিল না বাউরিপাড়ায়। চালের মদ চেলা, মূলের মদ মূলা—গুড় দিয়ে যা তৈরি হয়। হাতের গুণ না ঝাড় ফুঁক কে জানে? না হয় তো বা বেস্পতির ঠোঁটের হাসি, চোখের ঝিলিক, কোমরের মোচড় খাওয়া দেখেই মনে হতো, অমন দব্য আর কারো হাতে হয় না। তাঁত চালাতে চালাতে হঠাৎ হঠাৎ, সময় নেই অসময় নেই, সুতো ছেঁড়া মাকুর মতো বাউরিপাড়ায় চলে যেতো কেন? চেলা-মূলার টানে, না অঘোরের বউয়ের টানে? অথচ মদ খেয়ে, সারা গায়ে মাটি মাখা বরাহের মতো অঘোরকে পড়ে থাকতে দেখলে জগত তাঁতীর বুক কেঁপে উঠতো। শিয়রচাঁদা সাপিনীটা যতোই কালো চোখের তারায় হেনে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরুক, জগতের প্রাণে স্বস্তি থাকতো না। জ্বলন্ত লোহার শিক ফুঁড়ে অঘোরের শুয়োর মারার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতো। সেই সঙ্গে, মাঝে মাঝে অঘোরের ক্ষ্যাপা ধমক, ‘শালা আমার সঙ্গে লাগতে

আইচু, ত বরা মারা করে দিব।' তবে হঁ, ই কথা মানতে হবেক, অঘোর তাব সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলেনি। হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। এমন নয় যে, ঘরেব পাশে আকড় গাছের নীচে বসিয়ে রেখেছে। অঘোরের ঘরের খদ্দেরদের সবাইকে সেই গাছতলাতেই বসতে হতো।

কিন্তু গজব? অঘোবের বউ বেস্পতির সঙ্গে পীবিত, তা কি কেবলই চেলা-মূলার নেশা? মাঝে মধ্যে, অঘোর যখন ঘবে না থাকতো, তখন? জগতের কালো রঙ তসবেব সুতো দলা শরীরে ঘাম দেখা দিল। হা মুখেব বাইরে লটকিয়ে পড়লো লাল জিভ। অই হে, মরণ হাত রেখেছে শরীরে, তবু শিয়রচাঁদা সাপিনীর ঘামে ভেজা জোড়া বুকের আঁট সাঁট ছোঁয়া এখনো রক্তে দাপায়। তার নখেব দাগ প্রাণে, দাঁতের দংশন ব্রহ্মতালুতে বিষের ক্রিয়া। হা, এই গতরে কি মরণ ধরে নাই গ!

'কে?' জগত যেন ভয়ে চমকিয়ে উঠলো। হাঁটুর ওপর দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বাঁ হাতটা ঝাড়া দিল, যেন ঝটকা দিয়ে বেস্পতিকে মুক্ত করতে চাইল। রাস্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে দেখলো, বনা পাখী দুটো আবার সামনে এসে বসেছে। ক্যানে? এই শুকনো শক্ত মাটিতে, শালিক দুটো বারে বারে ঘুরে ফিরে এসে বসছে কেন? জল কাদা থাকলে পোকা মাকড় থাকতে পারতো। তাও আবার দেখ, ভয় চিত প্রাণী দুটো জগতের কাছেই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আর তার মুখেব দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। ক্যানে? জগতের কাছকে কী আছে? পোকা? হঁ, পোকা থাকতে পারে জগতের গায়ে। জরা তাকে গিলেছে, মরণ ঘিরেছে। এখন তার ছেঁড়া সুতোয় কেবলই বেহিসাবী টানা, ভরনা বলে কিছু নেই,

সব পোড়েন শেষ। তবু, এই পচাগোড়া শরীরের গভীরে বেস্পতি এমন জ্যান্ত উদবেড়ালের মতো জেগে ওঠে কেমন করে? সে তো কবেই মরেছে। কিন্তু অই, যে-কারণে গজুবের কথা মনে এলো। ফুড়কিকে কি ছোঁড়াটা ভাঁওতা দিয়ে গেল? গজু তো এলো না? এমন ভাঁওতা জগত কোনোদিন দিতে পারেনি। এদানি কী হালচাল এমন, যার সাথে পিরীত, তাকেও ভাঁওতা দেয়?

পাখী দুটো হঠাৎ আবার উড়ে গেল। বাড়ির ভিতর দিক থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো। জগত ডাকলো, 'কে, ক'ড়ে বউমা, দুটি বুট কলাই ভিজা— ।'

জগতের কথা শেষ হবার আগেই, ঘরের ভিতর থেকে ছোট ছেলের চিৎকার ভেসে এলো, 'অই গ কত্তা দাদা, সেই কুন সকালে মা তুমাকে বুট কলাই ভিজা দিয়েছে, আর তুমি খালি ব্যাজার করছ।'

জগত মাটির দেওয়ালে আরও চেপে বসে। ইদারার ধারে আঁশফল গাছটার দিকে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু চোখের সামনে ভাসতে থাকে পাঁচুর ছোট ছেলে নোটোর মুখটা। তাঁত-ঘর থেকে নোটোর বিরক্ত স্বরের চিৎকারই ভেসে এলো। ক'ড়ে বউমা ছোলা ভেজা অনেক আগেই দিয়ে গিয়েছে? জগতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে? সে মুখের ভিতর জিভটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করলো। না, ভিজা বুট কলাইয়ের একটা খোসাও জিভে আটকাচ্ছে না। দুই কষের অবশিষ্ট দুটো দাঁতের গোড়ার ফাঁকে কোথাও একটা ছোলাও পড়ে নেই। কিন্তু নাতী নোটো তো মিথ্যা বলবে না। সে মিথ্যা বললে, ঘরে পাঁচু রয়েছে, আরও দুটো লাতী লাতীন পুনি আর সোনা রয়েছে। সবাই নোটোর চিৎকারে হৈ-হৈ করে উঠতো। নিদেন পাঁচুর ধমক শোনা যেতোই। তবে? ঘুম ভেঙে প্রথমে ঘরের বার। বাইরে এসে রোজ

এইখানটিতে, পাঁচুর তাঁত-ঘবেব দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসা। তারপরে ক'ড়ে বউমার হাত থেকে এক ঘটি জল, বাটিতে এক মুঠো বুট কলাই ভিজা। মুখ কুলকুচো করে আগে ঢকঢক জল খাওয়া, তারপরে বুট কলাই ভিজা চিবানো। জগতেব এখন আর চিবানো নেই, মাড়ি দিয়ে পাকলানো। কিন্তু কখন জল খেল, কখন বুট কলাই ভিজা, কিছুই মনে নেই। হুঁ, জগতের টানার ঘবে সুতোর মতো হিসাবে ভুল নেই, অথচ আজকাল প্রায়ই খেলে ভুলে যায়। নাইলে মনে থাকে না। ক্যানে? ভিতরের হিসাব ঠিক থাকে, বাইরের হিসাব মেলে না।

পাঁচু কাঠের পিঁড়িব ওপর কাগজে নকশা আঁকতে আঁকতে, মাটিব দেওয়ালের চৌকো ফোকর দিয়ে একবার বাইরে তাকালো। ফোকরটা হাতখানেক লম্বা চওড়া, ঘরের একদিকে জানালা। বৃষ্টি বাদলার ছাট আটকাবার মতো দুটো পাল্লাও আছে, নেই কোনো গবাদ। ফোকবের চৌকো আকাশের গায়ে, তাঁতী নিতাই দাসের খড়ের চাল আর সজনে গাছেব একটি ডালের অংশ চোখে পড়ে। পাঁচু বাইরে তাকিয়ে, আর নিজের খালি গায়ে লাগা তাত দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলো, ঘড়ির বেলা কতো হলো। আন্দাজ করলো, সকাল সাতটা বেজে গিয়েছে। সে চোখ নামিয়ে পাশে রাখা এলুমিনিয়ামের বাটিতে রাখা বুট কলাই ভিজা দেখলো। বউ এক ঘটি ঠাণ্ডা জল আর ছোলা ভিজানো দিয়েছে অনেকক্ষণ। খাওয়া হয়নি। সে পিছন ফিরে কিছু বলবে, এমন ভাবে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে পিঁড়িতে রাখা নকশার কাগজের দিকে নজর পড়ে গেল। 'আই শালা, দেখেছু?' মনে মনে বললো। তাড়াতাড়ি পেন্সিলের দাগ ঘষা রবার তুলে পিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ঘরের দুপাশে দুটো তাঁত। দুটোর সঙ্গেই, মাথার ওপরে জেকার্ড মেসিন লাগানো। জেকার্ড মেসিন মানেই, নকশার কাজ। ঘরে ঢোকবার মুখে, প্রথম তাঁতের সঙ্গে খাচান দড়ি বাঁধা। খাচান দড়ির সঙ্গে, থাকে থাকে সাজানো ঝোলানো জালি পাটা। জালি পাটার ইংরেজি নাম পাঞ্চিংকার্ড। পিস-বোর্ডের পাটা, তার গায়ে অজস্র ফুটো। ফুটোগুলোই আসল নকশা। হাতে আঁকা মূল নকশা থেকে, জালি পাটায় বিঁধ বিঁধিয়ে, নকশা তোলা আর সেই জালি পাটার সঙ্গে খাচান দড়িতে, হিসাব মত ছুঁচ লাগানো। ছুঁচের ছিদ্র পিতলের মৌরীর ভিতর দিয়ে রঙীন রেশমের আনাগোনা। মাঝখানের খাচান দড়ির ছুঁচ যদি বারো আনা ওজনের, তবে দু পাশের ছুঁচের ওজন আড়াই ভরি। মাঝখানের খাচান দড়িব কাজ আঁচলের নকশায় আর জমিনের বুটিতে। দু পাশের খাচান দড়ি আর ভারি ছুঁচের কাজ পাড় তৈরির। খাচান দড়ি, জালি পাটা, ছুঁচ মৌরি, জেকার্ড মেসিনের সঙ্গে এই তিনে মিলে প্রথম বন্ধন বালুচরীর।

বালুচরী না বালুচর? যা-ই বলো, নকশাদার বা তাঁতীর এত ঈ-কার উ-কার নেই। শাড়ির নাম বালুচর। ক্যানে? বালুচরে রোদের ঝিলিক, নানা রঙের খেলা? আর সেই খেলাতে হাওয়ার ঝাপটায় নানান নকশার চোখ জুড়ানো ছবি? যেমন কী না তুমার বাগ-বাগিচায় ভূঁয়ে ফাঁকায় জমিন ভরা রঙ বেরঙের ফুলের ছড়াছড়ি, বুটি ছড়ানো জেল্লায়? কে জানে? উয়ার জবাব জানা নাই হে। শাড়ির নাম বালুচর। বা বলো বালুচরী। বালুচরের নামেই স্বপ্ন, দূরের রহস্য সাগরের ঢেউ গাঙের জোয়ারে উপছানো, ডানা মেলা হাঁসের অবতরণ, বিদেশী পাখীপাখালির মহোৎসবের জটলা। বিষ্টুপুরের কাছখানকে যদি নজর করো, তবে কাঁসাই শিলাই যশোদা, বিঁড়াইয়ের ধু-ধু চরে

শাদা বকের ভোজন মেলা কাশবনের মাথা দোলানো উদমা খেলা। যেন আকাশের নীচে স্বপ্নময় এক দূরান্তরে মিলিয়ে যাওয়া বালুচর। বালুচরী শাড়িও এক স্বপ্ন, স্বপ্নে পাওয়া। কবে ক্যানে কে উয়ার নাম রেখেছিল বালুচরী, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু অই হে, ই ভেব নাই কি যে বিষ্টুপুরের তাঁতীর ঘরে, তিনশো বছরের বাদশাহী আমলের ভূত তাঁতে জড়িয়ে আছে! ইয়ার জাত গোষ্টি কোষ্টি নাড়ি নক্ষত্র মিলিয়ে দেখ, তুমাদিগের ভোট কাড়ানি সরকারের দেশে, বাদশাহী আমল কেমন ঝলক দিচ্ছে। তবে হ্যাঁ, বাদশাহী আমলে এখনকার মতো জেকার্ড মেসিন ছিল না। তখন ছিল ওপরে জাঁক, নীচে পাখী। তার নাম জালা পদ্ধতি। সুপারির মাঝখানে ছিদ্র করে, তার মধ্যে রেশম পরিয়ে নকশা করা হতো আর নকশার হিসাব ফুটে উঠতো শিকলানে। তবে হুঁ, লরাজে তখনো ছিল, এখনো আছে। একটা লরাজে সুতো গোটানো থাকতো, ওটা হলো টানা। সেই টানার সঙ্গেই থাকতো ছুঁচ কাটি, সুপারির সঙ্গে সুতোর গায়ে থাকতো খাচান দড়ি, দড়ির গায়ে মৌরি—যাকে বলে ছুঁচের ফুটো। তার সঙ্গে মোটা তারের ছুঁচ-কাটির ওজন রেখে, বুনটের সমতা রাখা হতো। কাজ বড় ভজকট। একখানি শাড়ি বুনতে কয়েক মাসের ধাক্কা। যে-লরাজে সুতো গোটানো টানা, তার থেকে আর এক লরাজে আঁচলা জমিন বুটি পাড, সব মিলিয়ে দিনে দিনে একখানি শাড়ি বুনে তুলতে কয়েক মাস। শাড়ি বোনা লরাজেটা তাঁতীর পেটের কাছে চেপে থাকে। থাকতে থাকতে পেটে কালো দাগ পড়ে যায়। তাঁতী যদি চিনতে হয়, পেটের দিকে তাকিয়ে দেখবে। উয়ার মন-কাড়ানো কাজ আর মুখের অন্নের দাগ, আকাশের ছায়াপথের মতো পেটে আঁকা পড়ে আছে।

থাকতো বাদশাহী আমলেও, থাকে এখনো। খালি গা পাঁচুর পেটেও তেমনি কালো দাগ। ক্যানে? না, জেকার্ড আসুক, আর জালি পাটাই আসুক তাঁতের লম্বা আব ভারি কাঠের লরাজের কোনো বদল হয়নি।

বদল একমাত্র জেকার্ড মেসিন। বাদশাহী আমলে এক শাড়িতেই কয়েক মাস। বছরে তুখানা বুনতে পারলে তো অনেক হলো। তাও নাকি হয়ে উঠতো না। এসব হলো শোনা কথা। এ তো আর কাঠেব মাকুব খটখটি তাঁতেব কাজ না। যেমন তেমন থান গামছা সুতি কাপড় বোনা না। হাতে কবে বালুচরী শাড়ি বোনা, জাক পাখী জালা কবে, সুপাবিব ছিদ্রে সুতো টেনে নকশা তোলা, আর সদর মফস্বল করা সহজ কথা ছিল না। তখন জালা করা বালুচরীর নকশার উলটো সোজা ছিল। সোজাব নাম সদর, উলটোর নাম মফস্বল। দুটো শাড়ি বুনতে এক বছবের বেশি সময় লাগতেই পারে।

তবে হঁ, ই হলো শুধুই বানিদারের কথা। তাঁতে বসে যে শাড়ি বোনে, তাব নাম বানিদাব। তাঁতে বসাব আগেও বানিদারের বিস্তর কাজ। কেবল এই না কি যে, পাবড়োবাব পাষাণলড়িতে পা রেখে কাঁটা টিপে টিপে ব-দড়ি তুললে, জেকার্ডের দু দিকেব দুই ঢেঁকিতে পা চেপে দিলে খাচান দড়িতে টান লেগে আওয়াজ হলো ক্যাঁচ, ঝট, আর ভরনায় মাকু গলিয়ে দিয়ে, দক্তি টেনে জমিনের আঁট বুনে দিলে, তা হলেই বানিদারেব কাজ হয়ে গেল। এ কাজ শুধু তাঁতে বসে, বানিদারের গোটা যজ্ঞের অর্ধেক। তাও বানিদার একলা তাঁতে বসে কাজ করতে পারে না। বিশেষ কবে বালুচবীর বৃহৎ আঁচল বোনার সময়। তখন আঙুল সমান ছোট ছোট মাকু গলিয়ে, দু পাশ থেকে নকশা তোলা হতে থাকে। সেই সব মাকুর মধ্যে ছোট ছোট নলিতে

মীনা। রঙ করা রেশম যার নাম। তাঁতের দুই পাশে, নকশার রকম বুঝে ছ' আট দশ বারোটা পর্যন্ত ছোট মাকু, প্রতিটি ভরনার আগে গলিয়ে নিতে হয়। তাব জন্য দু'পাশে দুজন গলান ছেলে বা মেয়ে থাকে। নামই তাদের গলানি। তা বাদেও মাঝখানেও ছোট ছোট মাকু, খোদ বানিদারকেই গলাতে হয়। আঁচলের বেলায় গলানি, পাড়ের বেলায় চালানি। যতো বড় বানিদার হোক, বালুচরীব আঁচল বোনবার সময়, গলানি চালানি ছাড়া চলে না।

পারডোব হলো, তাঁতীর পা ডুবিয়ে বসার চৌবাচ্চার মতো ঘর কাটা গর্ত। বুনে গোটানো কাপড়ের লরাজে পেটেব কাছে নিয়ে, তাঁতী পা ডুবিয়ে বসে। নীচে থাকে পাষাণলড়ির ঝাঁপ। জেকার্ডের ঢেঁকি। পাঁচুব ঘরের দুটো তাঁতের নীচেও দুই পাবডোবের চৌবাচ্চা-গর্ত। এখন বুঝ ক্যানে, বিষ্টুপুরেব লোকেরা তাঁতীদের ঠাট্টা করে বলে, উয়ারা আবার অন্য কিছু বুঝবেক কী গ? উয়ারা যে অর্ধপুতা। যাকে বলে অর্ধপোতা। তা মিছা কথা ত লয় বটে। তাঁতীর সারা জীবন মাটিতে অর্ধেক পোতা থাকে। তাই তাঁতীর মাথা পায়ে—মগজের কোষে কোষে পায়ের ভাবনা। হাতের কাজ যদি বা কেউ টেনে গলিয়ে করে দিতে পারে, পায়ের কাজ কেউ পারবেক নাই। তাঁতীর যতো মাথাবাথা পা জোড়া নিয়ে।

তবু তো এ হলো জেকার্ড মেসিনে যুক্ত তাঁত। এক মাসে, এক তাঁতে জনা আটেক খাটলে দুখানি বালুচবী পাকা মাল মিলবে। কাজ তো খালি তাঁতে বসা না। তাঁতে বসলে গলানি চালানি, তার আগে গুটি সেদ্ধ কর, খি—যাকে বলে সুতোর ডগা, সেটি বের করো। তারপরে আছে চরকা লাটাই ফাঁদালি—রেশমের গুছি করো। আবার সোডা গরম জলে আর এক প্রস্থ সেদ্ধ করো। তখন হলো

কড়া রেশম। খারি করবেক কী? যাকে বলে রঙ করা? তা হলে আর একবার গরম জলে সিজিয়ে লাও ক্যানে? সিজিয়ে লিয়ে কাবাই করে লিয়ে এস গা সায়র পুকুরের জলে। রেশমের রঙ তখন ধবধবে শাদা। এবার চলো মীনা কববে। পাকা রঙ কবা যাকে বলে। যেমন খুশি রঙ করতে চাও, কবে লাও। পাকা রঙ পাবে রেশম খাদি সেবা সদনের কর্তাব্যক্তি ঈশ্বরদাস দেওড়া বাবুজীর গদিতে। তাঁতী তুমি যা-ই করো, সকলের সব কিছু নিয়ে মাথার ওপব বসে আছেন ঈশ্ববাবু।

তা হলেই বুঝ গ, তাঁতীর ঘরে কেউ বসে খায় না। সে তুমার ছ' বছবেব ছা থেকে ষোলর শা-জোয়ান কাঁড়া, তাবত মেয়ে মদ্দ বউ সোয়ামী বুড়ো বুড়ি, কেউ বাদ নেই। জগত কীতের মতো মান্ধাতা বুড়ো, তাঁত সুতোর কাজে যা আসল জিনিস নজব তাও গিয়েছে, তার কথা আলাদা। ঘবেব লোকে না কুলোলে তখন তাঁত মান্দার চাই। চাষের কাজে যেমন মাহীন্দার, তাঁতের কাজেও তেমনি।

পাঁচুকেও মাহীন্দার বাখতে হয়েছে, বিশেষ করে বানিদার। সে আসবে সিনানবেলার মুখে মুখে, বেলা প্রায় ন'টা নাগাদ। তার দিন-ভারের মজুরি আছে, জলখাবার আর বিড়ি আছে। সে সারাদিন কাজ করবে। সন্ধ্যে নাগাদ একবার ফাঁক বাগে যাবে, যাকে বলে একটু ঘুরতে যাওয়া। তারপরে আবার এসে বসবে, উঠতে উঠতে সেই রাত দশটা। তখন তুমি আমনার, আমি আমনার। মানে যার যার আপনার। বাড়িতে গিয়ে ভাত খাও, আর মরতে বাউরিপাড়া বা আর কোথাও গিয়ে চেলা মূলা হেঁড়া, যা খুশি তাই লিয়ে বসে যাও। তবে হেঁড়াটা শহরের মধ্যে পাওয়া মুশকিল। হাঁড়িয়াব ভাটিখানা দক্ষিণের জঙ্গলের কাছে।

রেশম বা তসরের নকশা ফোটানো শাড়ি হলে, বানিদারকে ডাকতে হয়। তা বাদেও মাদ্দার ডাকতে হয়। সে-সব কাজ জায়গায় জায়গায় ছড়ানো। সুতো কাবাই, রঙ করার পরে, এবার হলো পুর্ণিকাড়া। বড় একখানি চৌকো ফ্রেমে, লাটাই থেকে সুতোর গোছা ভাগে ভাগে ছড়িয়ে টেনে বাঁধা। পুর্ণিকাড়ার পরের প্রস্থ সীসাবন। বুড়িকাঠের সঙ্গে টানা সুতো আটকে, পাছাড়কাটি দিয়ে সানা করা। এর জন্য বড় জায়গা দরকার। বর্ষা বাদলে বাইরে কাজ করা চলে না। গরমের সময় গাছতলায় চলে। শীতের সময় কোনো ভাবনা নেই। যতো ভাবনা, বর্ষা বাদলে আর পোড়া রোদে। তা বিষ্ণুপুর বলে কথা। বিস্তর মন্দিরের ছড়াছড়ি। অনেক মন্দিরের ছাদ ঢাকা লম্বা চওড়া নাটবারান্দা রয়েছে। জয়গোপালের চাঁদনিতে চলে যাও ক্যানে। মদনগোপালের মন্দির চত্বর আছে, তার পাশে আছে মাধবগঞ্জ বাজারের চালা।

সীসাবন হইয়্যা গেইচে? এবারে তাশন। টানার লরাজে সুতো বাঁধবার আগে, তাশন করা। দুটো ছোট লরাজের সঙ্গে টান টান করে সুতো লম্বা করে বাঁধো। হুঁ, এমন বাঁধো, উয়াতেই যেন দু ফুট সুতো বেড়ে যায়। অবিশ্যি নিজেরা পলু থেকে—যাকে বলে গুটি থেকে সুতো কাটানি করলে, দু ফুট বাড়ুক আর দু হাত বাড়ুক উয়াতে তুমার হিসাব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কী তুমি পাবে, আর পাবে না সবই তোমার জানা আছে। কিন্তু ঈশ্বরবাবুব গদি থেকে যখন কাঁচা সুতো ওজন করে, এক কেজি পিছু তিনশো টাকা দিয়ে কিনে আনবে তখন তাশনের টানে সুতো বাড়াতে পারলে লাভ। টাকা উনি লিবেন নাই, সুতোটা দিবেন হিসাব করে। এক কেজি কাঁচা মাল দিলে, সাড়ে সাতশো গ্রাম পাকা মাল তোমাকে দিতে হবে। আড়াই

শো গ্রাম ছাড়। ক্যানে? না, কাঁচা মালকে পাকা করতে অনেক হাতে অনেক প্রস্থ ঘুরে আসতে আসতেই কিছু ঝরে পড়ে যাবেই। তার ওপরেও, তাঁতীকে বিশ্বাস কী? সুতো যদি ভাণ্ডতি করে?

হুঁ, তাও অনেকে করে বই কি। ভাণ্ডতি করা তো চুরি না। অভাবের সংসার, রাত পোহাতে দেখা গেল মুখে দিতে কিছু নেই। হাঁড়ি চড়বে না। এদিকে ওদিকে ছুটকো ছাটকা মহাজনের অভাব নেই। তখন তাঁতীর হাতে মুখের অন্ন একমাত্র ঈশ্বরদাসের কাঁচা মাল। অবিশ্যি তিনশো টাকার দরে, তাঁতী মাল ভাণ্ডতি করতে পারে না। দায়ে পড়ে বাজারের দরেই কিছু মাল বিক্রি করে দিতে হয়। সেই টাকাতেই, কিছু না হোক সকালের এক পেট ভাত আর পোস্ত বাড়া হয়ে যাবে। দু চারটে দিন চলে তো যাক। তারপরে দেখা যাবে।

দেখা আর কী যাবে! বিষ্ণুপুরের তাঁতীদের নিয়ে ঈশ্বরদাসবাবুদের তিন পুরুষের ব্যবসা। তাঁতীদের নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। কাঁচা মাল দেবার সময়েই তিনি মজুরির হিসাব থেকে শাড়ি আর থান পিছু কিছু টাকা কেটে রাখেন। শাড়ি পিছু পাঁচ টাকা নিদেন। থানের হিসাব আলাদা। হুঁ, উ টাকাটা জমা থাকবেক বটে 'তাঁতী কল্যাণ সংস্থা'র নামে। তাঁতীর বাড়ির বিয়ে বৌভাত মুখে ভাত, ঘর ছাইতে সারাতে নানান প্রয়োজনে সংস্থা থেকে টাকা পেতে পারে। আসলে, ভাণ্ডতি মালের উশুল হয়, সেই জমা টাকা থেকে। তবে জানবে, যে তাঁতীকে মদে জুয়ায় খায়নি, নেহাত অলক্ষ্মীর কোপে পড়েনি, সে কাঁচা মাল ভাণ্ডতিতে নেই। উয়াতে তাঁতীর দুর্নাম, অবিশ্বাস, সমাজের চোখে খাটো।

ইসব মহাজন কেনা বেচা বাজারের কথা পরে। আগে মাল, পরে

বাজার। মাল তৈরির অলিকুলিতে চলো। আগে পাকা মালের অলিগলিতে ঘোরাফেরা। উদিকে দুই লরাজে, তাশনের সুতো খাটিয়ে এসেছো। এবার নিয়ে এসো, তাশনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ভাতের মাড়। দেখতে অনেকটা হেঁড়ার মতো লাগবে বটে, যেন গুলে দিলেই খেয়ে দম ভর নেশা হয়ে যাবে। না, উটি হবার লয়। ক্যানে? না, উয়াতে হাঁড়িয়ার বাখর বুখর মশলা মেশানো নেই, এ বস্তু আমানি পচানোও না। একে চিট বলতে পারো, কাই বলতে পারো। মাঞ্জা দেবার মতো। একজন খাগড়ি দিয়ে মাড় তুলে ঝাপটায় ঝাপটায় সুতোয় চিট দিয়ে যাচ্ছে। আর একজন কঁচ দিয়ে সেই মাড় মুছে দিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াবার সময় নেই, গলায় জল ঢালবারও উপায় নেই।

মস্তবড় একখানি হাতলওয়ালা বুরুশের মতো খাগড়ি দিয়ে চিটা দেওয়া হাতের ঝাপটায় জোর লাগে, তেমনি হাতখানেকের বেশি লম্বা কঁচ দিয়ে, মুড়ে মুছে দিতেও কম জোর লাগে না। দুই হাতে এ কাজ হবার না। মাদ্দার চাই। ঘরের লোকের অভাব হলে, সব কাজেই মাদ্দার না হলে চলে না। এরকম এক খেপের তাশনেই, সব শেষ না। জমিনের তাশন আর পাড়ের তাশন আলাদা। শাড়ির বহর কত? বা থানের? তাশনের লরাজে যতোটা চওড়া করে সুতো টানা হয়, শাড়ির বহর তার দ্বিগুণ তিনগুণ। সেসব হিসাব নিকাশ আগে থেকেই করা থাকে, সেই অনুযায়ী তাশন। তাশনের পর ঢাল।

ঢাল করা মানেই টানার লরাজে সুতো গোটানো। তাঁতীর তাঁতে বসার আগে, এইটি শেষ কাজ। টানার লরাজে থেকে কোল লরাজে, টানার বন্ধন। কোল লরাজে, যাকে বলে পেটের কাছে চেপে রাখা, মাকু ফাবড়িয়ে, দক্তি টেনে কাপড় গোটানো লরাজে। মাকু ফাবড়ানো মানেই ভরনা। ভরনা হলো পোরা, কিন্তু কথায় বলে,

টানা পোড়েন। অই, ছাখ ক্যানে, পাঁচুর তাঁত ঘরে ঢুকে, ডান দিকের প্রথম তাঁতখানির সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা। ঢাকার নীচে রয়েছে বালুচরীর খান। এক সঙ্গে বারোখানি শাড়ির সুতো আছে টানার লরাজে। পাঁচখানি শাড়িব আঁচলা—বলো আঁজলা সহ, একেবারে পুরোপুরি বোনা শেষ। ছ' নম্বরের আঁজলা, পাড়ও শেষ। তা না হলে অজাকে আসতে হতো সাত সকালেই। অজা—অজিত বীট, পাঁচুর কাছে মজুরি নিয়ে বানিদারের কাজ করে। আঁজলার কাজ যখন চলে, তখন হাত গুটিয়ে বসার সময় থাকে না। তখন পঞ্চানন কীতের মতো নকশাদারকেও, তাঁতে বসতে হয়। আঁজলাটি হয়ে গেলে, একটু নিশ্চিন্ত। পাড়ের নকশার জন্য তেমন ভাবনা থাকে না। ওটি আগে থেকেই জেকার্ড মেসিন আর জালি পাটার নকশায় কেবল বাঁধা থাকে না। পাড়ের ডাং—শক্ত বুনোটের জন্য বালির পুঁটলি ঝোলানো আছে মেসিনের সঙ্গে। ওকেই বলে পাড়ের ডাং। কিন্তু আঁজলায় প্রতিটি পদে পদে, ব-দড়ি তোলা, ছোট ছোট মাকু ঠিক ঠিক ঘর গুনে গলানো, তারপরেই মেসিনের ঢেঁকিতে পায়ের চাপ। ক্যারেঙ্‌...ঝট্‌। ভরনার মাকু গলিয়ে, দক্তি টেনে দাও। কিন্তু তার মধ্যেই ছোট ছোট মাকুগুলো গলাতে গিয়ে, একটিও যদি গোলমাল হয়, তবে তোমার গোটা শাড়িখানিই খুঁতে হয়ে গেল। বানিদারের মাথায় হাত। মহাজনের মাথা গরম।

হাঁ! টানা পোড়েনের দশ দশা হে! উদিকে মজুরিও মার খেয়ে যায়। এমনিতেই ঘরকে আনতে কুলায় না। একখানি শাড়ির মজুরি আড়াইশো টাকা। মাসে দুখানিতে পাঁচশো। শুনতে কেমন গা লাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু পাঁচশো টাকার থেকে বাদ বাকি খরচগুলো ধরতে হবেক নাই? তাঁতে বসবার আগে যতো কাজ, যতো মজুরি, অর্ধেক

খরচ খামচা ভরে সেখানেই। তারপরে ঘরের লোকগুলান? উয়ারা তোমার মজুরি খেকো মাদ্দার না হতে পারে, খেয়ে খাটছে তো বটে। তা হলে রইল কী?

জিগেঁস কর গা আজ্ঞা ঠাকুর বিশ্বকর্মাকে। জিগেঁস কর গা মা মনসাকে, মদনগোপাল জয় গোপালকে, তাঁরাই হলেন তাঁতীর দেবদেবী। হাতে থাকে দনা, পেটে থাকে উপোস। আজ ভাতের পাতে কেড়ালির ডাল আর পস্তুলাড়া আছে, তো কাল মোলা না মুড়ি। তার চেয়েও অধিক কপালপোড়া হলে, দাঁত ছরকুটি। তখন পেট পেটাও, বিটা বিটি পেটাও, বউ পেটাও। আর যদি বাউরি-পাড়ায় যাবার মতো, বার আনা এক টাকা জোগাড় করতে পার তবে চেলা মূলা, যা হোক গিলে, নালিতে মুখ দিয়ে পড়ে থাক গা। তোমার চোখের কোণে রেশমী বুটি চিকচিক করে। কেন্দ নাই হে। তোমার বালুচরী তখন দিল্লি বোম্বাই মান্দ্রাজ কলকাতায় বেজায় জেল্লা দিচ্ছে।

কিন্তু পাঁচুর এখন সে-অবস্থা না। ক্যানে? না, জগত কীতের বিটা পঞ্চানন কীত কেবল বানিদার না। নকশাদারও। নকশা থাকলে বানিদারের কাজ। নকশা সব কিছুর আগে। নকশা আসে কোথা থেকে? নকশা আসে নকশাদারের ধ্যানে। মাথায় যদি নকশা বৃক্ষের শিকড় থাকে, তবে বুকের ডালে পাতা ছাড়ে ফুল ফোটে। নকশা তুমি কোথায়? জগত সংসারকে যে রূপসী করে সাজায়, সেই অলক্ষ্যের মরমে।

পাঁচুর সব থেকে বড় সন্তান পূর্ণিমা, বয়স চৌদ্দ বছর। ওর মায়ের থেকে পনর বছরের ছোট। ফুড়কির মতোই ওর গায়ে ফুল ছাপা

লাল ছিট কাপড়ের জামা। উই কী বলে, গলার কাছখানটিতে ইঞ্চি খানেক তুলে ফুলের পাপড়ির মতো করে—সিনেমাতে মেয়্যা বিটিদের আজকাল যেমন দেখা যায়, পুনির জামার গলাও তেমনি বানানো। গতকাল বিকালে বাঁধা বাসি বিনুনি ঘাড়ের উপর দিয়ে, গা এলানো চিত্তির মতো এলিয়ে রয়েছে ওর চতুর্দশী বুকে। বিটির গতর দেখলে বুঝতে পারো, ছানা দুধের জেল্লা পুষ্টি নেই। ভাত আমানি তেলেভাজা পোস্ত অম্বলের শরীর। দেখে মনে হয়, যতো পুষ্টি চুলে। তবে নিতান্ত রোগা স্যাকা না। বাপের মতো গড়ন পেয়েছে, মুখ পেয়েছে, গায়ের রঙ কাঁচা রেশমের মতো। উটি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। সিজিয়ে কাবাই করা রেশমের মতো না। কাঁচা রেশম, প্রথম কাটানির সময়ে যেমন হয়, জেল্লা নেই, রঙ চাপা তেমনি। চোখা নাক, ডাগর চোখ, ওসব পাঁচুর। পাঁচুর গড়ন পেটনও শক্ত আর লম্বা। পুনি তা পেয়েছে। আলতা পরা বাঁ পা-খানি ছড়িয়ে দেওয়া দেখলেই বোঝা যায়। তবে বিটি ছা বলে কথা, মেয়্যার শরীরে লাবণ্য আছে।

পুনি এখন তাঁত ঘরের এক পাশে বসে, ফাঁদালি থেকে লাটাইয়ে সুতো গোটাচ্ছে। ডান পা-খানি কোলের কাছে মোড়া। কোনো দিকে চোখ নেই, মন নেই। বাঁ হাতে ফাঁদালির হাতল ঘুরোচ্ছে, ডান হাতে লাটাই। বাঁ হাতে, শখ করে গড়ানো চারগাছা সরু রুপোর চুড়ি ঠিনঠিনিয়ে বাজছে। লাটাইয়ের এক জায়গায় সুতো গুটোলে তো হবেক নাই। চারিয়ে ছড়িয়ে সমান ভাবে গোটাতে হবে। তার জন্যে লাটাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই। তাঁতী ঘরের মেয়ে, পেট থেকে পড়েই হাতে কলমে কাজ। অভ্যাস বলে একটা কথা আছে। তবু নজর রাখতে হয়। লাল ছিটের জামা উঠে এসেছে কোলের ওপর। বাপ ভাই বোন ছাড়া ঘরে তো কেউ নেই, তাই

গোছগাছেরও তেমন মন নেই। নাকের নাকচাবিটি পিতলের, সাদা কাঁচটি পাথর বলে ভুল হয়। নাইবার সময় পুনি উটি রোজ মিহি মাটি দিয়ে মাজে। কানে ছুটো সরু সুতোর মতো সোনার রিঙ।

হুঁ, পাঁচুর ঘরে সোনা আছে। মেয়ের কানে রিঙ, বউয়ের সোনার নাকচাবি, এক ভরির একটি গলার চেন হার। কম হলো কী? আব একটা নকশা যদি ঈশ্বরদাসকে ধরাতে পারে তো তামার পাতের ওপর চারগাছা সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবে। পাঁচু কথা দিয়েছে। কিন্তু ছু বছবের বোনটার জন্য পুনিব কাজে মাঝে মাঝেই ব্যাঘাত ঘটছে। গায়ে একটা জামা, নাকে পোঁটা, চোখে কাজল ধ্যাবড়ানো বোনটার নাকে ভুরুর ওপরে কয়েকটা ফোঁড়া উঠেছে। বাটির মুড়ি মাটির মেঝেয় ছড়িয়ে একটা একটা করে তুলে খাচ্ছে। থেকে থেকে, ডেকে উঠছে, 'দিদি, অই দিদি।' সাড়া না দিলে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। হাসছে আর নতুন শেখা গান করছে, 'তেলে লিয়ে মেলে লিয়ে···।' কখনো বাপকে ডাকছে কখনো দাদাদের। কিন্তু কোনো দিকে উঠে যেতে গেলেই পুনি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে। আহ, তু কী করছু কী? মার ছুব দেখবি?

ধমক খেলেই পটি—পটপটি থেকে পটি, হাসতে হাসতে ধপাস করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে, আর একটা একটা করে মুড়ি তুলে মুখে দিচ্ছে। পুনির তো কেবল হাতের কাজ না, বোনটি যাতে বাপ-ভাইকে গিয়ে জ্বালাতন না করে, তাও ওকে দেখতে হবে। মা এলে ক্ষান্তি। মা গিয়েছে যমুনায়। ঘাট যাওয়া, নাওয়া সেরে ফিরে এসে, বাপ-ভাই পুনি সবাইয়ের জন্য আগে চা করবে, মুড়ি দেবে, তারপরে এই লাটাই ফাঁদালি নিয়ে বসবে। এটা মায়ের কাজ। পুনির কাজ আজ ছোট

মাকুর মধ্যে গলানোর জন্য ছোট নলিতে সুতো গোটানো।

নোটোর বয়স আট। মাধবগঞ্জের হাটের সামনে মিউনিসি-পালিটির ফ্রি প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ে। দেখতে অবিকল পাঁচু। কিন্তু ন্যাংলা প্যাংলা। পুনির পিছনে দরজার কাছে বসে আঁক কষছে। নজরটা বাইরের দিকেই বেশি। বাড়ির ভিতর থেকে কেউ বাইরে যাতায়াত করলে চোখে পড়ে। খালি গা, প্যান্টালুন পরা, খোঁচা খোঁচা চুল। আঁক কষার থেকে মাথা চুলকাচ্ছে বেশি। মাঝে মাঝে বাপ আর দাদার দিকে দেখছে।

সোনার কোনোদিকে নজর নেই। ও আর একটা তাঁতের কোল নরাজে বসে, বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে ইতিহাসের বই পড়ছে। ও পুনির থেকে দু বছরের ছোট, বারো বছর বয়স। বালিধাবড়ার মিশন ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। চেহারা, শরীরের আড়া, চোখ মুখ বাপের কিছুই ও পায়নি, সবই মায়ের মতো। রোগা ছোটখাটো, অনেকটা লাথার মতো ফ্যাকাসে। লাথা হলো তসরের ঝুট। যেমন রেশমের ঝুটকে বলে মটকা। মটকার একটা অন্য জেল্লা আছে। লাথার নেই। কিন্তু সোনার গায়ে জামা আছে। পরনে হাফ প্যান্ট। মাথার চুলে সাত সকালেই মুখ ধোবার সময় জলের ঝাপটা দিয়ে টেড়িখানি বাগিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে ডান দিকে ফিরে বাপকে দেখে নিচ্ছে। কোল নরাজের গায়ে জড়ানো লাল রঙের আলপাকার ভুজনির জোড়ে দু একবার মাকু চালিয়ে দক্তি টেনে দিয়ে, আবার বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে পাণিপথের যুদ্ধের ইতিহাস পড়ছে।

হুঁ, তুই বাপ হে, তু পাঁচুর ছা, পাঁচু তো ছা লয়। পাঁচুও তার নকশা আঁকবার ফাঁকে ফাঁকে, আড় চোখে বিটার কাণ্ডটা দেখে নিচ্ছে। এই দেখাদেখির খেলাটা সোনা মোটে টের পাচ্ছে না। হুঁ,

বিটা ভাবছে, বাপ কিছু দেখতে লারছে। তাই কখনো হয়? নকশার দিকে নজর থাকলেও এ ঘরের সব কিছুর ওপরে সকলের ওপরে পাঁচুর নজর আছে। যেমন নজর আছে, দরজার সামনে ডান দিকে কাপড় ঢাকা তাঁতের ওপর। ঢাকা কাপড়েব ওপব একটা মাছি বসলে তার অস্বস্তি হয়। অবিশ্যি ঢাকা কাপড়েব ওপর মাছি বমি করলেও কিছু যায় আসে না। নীচেব মহার্ঘ বালুচরীতে দাগ লাগবে না। কিন্তু এমনি খুলে রাখো, শালার মাছি বসেছে কি না বসেছে টুকুস করে এক বিন্দু দাগ কবে দেবে। তা ছাড়া এ সময়টা ভালো না। প্রায়ই থেকে থেকে মেঘ করছে। অল্পস্বল্প বৃষ্টি বাদলাও হচ্ছে। মাঠ ভেজা-বার নাম নেই, পোকার আমদানিটা দেখ। বিশেষ করে উচ্চিংড়ে। শালাদের খ্যাংরাকাটি পায়ে কী ধার। রেশমের যম। লরাজে গোটানো কাপড়ের ওপর বা টানার ওপর দিয়েও যদি একবার চলে যায়, মনে হবে যেন ছুচেব ডগা দিয়ে আচড় কেটে দিয়েছে। টান পড়লেই সেখানে কেটে যাবার সম্ভাবনা। অবিশ্যি দিনের বেলা ভয়টা কম। সূর্য একবার ডুবলেই হলো। তার ওপবে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধে দিয়ে একবার বাতিটি জ্বললেই হলো। ঝুপ ঝাপ করে লাফিয়ে এসে পড়তে থাকবে।

যেমন তেমন শাড়ি তো বোনা হচ্ছে না। পাঁচুর বাপের থেকে যাকে গেরাহ্যি বেশি, সেই ওস্তাদ অভয় খানের নকশার ওপরে কাজ হচ্ছে। মেপে জুকে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির আঁজলা। নামে ডাকে গগন ফুটের যে বেনারসীর, তার আঁজলা কোনোকালে এত চওড়া হয়নি, হবে না। হুঁ, পাঁচু খাস বেনারসে গিয়ে মুসলমান নকশাদার আর বানিদারদের কাজ দেখে এসেছে। উয়াদের পায়ে নমস্কার। কাজের কী বাহার! এমনি এমনি কী আর নাম হয়? ঝাঁক পাখী জালার কাজ

পাঁচু সেখানেই দেখে এসেছে। বাদশাহী আমলের কারিগরি যদি দেখতে হয়, তবে এখনো বেনারসে গেলেই দেখতে পাবে। খোদ ঈশ্বরদাস দেওড়া বাবুজী পাঁচুকে বেনারসে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার নকশাদার, বানিদারদের কাজ দেখাতে। না, নিজের ট্যাকের কড়ি খরচ করে নিয়ে যাননি। রেশম খাদি সেবা সদনের নাকি কী সব সরকারি ব্যাপার আছে। তাঁতীদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য এদেশে ওদেশে গেলে সবকারই নাকি টাকা দেয়। তবে, সে-টাকার চেহারা কেমন, গোছায় কতো, তাঁতীরা জানে না। যা জানবার ঈশ্বরদাসই জানেন। উনি হলেন সেকরেটারি, সরকারের সঙ্গে যাবতীয় লেনাদেনা তিনিই করেন। সরকার তাঁকে মাইনে দিয়ে সেকরেটারি করেছেন।

তা সে তুমার যাই হোক গা। তাঁতী, তাঁত বুনে খায়। পাঁচু বেনারসে গিয়ে, বেনারসীর জব্বর কারিগরি দেখে এসেছে। কিন্তু উয়ারা আর যাই পারুক, পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি আঁজলা কখনো করতে পারবেক নাই। আর একটি কাজও বেনারসীতে হয় না, যাকে বলে চৌকো নকশা। উটি বালুচরীতে হয়। প্রমাণ বাদশাহী আমলের বালুচরীতে আছে। আর আছে ওস্তাদ অভয় খানের কাজে। অভয় খানেরও আগে বিষ্টুপুরের আর একজন নকশাদার ছিল বংশীলাল দত্ত। হঁ, ওঁয়ার কাজেরও নামডাক ছিল। এখনও আর একজন আছে কালীচরণ হেঁস। নকশাদার খারাপ না, তবে পাঁচুর ওস্তাদের কাছে কিছু না। কিন্তু উয়ার একটি চ্যালা আছে, পাঁচুর বয়সী হবে, নাম যোগেন। গুরুর গুণকেত্তন কে না করে? যোগেনের হলো ডেপুটি মারা কথা। নিজে একটি লক্কর তাঁতী। পাঁচুর সঙ্গে অনেকবার টক্কর হয়ে গিয়েছে।

তা সে যাক গা বাপু।

এই যে পাঁচুর ঘরে তাঁতে এখন শাড়ির কাজ চলছে, তার নকশা দেখলে লোকের চোখে জেল্লা দেবে। কিন্তু যে-কোনো নকশাদারের মাথা ভিরমি যাবে। ক্যানে ? না, উয়ার কারকিত দেখে। আঁজলার ঠিক মাঝখানটিতে আছে মুখোমুখি জোড়া বাদশা বেগম। বাদশা নল ধরে টানছে ফড়শী, বেগম হাতে নিয়ে রয়েছে বোঁটায় দুই পাতার মধ্যখানে গোলাপ ফুল। শাড়ির বহরের দিকে মাপে, উটিই ষোল ইঞ্চি। বাদশা বেগমকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে নর্তকীরা। সবাই তারা মুখোমুখি নেচে চলেছে, ঘাগরা আর জামা পরে, বেণী দুলিয়ে। তাদের চারপাশে ঘিরে আছে মুখোমুখি টগবগে ঘোড়ার দল। ঘোড়াদের ঘিরে আছে শুঁড় উঁচনো হাতীব দল। হাতীব দলকে ঘিরে আছে ইঞ্চি মাপের কেল্লার কুণিক খিলান। বারো হাত শাড়ির সারা বেগুনি রঙের জমিন জুড়ে আছে ইঞ্চি মাপের, কুটো মুখে সাদা পায়রা।

কী বুইলে হে ? হুঁ, একে বলে ওস্তাদ অভয় খানের কাজ। পাঁচু কীত যার চ্যালা। গোটা শাড়িখানি মেলে ধরে যখন দেখবে, তখন বুঝবে, কাকে বলে বাদশাহী জমানা আর রমরমা। খালি নকশা করলেই তো হয় না। তার হদ্দ তত্ত্ব তল্লাশ তাগবাগ কারণ-কারণ জানা চাই। এখন দেখে তো তোমার চোখ বিজলাচ্ছে। প্রাণে রঙ লাগছে। নকশাদারের ঠ্যালাটি তালে বুঝে লাও ক্যানে।

চিত্রখানি প্রথম আঁকা হয়েছে একটি ছোট কাগজে। যেমন এখন পাঁচু আঁকছে। তারপরে সেটি আঁকা হয়েছে মস্ত মস্ত ঘর কাটা কাগজে। ঘর কাটা কাগজ এখন কিনতে পাওয়া যায়, যার নাম গ্রাফ পেপার। কিন্তু সেই কাগজের ঘর তো আর টানা-ভরনার বুনট ঘর

না। টানা-ভরনার যে-বিন্দু চৌকোটি আছে, তা তোমার নজরে আসবেক নাই। আর ঘর কাটা কাগজের চৌকো ঘর জালি মশারির কাপড়ের থেকেও বড়। তবু ক্যানে ঘর কাটা কাগজে মস্ত করে নকশা আঁকা হয়? না, ওই কাগজের ঘরগুলোকেই শাড়ির বুনট-ঘর হিসাবে দেখা হয়। মস্ত বড় নকশাটি দেখে দেখে, নকশাদারকে জালিপাটার কাজ করতে হয়। পাঞ্চিং বাকসার ওপরে পাটা পেতে টবনা আর মগুর মেরে জালির কাজে বিঁধে বিঁধে নকশা তোলে। কাগজের চৌকো ঘর তখন শাড়ির বুনোটে এসে মেলে, আর মস্ত নকশাখানি নকশাদারের হিসাবের মাপে ছোট হয়ে আসে। তখন জালি পাটাই আসল।

কিন্তু নকশাদারের কাজ এখানেই শেষ না। নকশার কাজ শেষ বটে, তার দায় তখনো অনেক। এবার চ্যালাকে নিয়ে তাকে পড়তে হবে জেকার্ড মেসিন নিয়ে। মেসিনের সঙ্গে খাচান দড়ি আর জালি পাটা জুড়ে আঁজলা জমিন আর পাড়ের সঙ্গে ছুঁচ পরিয়ে দিতে হবে। খাচান দড়িতে থাকে পেতলের মৌরি—আসলে সেইটি ছুঁচের বিং। পাড়ের আঁট বুনোনি রাখবার জন্য, তার খাচান দড়ির সঙ্গে বালির পুঁটলি পাড়ের ডাং বেঁধে দেবে। সানা করার খাড়িটির লোহার কাটি ঠিক মতো সাজিয়ে দিতে হবে। এক ইঞ্চি খাড়িতে পঞ্চান্নটি লোহার কাটি, তার ভিতর দিয়ে সুতো ঢুকবে একশো দশ। ছত্রিশ ইঞ্চি বহর হলে, খাড়ি দিয়ে দু হাজার মতো সুতো ঢুকবে। তারপরে নকশাদারের ছুটি। এবার বানিদার পারডোবে পা ডুবিবে বসে যাও। দু পাশে লাও গলানি চালানিদের। পা রাখো পাষাণলরিতে, সময়ে জেকার্ডের ঢেঁকিতে। নকশার ছোট মাকুগুলো গলিয়ে পাড়ে চালানি গলিয়ে ঢেঁকিতে চাপ দাও। ক্যারেং ঝট! পাষাণলরিতে চাপ দাও, ব-

দড়ি উঠবে নামবে। ভবনার মাকু গলিয়ে দক্তি টেনে দাও। এইটুকুন যদি করতে পারো, তোমার বালুচরে নকশাদারের ধ্যানের ছবি ফুটে উঠবে।

তবে হুঁ, বানিদারকে নজর বাখতে হবে ঘরকানা না পড়ে যায়। খাড়ি বাদ পড়ে গেলে সুতো ফাঁক থেকে যাবে। আবার তাব পালটি চৌতার। দেখলে হয় তো এক ঘরেই চারটি সুতো জমাট বেঁধে গিয়েছে। তখন আবার নতুন করে খাড়ি করতে হবে। এ তো আব যেমন তেমন থান বোনা না, বা সুতি কাপড় বোনাও না। এর নাম বালুচব, বা বলো বালুচরী। এ যুগেও বড় বড় শহবে অনেক বেগম আছে, যাদের প্রাণ মন চোখ তুমি অর্ধপোতা হয়ে মাটির ঘরে খড়েব চালেব নীচে বসে তিল তিল কবে হরণ করছ। বাদশাদের মুঠিতে বিস্তর টাকা। অই হে অর্ধপোতা, এই তোমাব সুখ। বাদশাদেব মুঠি খুলে যায় বেগমদের ঝিলিক হানা চোখের দিকে তাকিয়ে। আর তুমি একাধারে নকশাদার বানিদাব। বিস্তব টাকাব সন্ধান তুমি জানো না। তোমার সন্ধান জানে না বাদশা বেগমরা। যেমন কেউ সন্ধান জানে না, কোন অলক্ষ্য থেকে কে আকাশের রঙ বদলায়, পাখী ওড়ায়, গাছেব পাতায় ঝলক দেয়, ফুল ফোটায়, জগতকে সাজায় নানা রঙে।

পাঁচু এখন মাজা পালিশ পিঁড়িব ওপর কাগজে নতুন নকশা আঁকছে। ক্ষণেক আগে নকশার দিকে তাকিয়ে সে চমকিয়ে উঠেছিল। বেদেনীব পাড়েব ওপর দিয়ে এলানো বেণীর সঙ্গে সাপ জড়াতেই ভুলে গিয়েছিল। অ্যাই শালা দেখেচু? মনে মনে নিজেকেই বলা, শালা দেখেছিস? মনে এঁচে রেখেছিল। আঁকতে গিয়ে ভুল। বেদেনীর হাতে জড়ানো ফণা তোলা কালি খরিশ যার ফণায় ছুটো

ক্র। বাঁ হাত কোমরে রেখে বেদেনী নাচের ভঙ্গিতে ডান হাতে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, বেদেনীর কোমরে জড়ানো সাপ দেখাবে। গত সালে শ্রাবণে মনসাতলার ঝাঁপানে সেইরকমটি দেখেছিল। অই হে, পাঁচু তো ভেবেছিল বেদেনীর কোমরে জড়ানো চিতিটা মরে যাবে। যে-ভাবে দড়ির মতো কোমবে জড়িয়ে কষে বেঁধেছিল! আসলে উটি বেদেনীব লোকজনকে অঁড়কঁক বানাবার চাতুরি। এমন দাঁতে দাঁত চেপে, ঘাড় ঝাঁপিয়ে চুলে ঝাপটা মেরে, হাতের মুঠি পাকিয়ে সরু পেট কোমরের ওপর চিতিটাকে গিট দিয়ে জড়িয়েছিল, যেন উটি সাপ লয়, একগাছি দড়ি মাত্তর। লোকে তো বোকা বনবেই। পাঁচুও বনেছিল। পরে বুঝেছিল, নকশাদারের নকশার মতো ওটিও বেদেনীব নকশা। কারণ সাপটি যখন অনায়াসে গিট-বাঁধন খুলে বেদেনীর নাভির ওপর দিয়ে বুকের আঁচলের ভিতর মুখ সেধিয়েছিল। তখনই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু আহ, পাঁচুর গায়ের মধ্যে কেমন শিরশিরিয়ে উঠেছিল। অমন দুখানি বেলফল লাকানো তনের ভিতর চিতিটা কিলবিলিযে ঢুকেছিল ক্যানে? বেদেনীর তো কোনো বিকাব দেখা যায়নি। যেন কোলের ছেলেটি মায়ের বুকে মুখ ঢুকিয়েছিল। অই, চিতিটা তন চুষছিল নাকি গ? উ বাবা, গা শির-শিরিয়ে উঠবেক নাই?

গত শ্রাবণে ঝাঁপানের দিন থেকেই বেদেনীর পটখানি মাথার মধ্যে সাপের মতোই কুণ্ডলীর পাক খুলে নড়েচড়ে উঠছিল। একলা বেদেনী না। বেদেনীর সাপুড়ে মাঝে মাঝে ডুগডুগি বাজাচ্ছিল। কিন্তু উয়ার বাঁশের বাঁশিখানি বাজিয়ে আর হাঁটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে সাপ খেলানোও বড় মনোহর হয়েছিল। কেবল তো খরিশ না, যাকে বলে গোখরো। কালি খরিশ, দুধ খরিশ—এসব নিয়ে খেলা। সে

আবার তার মাথার পাগড়িতে ছেড়ে দিয়েছিল একখানি লাউডগা, আর একটি বাতাসী। লাউডগাটা সিঁড়ির মতো কয়েকটা ধাপ তুলে দাঁড়িয়েছিল। লাল বিন্দু চোখের কোণ দুটি যেন নরুন দিয়ে টুকুস চেরা। সাপের অমন কাজল পরা চোখ দেখা যায় না। আর বাতাসীটা তার লম্বা সরু, রেশম বোনাব ইস্পাতের মাকুব মতো রঙ শরীরটাকে যেন বর্শার মতো খোঁচা কবে রেখেছিল। সময় বিশেষে উয়ারা নাকি উডতে পাবে, তাই নাম বাতাসী। মা মনসাব ডাক শুনলে বাতাসের আগে ছোটে। বিষ নাকি জবব।

হুঁ, গত সনেব ঝাঁপান উয়ারাই জমিয়ে বেখেছিল। সাপুড়ের লাল মাটি পোড়ানো চেহাবাখানিও বেশ ছিল। বাঁশের লাঠির মতো পেটানো ছিপছিপে। ছাপা লুঙ্গির ওপরে সাদা জামা মাথায় পাগড়ি। ক্যানে? উয়ারা কি বাঙালী না? বাঙালী বটে বই কি। কথা বলছিল বাঁকড়োর পশ্চিমেব টানে আর শব্দে। বিষ্ণুপুরের সঙ্গে বাঁকুড়া অঞ্চলের কথার তফাত। আরও তফাত পুরুলিয়ার সঙ্গে। সে-কথা বলতে গেলে, বিষ্ণুপুব থেকে সোনামুখী গেলেই কানে তফাত বাজে। তফাত বাজে পাঁচমুড়া গেলে। দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে কথায় ইদিক উদিক হয়ে যায়। সাপুড়ে বলেছিল, উয়ারা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেক্যে আইচে। হবে বটে। পাঁচুব মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল, উয়ারা মোচলমান। উয়াতেই বা কী আসে যায়? বিষহরির কাছে সবাই সমান। সাপুড়ে আর তার বউ তো মন্দিরের মধ্যে যায়নি।

বেদা বেদিনীই বলো, আর সাপুড়ে সাপুড়ে-বউ বলো, হরেদরে একই কথা। তবে অনেক বছরের মধ্যে ওরকম জুটি দেখা যায়নি। বেদার চেহারাটি যেমন, বেদেনীরও তেমনি, যেন কালো রঙ করা

াকা রেশমের শরীরখানি ছেনি বাটালি দিয়ে কেটে কুঁদে গড়া।
বেদার কানে মাকড়ি, গলায় গুঞ্জার মালা। বেদেনীর গলায় পুতির
হার, নাকে নাকচাবি, দু হাতের ডানায় দুটি কাঠের অনন্ত। বেদেনীর
বুকে ঢোকা চিতিই কেবল পাঁচুর গা শিরশিরিয়ে দেয়নি। বুকের রক্ত
লকিয়ে দিয়েছিল যখন কালি খরিশের ফণাটা মুখের মধ্যে পুরে
দিয়েছিল। আর চুমো খাওয়ার কী ঘটা। অই বাপ, ই কি খেলা গ!
াত সনের ঝাপানে আরও অনেক সাপুড়েরাই এসেছিল। উ
জোড়াটির মতো কেউ জমাতে পারে নাই।

সেই থেকে পাঁচুর মাথায় বেদেনীর সাপ নিয়ে নাচ, বেদার সাপ
খলানোর নকশা। দেখবার সময় কি নকশার কথা ভেবেছিল? না।
নকশাদারের ধ্যানে নকশা বোনা হচ্ছিল। গুরুকেও কিছু বলেনি।
কদিন ধরে এঁকে দেগে এখন একটু চোখে লাগছে। গোটা আঁজলার
নকশা আঁকা হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে জোড়া নকশা বেদা-বেদেনীর।
বেদেনীর বুকে চিতি ঢোকা, ফণা মুখে নেওয়া শাড়িব আঁজলায় উসব
যন বেমানান। তাই বেদেনীর শরীরে নাচের ভঙ্গি। বাঁ হাত কোমরে
ডান হাতে খরিশের ফণা। ঘাড়ে এলানো বেণীর সঙ্গে পাক দিয়ে ফণা
রে রয়েছে কালনাগিনী। তার পায়ের কাছে বসে সাপুড়ে বেদা
বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছে। পাঁচুর ইচ্ছা এটি বহরে আর লম্বায়
কুড়ি ইঞ্চি চৌকো হবে। বেদা-বেদেনীকে ঘিরে আছে কড়ি আঁটা
কনকে ঝাঁপি। ঝাঁপিগুলোকে ঘিরে আছে পাল তোলা নৌকা।
ক্যানে? না, মা মনসার সঙ্গে মনে এলো চাঁদ সওদাগরের কথা।
নৌকাগুলোকে ঘিরে আছে পদ্মফুল। পদ্মফুলগুলোকে ঘিরে আছে
হাঁটু মুড়ে বসা হাত জোড় করা নমস্কারের ভঙ্গিতে পূজারিণীর দল।
এই নকশাখানি দেখেছে সে শাঁখারিপাড়ার মদনমোহনের মন্দিরের

পোড়া ইঁটের গায়ে। এই গোটা নকশাখানিকে আটচল্লিশ ইঞ্চির আঁজলায় বোনা যায় না? অই বাবা, গুরু এখনও চোখে দেখলেক নাই, আটচল্লিশ ইঞ্চি লম্বা আঁজলা? ওস্তাদ দেখেই হয় তো ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলবে, বলবে তাঁতির মাথায় মারব জুতা। পঁদ বাগে বার করব সুতা।

পাঁচু বারো বছর বয়স থেকে ওস্তাদ অভয় খানের হাতে মানুষ। তার আগে ন বছব বয়স থেকে বাপের সঙ্গে ঠকঠকি চালিয়েছে। কাজের ভুলেব জন্য ওস্তাদের হাতে মার কম খায়নি। ছেঁড়াছিড়িও কিছু কম হয়নি। 'শালা, অদধপুতা কি এমনি বলে?' ওস্তাদের এই-রকম কথা, আর দাঁতে দাঁত চেপে ঠাস ঠাস চড়। যেন গুরুটি আমার নিজে তাঁতীর ঘবের বিটা না, অদধপুতাও না। আসলে পাঁচুও জীবনে ভুল করেছে বিস্তর। এখনও করে, তার লেগে চড় চাপড় খেতে হয় না। তবে কেবলই কি চড় চাপড়? মনের মতন কাজটি হলে এখনও যে পাঁচুকে কোল ছায়ের মতো বুকে চেপে, আকাটা দাড়ি গাল টিপে দেয়। পাঁচুর কেরামতিই বা কতটুকুনি? বয়সের দিক থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর ছাড়া করাল, আজতক মাত্র দুখানি নকশা তার কাজে লেগেছে। একা গুরুর পছন্দে তো হবে না। তারপরেও আছে ঈশ্বরদাস। সারা মুলুকের বাজার তার হাতে। বাজারের নজর ওজর হালহদ্দ তার জানা। সে যদি বলে, হুঁ ই নকশাটি চলবেক তা হলেই চলবেক। তবে হুঁ, ওস্তাদ অভয় খান যদি একবার মুখ ফুটে বলে, নসকাটি বড় নজর-কাড়ানি হইচে বটে তবে ঈশ্বরদাসেরও নজর লেগে যায়।

গতকালই পাঁচুর নকশা শেষ হয়েছিল। তবু দেখ, বেদেনীর চুলের বেণীর সঙ্গে সাপটি জড়ানো বাদ পড়ে গিয়েছিল। আজ ভোরের

আলো ফুটতে না ফুটতে নকশাটি নিয়ে বসেছে। যতোগুলো খুঁত খাঁই ছিল, মোটামুটি সব ঘষে মেজে দেগে বুলিয়ে ঠিক করা গিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে কিছু ফাঁক যায়নি, বাদ পড়েনি। কিন্তু সোনাটা ভুজনির জোড় বুনছে না বিটা যে বাঁয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বই পড়ছে, তার জানা। ইস্কুলের পড়া, পড়তে হচ্ছে তো বটে। তবু অই যে সনা, তু যে অদধপুতার বিটা। ইচ্ছা কি করে না, তোকে লিখাপড়া শিখা করাই? লাল বাঁধের ধারে কলেজে যাবি তু? চড়ংবড়ং ইঞ্জিরি বুলবি। লাট-বেলাট হয়ে লোকের মাথা হাতে না কাটিস পাঁচু কীতের বিটা ইস্কুল কলেজের মাস্টের তো হতে পারে, আঁ্যা? কিন্তু একশো টুকরো ভুজনির জোড়ের আগাম খেয়ে বসে আছি যে? মহাজন তো ছেড়ে কথা বুলবেক নাই। এতগুলান লোকের মুখের অন্ন, তা বাদে ই তাঁত ঘর-খানির ভাড়া আছে মাস গেলে তিরিশ টাকা। এ ঘরের মালিক নিতাই দাস। নিতাই তাঁতী বটে, কিন্তু উয়ার কিছু জমি জমা আছে। ঘর জমির ভাগীদার কেউ নেই। পাঁচুদের বিঘেখানেকের ভিটা ছেড়ে, রাস্তার ধারের এই কাঠা দুয়েক জায়গা নিতাইয়ের। তার ওপরে পাশাপাশি দুখানি ঘর। একখানিতে নিতাইয়ের নিজের তাঁত ঘর। এমন একখানি মাটির দেওয়াল খড়ের চালের ঘরের ভাড়া তিরিশ টাকা, কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে? পাঁচুর বাপ এখনও বিশ্বাস করে না। বলে, 'হঁ রে, তু আমাকে পেবলা ভেবেচু কি?'

লাও, পাঁচু কখনো বাপকে ভ্যাবলা ক্যাবলা ভাবতে পারে? বুঝিয়েও কোনো লাভ নেই। বাপের কাল কবে বিঁড়াইয়ের বানে ভেসে গিয়েছে, বাপও জানে নাই। এই সিদিনেও নাকি টাকায় ন-দশ পাই চাল কিনেছে। সিদিন বলতে পাঁচু যখন সোনার বয়সী ছিল। ইয়ার নাম সিদিন। কিন্তু পাঁচু একটা ঘরে তাঁত ভাত ঘরকন্না শোয়া

বসা নিয়ে থাকতে পারেনি। এ ঘরটা তাকে নিতেই হয়েছিল। দু দুটো তাঁত, তার সঙ্গে জেকার্ড মেসিন, ওপরে কাঠের মাচা। মাচার ওপরেই মেসিন থাকে, সেখানে উঠে খাচান দড়ি আর জালি পাটা জুড়তে হয়। বুললে তো হবেক নাই। চালাতে হবে। টানা-ভরনার বুনোটের ঘর নজরে আসে না, তবু ছ্যাখগা সুতা খরচ হয়্যা যাইচে। টাকার খবচও তেমনি। নজরে আসে না, খরচ হয়ে যায়। যদি বলো বুনোটের ঘরে কাপড় আর নকশা ফুটে ওঠে, তবে এই দেখ তাঁতীর সংসারখানি। খরচ আর সংসাব টানা-ভরনাব এই নিয়ম। আর সেই নিয়মেই বারো বছরের সোনার পেটে লরাজের দাগ পড়তে শুরু করেছে। তাঁতীর ঘরের বিটা না ?

পাঁচু নকশা থেকে মুখ তুলে আড়চোখে সোনার দিকে দেখলো। হঁ বিটা, ঘাড় ফিরয়ে খুব পড়চু রে। কিন্তু তোর বাপের বুকে টানা সুতো, মহাজনের পায়েব চাপে পাবাণলড়ির ঝাপ পড়ে। তবু মুখ খোলবার আগে, তার মুখে তোযামোদের হাসি ফুটলো। নকশার দিকে আর একবার দেখলো। এখন তার নিজের মেজাজটাও একটু খোশ আছে। নকশাটা ধববেক কি না ধরবেক, উ পরের কথা। হাতের কাজ তো হয়ে গিয়েছে। অবিশ্যি ইটি হল গা তুমার আঁতুড়ে বিয়ানো ছা। বেঁচেবর্ত্তে থাকলে হাতে নিয়ে বিস্তব লাড়াচাড়া করতে হবেক। তখন নকশাদারের অনেক কাজ। পাঁচু আবার সোনার দিকে দেখলো, তারপরে একটু সুর মিশিয়ে ছড়া কাটলো :

> 'তাঁতী ভুজনি জোড় বুন বুন
> তাঁতী কৃষ্ট কথা শুন।'

এক পলকেই তাঁত ঘরের হাওয়া বদল। পুনির লাটাই ফাঁদালির হাত থেমে যাবার যোগাড়। কালো বুটি নকশা-চোখ তুলে বাপের

দিকে তাকালো। নোটোরও সেই অবস্থা। আঁকে মিলছে না, অবাক চোখ তুলে তাকালো। সোনা চমকিয়ে বাপের দিকে তাকালো বটে। কিন্তু চোখে সন্দেহ, ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে।

পাঁচু হাসলো। আসল ছড়ায় অবিশ্যি ভুজনি জোড় কথাটা নেই, আছে তাঁত। ভুজনি জোড় না বললে তাঁতীর বিটা বুঝবে কেমন করে? খালি গা পাঁচু তার কোল-লরাজের পেটের কালো দাগের ওপর মোটা আঙুলের তাল ঠুকে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে আবার বললো:

অ তাঁতী ভুজনি জোড় বুন বুন বুন
তাঁতী কৃষ্ট কথা শুন।

ছড়ার তাতে তালে, পাঁচুর মোটা ভুরু জোড়াও নেচে উঠলো। উই শালা, আর যাবেক কুথা গ। মায়ের মতো মুখখানি সোনার। কাঁচা রেশমের রঙে যেন রোদের ঝলক লেগে গেল। উয়ার মায়ের যেমন রাগে, কালো চোখ আরো জ্বলে, তেমনি উয়ারও জ্বলছে। বাঁ হাতে বইটা টেনে নিয়ে, পাঁচুর কাছে মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'খুব তো বুলছ বটে। ইস্কুলে মাস্টের যে আমার পঁদের ছাল তুলে বুন করাবেক ত্যাখন?'

হ, তাঁতী ঘরের বিটার মতো কথা বটে। পাঁচু মুখ ফিরিয়ে একবার পুনি আর নোটোর দিকে দেখলো। দুজনেই হাসছে। পুনি অবিশ্যি হাত থামায়নি। মজা পেয়েছে নোটো। পটিটা হকচকিয়ে গিয়েছে। মুড়ি সুদ্ধ হাত হা-মুখের কাছে থেমে রয়েছে। ঘরে মারধোর ঝগড়াঝাঁটি লাগলেই, ও কাঁদা ছাড়া আর কিছু জানে না। এখন কাঁদবে কি না বিটি বুইতে লারছে। পাঁচু সোনার দিকে তাকিয়ে মন রাখা করে বললো, সি কি আমি বুঝি নাইরে সনা? কিন্তু কী করব বল। তোর মুখ চেয়্যা মহাজনকে কথা দিইচি যে বাবা। মামাভাত

খাবার সময় এখন। বড় তাগাদা দিচ্ছে।

মামাভাত খাওয়া, যাকে বলে অন্নপ্রাশন। লয় তো বলো ভুজনা। মামাভাত খাবার সময়, খোকা খুকুরা আলপাকার ছোট কাপড়খানি পরে, মামার কোলে বসে ভাত খাবে। এমন কিছু লাভের কাববার না। প্রতি টুকরোর জোড় পিছু মজুরি ছ আনা। তবু যা পাওয়া যায়। নিতাই দাস একটা দুটো। অধিকাংশ তাঁতীর, তাঁত গতরই জমিজমা। তাঁত ফেলে রাখা যায় না। পাঁচু আবার বললো, কী করব বল, তোর কত্তাদাদার চোখ দুটা থাকলে ভাবনা ছিল নাই। উয়াকে বুলতে লারি। আর দুটো বছর গেইলে, লোটোকে তাঁতে বসা করাব, ত্যাখন দুজনায় ভাগজোত করে কাজ করবি, ইকুলের পড়ান চলবেক।

অই গ বাবা, আমি ভুজনির জোড় বুনতে পারবক দেখবা? নোটো চোখ ঝিকিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

সোনার ও সব কথায় কান নেই, কোনো দিকে নজরও নেই। ও পেট লরাজের ওপর ঝুঁকে পড়ে পাষাণলড়িতে চাপ দিয়ে ব-দড়ি তুলে টানার ঘরে ভরনার মাকু ঠেলে, ঝাপ ফেলে দিল। দক্তি দিল টেনে। হ, আলপাকার ভুজনির জোড় বুনতে জেকার্ড মেসিন খাচান দড়ির কাজ নেই বটে। তবে ই খটখটির কাজও লয়। তা হলে আলপাকার পলকা সরু খি—যাকে বলে সুতো, ছিঁড়ে ছাবড়া হয়ে যেতো। ইয়ার আঁজলা বুটি পাড়ের কাজ নাই, কিন্তু ভরনার মাকু হাতে ফাবড়ে ফাবড়ে ব-দড়ি তুলে দক্তি টেনে খাপির কাজ করতে লাগে।

পাঁচু চোখ পাকিয়ে নোটোর দিকে ফিরে মুখটাকে বিকট করে হাঁকাড় দিল, তু বিটা আপনার কাজ কব। ভুজনির জোড় বুনে দেখাতে হবেক নাই।

নোটো তাড়াতাড়ি পেন্সিল নিয়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

বাপের মেজাজ বুঝা উয়ার কর্ম নয়। কিন্তু পুনির দিকে তাকিয়ে পাঁচু একটু মুচকে হাসলো, চোখের ইশারা করলো। পুনিও হাসলো, মুখে অবিশ্যি কথা নেই। যা বুঝসুঝ সব বাপ বিটির মধ্যে। পটিটা বাপের হাঁকাড় শুনে, ভ্যা করে উঠবে কী না, ঠিক করতে পারলো না। ঝাঁপিয়ে পড়ে পুনির পিঠে মুখ চাপলো। কিন্তু মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে বাপেব মুখটা দেখে নিল। দু বছরের হলে কী হবে। পটপটি কাজল ধ্যাবড়ানো চোখে দেখে, সব বুঝে নেবার চেষ্টা করে।

পাঁচু আবার তাকাল সোনার দিকে। সোনা আপন মনে কাজ করে চলেছে। পাঁচু একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখলো, বললে, 'হঁ, মনে ল্যায়, বেলা সাড়ে সাতটা হবেক। আর এক ঘণ্টা বুইলি সনা? তা' পরে তু ঘাটে যাবি নাইবি খাইবি, ইস্কুলে যাবি। উয়ার মধ্যেই পড়ার বইয়ে একবারটি চোখ বুলিয়ে লিবি। পারবি নাই?'

সোনার কোনো জবাব নেই। মুখও তুললো না। রাগ হলে, উয়ার মা যেমন করে। হঁ, ছোঁড়া দেখতে একেবারে মোতির ছাঁচে গড়া হঁইচে। ইস্তক চোখ দুটো পর্যন্ত। কালো আর নকশা তোলা ছোট মাকুর মতন লামবা—টান টান। বিটা বিটি হতে হতে বিটা হয়ে গিয়েছে। মোতি হলো বাপের ক'ড়ে বউয়ের নাম। মনে মনেই মোতি নাম। কোনো তাঁতী কখনো বউয়ের নাম ধরে ডাকা করে নাই। পাঁচু বউকে ছোট বউ বলে ডাকে। তবে হঁ, মান অভিমানের কথা আলাদা। তার একটা রকম সকম আছে। ছোট বউ একবার মুখ খুললে উই বাপ। সামনে কে দাঁড়াবেক? অবিশ্যি বেজায় জ্বালা পোড়া হলেই ছোট বউ মুখ খোলে। সোনাও তার কিছু কিঞ্চিৎ পেয়েছে। পুনির যেমন সাত চড়ে রা নেই, তেমনটি না। কিন্তু পাঁচু

মনে শান্তি পায় না। শত হলেও বাপ তো সে। সোনাটা একেবারে গোঁজ হয়ে থাকলে তার মনটাও খচ খচ করে। সে আবার বললো, 'শুন সনা, শুন ক্যানে, আজ তু ইস্কুলে গেইলে, আমি গোটা দুপুরটা ভুজনি বুনা করব। তালে হবেক তো?'

উ য্যাতোই তুষ খুশ সোনা মুখ তুলেও তাকালো না। কাঁচা রেশম রঙ মুখখানি থমথমে। বালক তাঁতী তাঁত বুনে চলে! পাঁচু মুখ ফিরিয়ে পুনির দিকে তাকালো। বাপ বিটিতে চোখাচোখি হতেই মুচকে হাসলো দুজনেই। পাঁচু দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে চোখ ঘুরিয়ে ভঙ্গি করলো। পুনির লাটাই ফাঁদালি চালানো হাত আড়ষ্ট হয়ে এলো। বাপেব চোখ মুখের ভঙ্গি দেখে বেজায় হাসি পেলো। কিন্তু সোনার দিকে পলকে একবার দেখে, শব্দ করে হাসতে সাহস পেলো না। ওর লাল ফুল ছিট জামা গায়ে চতুর্দশী হাসির দমকে কাঁপলো। পাঁচু সোনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বুইলি পুনি, শালা অনেক দিন টুকুস খাপি করে বস্তে নিমের বোমা আর খেলুর জিলাপি খাওয়া হয় নাই। বল ক্যানে অ্যাঁ?'

বলে সে পুনির দিকে তাকালো।

পুনির চোখে ঝিলিক, ঠোঁটে হাসি। কাঁচা রেশম রঙ মুখে যেন কাবাইয়ের ঝলক। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হুঁ। আর উয়ার সঙ্গে চা মুড়ি।'

নিমের বোমা হলো নিমাইয়ের দোকানের বোমার মতো মস্ত তেলেভাজা আলুর চপ, আর খেলারামের দোকানের বিখ্যাত জিলিপি। খাপি করে বসা হলো জমিয়ে বসা। পাঁচু ঘাড় নাচিয়ে বললো, 'হঁ, তু বিটি ঠিক বলেছু।' বলে একবার সোনার দিকে আড় চোখে দেখে আবার বললো, 'আজ বিকলে সনা গিয়ে কিনে লিয়ে আসবেক।'

'ক্যালাটা, ই ক্যালাটা লিয়ে আসব।' সোনা পেট লরাজে থেকে ডাইনে ঝুঁকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে ঝেঁজে বললো। এখনো পুনির মতোই সব মেয়েলী স্বর, বয়স ধরেনি। হ, ইয়াকে বলে মোতির বিটা সোনা। 'তুমাদিগের উ সব নিমের বোমা খেলুর জিলাপি আমি খেতে চাই না।' সোনা আবার ঝাঁজিয়ে বললো, কিন্তু দেখ, টান টান কালো চোখের কোণ দুটো কেমন রুপোলি নকশা বুটির মতো চিকচিক করছে।

পাঁচু তাড়াতাড়ি বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, উ সব না খাবি তো খাবি নাই। সামনেব রবিবারে বিকলে তু সিনিমা দেখতে যাবি। অই সি কি একটা সিনিমা অ্যাক্তো বড় তলোয়ার লিয়ে—।'

'যাব নাই, দেখব নাই।' পাঁচুর কথা শেষ হবার আগেই সোনা ঝেঁজে উঠলো। কিন্তু গলাব স্বব এলো চেপে। চোখের কোণে দুটো বড় বড় ফোঁটা টলটলিয়ে উঠলো, 'আমি তাঁত ছেড়ে উঠব নাই, কুথাও যাব নাই।'

পাঁচু তার নকশার ওপর কলকাঠটা চালিয়ে উঠে দাঁড়ালো, সোনার গায়ের কাছে গিয়ে উটকো হয়ে বসলো। সোনার ঘাড়ে একটা হাত রাখতেই ও ঘাড় ঝাড়া দিল। পাঁচু তবু ছাড়লো না, বললো. 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আজ ইস্কুল থেকে ঘরকে এস্থে তোকে আর তাঁতে বসতে হবেক লাই। তু বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যাবি, কেমন ?'

সোনা কথা বলতে পারলো না। হাতের কনুই দিয়ে চোখ মুছলো। হুঁ, অই রে অদধপুতা, তোমার বুকখানিও বড় টাটায়। তুমি তো বুঝ হে, তোমার ছা-বেলায় তাঁত ঘরের ফোকড় দিয়ে বিকালের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো। আর ঘরের বাইরে পাখি পাখালির মতো

ছেলেদের খেলার কিচিরমিচির শোনা যেতো। তোমার ইচ্ছা করলেও যেতে পারতে না। আপনার মন বুঝ, বিটার মনও বুঝ, বুক টাঁটাবে বইকি। মা-মুখো ছেলোটা চোখেব কোল বসা। টানা-ভরনার ওপর দিয়ে সকাল বিকালেব আলো মিলিয়ে যায়। একটু খেলার সাধ, ছোট বুকখানিতে খটখটিব মাকুর মতো এলোপাতাড়ি পেটে। পাঁচু কি বুঝে নাই, তবু সে সোনাব ঘাড়ে পিঠে ঠুক ঠুক চাপড় মেরে হেসে বললো, 'হঁ, আজ আমরা বাপ বিটায় গুলি খেলব।'

ই দেখ, ঝুপঝাপ বিষ্টি, উদিকে রোদে ঝলক দেয়। সোনা চোখের জল মুছতে মুছতে ফিক কবে হেসে উঠলো, 'যাও, ইয়া কর নাই।'

'ইযা উয়া আবার কী বে বিটা ?' পাঁচু ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাঁকলো। 'আজ পাড়ার সব্বাই দেখবেক পাঁচু কীত তার বিটার সঙ্গে গুলি খেলছে।'

সোনা এবার গোঙানোর শব্দ করতে গিয়ে হিহি করে হেসে উঠলো। পাঁচু আবাব বললো, 'তা পরে দেখা যাবেক, বাপ জিতে কি বিটা জিতে। কী বুলিস র‍্যা পুনি ?' সে মেয়ের দিকে তাকালো।

পুনির ভিতবে এতক্ষণের উপুড় করা ভরা কলসী হাসিটা খিল-খিলিয়ে বেজে উঠলো। লাটাই ফাঁদালি থমকিয়ে গিয়েছে। নোটোই কি আব চুপ করে বসে থাকতে পাবে। হাততালি দিয়ে উঠে বললো, 'হুঁ হ, আজ বাপ বিটার খেলা হবেক।'

'হঁ হ হবেক, তুও দেখবি ক্যানে।' পাঁচু হেঁকে বললো।

উদিকে পটি উয়ার তালে। সবাইকে হাসতে দেখে গতিক সুবিধা বুঝে বিটি পায়ে পায়ে বাপের নকশার পিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। চোখে পড়েছে এলুমিনিয়ামের বাটিতে বুটকলাই ভিজা। দেখেই তুলে খেতে আরম্ভ কবেছে। পুনির নজর পড়ে যেতেই হায়

হায় করে উঠলো, ‘অ বাবা, তুমি বুটকলাই ভিজা খাও নাই। হা ছ্যাখ ক্যানে, পটি খেয়ে লিচ্ছে।’

পাঁচু পটির দিকে দেখলো। পটি কচি কচি দাঁত দেখিয়ে হাসলো। পাঁচু বললো, ‘ভুলেই গেঁইচি।’ বলে হঠাৎ কী মনে পড়তেই, মুখ তুলে বললো, ‘অই র‍্যা লোটো, ত্যাখন থেকে তো কত্তাদাদা ক’ড়ে বউকে ডাকছে আর বুটকলাই ভিজা চাইছে। কে জানে তোর মা ভুলে গেঁইচে কি বাপ খেয়ে ভুলে গেইচে ? আমি আর খাব নাই, অগুলান তোর কত্তাদাদাকে দিয়া করগা। পটিটা বেশি খেলে আবার পেট লামাবেক।’

‘ক্যানে বাবা, তুমি বুটকলাই ভিজা খাও, আমি কত্তাদাদাকে একবাটি মুড়ি দিচ্ছি।’ পুনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

পাঁচু ঘাড় নাড়লো, ‘না, আমি আর বুটকলাই খাব নাই। তুদিগের মা ঘাট নাওয়া সেরে ফিরতে এখনো ঘণ্টা খানেক। আমি দোকান থেকে চা খেয়ে, ঘাট যাব, তারপরে একবার ওস্তাদের ঘরকে যেতে হবেক।’

হুঁ, উদিকে নকশাদারের মনে পাষাণলড়ির ঝাপ টান ইদিকে অর্ধপোতার বিটার জন্য মন পোড়ানি। নোটো উঠে এসে পটিকে মুখ ঝামটা দিল, হাই হাই। বুটকলাইয়ের বাটিটা নিয়ে ছুটে ঘরের বাইরে গেল। একটু আগে নোটোই কত্তাদাদার চরকার ঘ্যানানি শুনে হেঁকে উঠেছিল। এখন জগতের সামনে এসে ল্যাংলা প্যাংলা নোটো থ। দেখলো কত্তাদাদার এক পাশে জলশূন্য খালি ঘটি আর দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে কোমরের কানিতে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া কলাইয়ের বাটিতে বুটকলাই ভিজা ; যেমন তেমনই রয়েছে। বাইরের রোদে হাওয়ায় শুকিয়ে যাবার যোগাড়। জগত তার গায়ে ছায়া পড়া

নোটোব দিকে তাকিয়ে বললো, 'কে ? ক'ডে বউমা ?'

নোটো চিৎকাব কবে বললো, 'অ বাবা, হঁা গ্যাখ গ কত্তাদাদাব বুটকলাই ভিজা যেমনকাব তেমন পড়্যে রইচে, কোলতলায় লিয়ে রেখ্যে দিইচে।'

'অই, নোটো ? কী বলচু বে তু, অ্যা ?' জগত নিজে তুই ঠ্যাঙেব মাঝখানে হাত চালিযে কলাইয়েব বাটিটা পেলো। সেটা এক হাতে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ঘেঁটে ছোলা ভেজানো ঠাওর কবলো। কালো তসব স্থতো মুখেব চামডা কুঁকডে উঠলো। হা মুখেব হাসিতে লাল জিভটা নডাচডা কবলো, 'হঁ, ই ভাবি কি যে আমাব ক'ডে বউমাব এমন ভবম ত হবেক নাই। অই, শালা উয়াব লেগেই চটা আব বনা-গুলান আমাব কাছকে ঘোবাফিবা করছে।'

নোটো একেবারে শাসনকর্তা হযে উঠলো। চোখ পাকিযে ঝেঁজে বললো, 'কববেক নাই ? চট আব বনাগুলান তুমাব বুটকলাই ভিজা খেয়ে গেলে বেশ হতক। বুড়া ত্যাখন থেকে ঘ্যাঙাচ্ছে।'

ঘরেব ভিতব থেকে পাঁচুব হাঁকডানি ভেসে এলো, 'হেঁই লোটো ঘরকে আয়।'

'হঁ, তু আমাকে ধমকাচ্চু ক্যানে বে লাতী ?' জগত বললো, 'চখে দেখতে পাই নাই যে।' বলে সে নোটোব তুই ঠ্যাঙেব মাঝখানে প্যান্টালুনেব ওপব আস্তে কবে চাপড়িয়ে দিল।

আট বছবেব নোটো লজ্জায় আব রাগে লাফ দিয়ে তু পা সবে গিযে বললো, 'আই শালা।'

'ধুস শালা।' জগত মাডি দেখিযে হাসল, আর কাঁপা কাঁপা হাতে ছোলা ভেজা নিয়ে মুখে পুরলো।

নোটো ঘরে ঢুকতেই পুনি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

নোটো বললো, 'স্থাখ ক্যানে পঁদের কাছে বুটকলাইয়ের বাটি লিয়ে বস্থে আছে— ।'

'আরে লে লে হঁইচে।' পাঁচু ধমক দিল। তার দাঁতে কামড়ানো বিড়ি, উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতির ভাঁজ খুলে কাছা দিয়ে পরছে। বললো, 'তু আমার বাপ হয়্যা গেলি যে অ্যা?' অনেক-খানি ঠ্যাও তুলে কোমরের পিছনে কাছা গুজলো, বাকিটা ফেত্তা মারলো কোমর জড়িয়ে।

পটি ছুটে এলো নোটোর দিকে, হাত বাড়িয়ে এলুমিনিয়ামের বাটিটা নিতে গেল। নোটো হাত সরিয়ে ঝেঁজে বললো, 'তু পাবি নাই, বাবা খাবেক।'

না, বাবা খাবেক নাই। পুনি বললো, তু ছুটা লে বাকিটা উয়াকে দে।

পাঁচু আওয়াজ করলো 'হঁ।' ইয়ার মানে পুনির কথায় সায় দেওয়া। ঘরের এক পাশে বিস্তর জালিপাটার থাক পাঁচুর কোমর সমান উঁচু। তার ওপরে ঘর কাটা কাগজে মস্ত বড় বড় নকশা, উলটো করে রাখা। সোজায় রাখলে ধুলা পড়বেক। গুরুর কাজ বলে কথা। পাঁচুর নিজের হাতের কাজও ইয়ার মধ্যে আছে। নিজের বলতে ওস্তাদ যেমন যেমন বুঝিয়েছে, সেইরকম করেছে। তবে হঁ, অভয় খান ওস্তাদের যতো নকশা জালি পাটা, সব পাঁচুর কাছে আছে। খোদ ওস্তাদের ইচ্ছায় আছে। সাতাশখানি নকশার কাজ, একটি ছুটি না। ওস্তাদের এসব নকশায় ফিরে আবার বালুচর বোনা করতে হলে, পাঁচুর কাছকে আসতে হবেক।

জালিপাটার থাক ঘেঁষে মাটির দেওয়ালে ঝোলানো দড়িতে পাঁচুর জামা ঝুলছিল। সেটি গায়ে চাপিয়ে আগে পিঁড়ির কাছ থেকে

কেরোসিনের ফ্যাচকল ঘষে আগুন জ্বালিয়ে বিড়ি ধরালো। নকশার কাগজখানি সরু করে পাকিয়ে নিল, তাকালো সোনার দিকে, 'তা হলে অই কথা সনা, ছোট বউ ঘরকে এলে, তোর ছুটি।'

'হুঁ।' সোনার মুখে এখন মিটিমিটি হাসি। পেটলরাজে ঝুঁকে ও পাষাণলড়িতে চাপ দিল, ব-দড়ি উঠলো।

পাঁচু দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, 'পুনি, মাকে বুলিস আমি ঘাট সেবে ওস্তাদের ঘরকে যাব। তোরা চা মুড়ি খেয়ে লিস।'

আচ্ছা। পুনির লাটাই ফাঁদালিতে আবার দু হাত চলছে।

পাঁচু দরজার পাশে রাখা রবারের জুতো দুটো গলাতে গলাতে নোটোর দিকে ফিরে বললো, অই-অই নোটো পড়া করে লে। বলে সে ঘরের বাইরে গেল। বাপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। বাপ এখন বুটকলাই ভিজা মাড়িতে পাকলে পাকলে খাচ্ছে। পাঁচু কিছু না বলে হনহন করে বাড়ির ভিতর দিকে গেল। একখানা ধুতি আর গামছা নিয়ে বেরনো ভালো। দেরি হয়ে গেলে একেবারে যমুনা বাঁধ থেকে নেয়ে ফিরবে। জগত ডেকে উঠলো, কে?

জবাব না পেয়েও জগত বুড়ো এবার পায়ের শব্দেই টের পেলো, আপন মনে বললো 'হুঁ পাঁচু হবেক বটে।'

ভেজা ছোলাগুলোকে মাড়ি দিয়ে চাপতে চাপতে সে চোখ তুলে ইঁদারার ধারে আঁশফল গাছটার দিকে তাকালো। গাছের দিকে তাকালে রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যায় না। কিন্তু সে গাছ দেখছে না, পাঁচুর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করছে। ইয়াকে বুলে, পিছু ফিরে ফিরে আপনাকে দেখা। জগত নিজেকে দেখে পিছন ফিরে, পাঁচুরা সামনে ফিরে। কিন্তু জগতের মতো বয়সকালে সবাইকে পিছন ফিরে নিজেকে দেখতে হবেক। ক্যানে? না, পেটলরাজে

গোটানো বালুচরখানি খুলে দেখলে, যতো তোমার নকশা বোনার কারকিত সব দেখতে পাবেক। হঁ, এখন বুনা করে যা পাঁচু, বুনা করে যা। কিন্তু গজুটা ক্যানে এলো না? ফুড়কিটা ঘরকে গেঁইচে তো?

যাঁইচ?

হঁ। মোতির বগলে একখানি পুটলি। বললো, ধুয়ে নেয়ে, একবার মাধবগঞ্জের হাটকে যাব, তা পরে ঘরকে।

কথা হচ্ছিল যমুনা বাঁধের পুবের নিচে আঁকড় গাছ ছড়ানো আকন্দের ঝোপে ঝাড়ে। উটি বউবেটিছেল্যাদের ঘাট যাবার জায়গা। পুরুষ বিটাছেল্যাদের জায়গা আরও উত্তরের বাগে। বাঁধের পাড় গড়ের মতো উঁচু। পুবে আল ভাগাভাগি চাষের জমি, বহু দূর পর্যন্ত ছড়ানো। সবে আষাঢ় পড়েছে। এই সকালে, আকাশের হেথা হোথা কয়েক খণ্ড সাদা মেঘের টুকরো, গা এলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে পুবে। ইদিকে ই সময়ে থেকে থেকেই পচি বাতাস বহে। যাকে বলে পশ্চিমা বাতাস। এখন তাই বইছে। বাকি গোটা আকাশটা রোদ ঝলকানো টিনের চালার মতো। রোদ আকাশে, রোদ ভুঁয়ে মাঠে, ঘাটে, ইদিকে উদিকে শাল অর্জুন বট তাল আর আঁকড় আকন্দের ঝোপের মাথায়। জৈষ্ঠ্যের শেষাশেষি, আর এই আষাঢ়ের মুখে মুখে কদিন কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ই পাথর কাঁকর খরা রাঢ়ে, উ কিছু লয়। তবু মাঠের কোথাও কোথাও ভাঙা টুকরো ছড়ানো আয়নার মতো জল জমেছে। উয়াতে চাষ দেওয়া যায় না। কিন্তু দেখ, কয়েকজন মাঠে লাঙল বলদ নিয়ে নেমে পড়েছে। তাঁতী খালি তাঁত লিয়ে ঘরকে বসে থাকতে

লারে, চাষী মনিষ লাঙল বলদ লিয়ে ঘরকে বসে থাকতে লারে। বসে থাকতে কেউ জন্মায় নাই।

মোতির বাঁ বগলে পুঁটলি ; ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দাঁতে গুড়াকু ঘষছে। গুড়াকু না, বলো তামুক। ইদেশে ইয়াকে কেউ গুড়াকু বলে না। তামুকে দাঁত পবিষ্কার কিন্তু তাব থেকেও বড় কথা, উটি বড জবর লিশা। একবার সোয়াদ পেলে হয় তখন তামুক ছাড়া এক পা চলা যায় না। ঘাটে যেতে নাইতে যেতে তো লাগেই। মোতির ছুটো বিটাই শালপাতা আর কাগজে মুড়ে, ইস্কুলেও নিয়ে যায়। হঁ, নোটোরও তামুকের নেশা হয়েছে। মোতি ছুই ছেলেকেই আগে বকাঝকা করতো। বিশেষ কবে নোটোকে তামুকের পুরিয়া কেড়ে নিয়ে চড় চাপড়ও মেরেছে। কিন্তু কার দোষে কে কাকে শাসন করবে ? মোতিকে কে শাসন করবে ? পুনির বাপ ? ইস।

মোতি অবিশ্যি তাব ছেলেদের মতো, ছা-বেলায় তামুক ধরেনি। এমন কি পুনি আর সোনা পেটে আসার সময়ও ধরেনি। তখনো ঘুটে পোড়ানো ছাই দিয়ে দাঁত মাজতো।

পুনির মা বটে কি গ ? জিজ্ঞাসা ভেসে এলো, আঁকড়ের নিবিড় ছায়া আকন্দের ঝোপের অন্য একদিক থেকে।

মোতি ঝোপেব ভিতর থেকে মাঠবাগে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে পা বাড়িয়েছিল। ঝোপঝাড়ের আড়ালে, ই সময়ে আরও বউ বিটিছেল্যা আছে। গলার স্বর চিনতে মোতির ভুল হলো না, বললে, 'হঁ গ, ছোট বাউনঠান।'

ঝোপের আড়াল থেকে ছোট বামুন ঠাকরুনের স্বর শোনা গেল, 'পুনির বাপকে একবারটি আমাদের ঘরতে আইতে বুল, দরকার আছে।'

বুলব। মোতি কথাটা বলেও, মুখের ভিতর আঙুল ঘষতে গিয়ে থেমে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যানে গ বাউনঠান ? ভাল দরকার না মন্দ দরকার ?' মোতির নজর ঝোপের বাইরে, ভুরু জোড়া কোঁচকানো। কান ঝোপের গভীরে।

ছোট বামুন ঠাকরুনের কথার আগে, একটু হাসির ঠিনিক বাজলো, 'মন্দ লয় গ, ভাল। তুমাদিগের ছোট ঠাউর কলকাতায় বিয়া দিতে যাবেক। উখানকার যজমান ঘর থেক্যা পাট থানের কথা বুলা কর্যা পাইটেচে। বুইলে কী ?'

'বুইলম।' মোতি হাসলো। মেঘের আড়ালে রোদের মতোই উয়ার তামুকের মাখামাখির ফাঁকে সাদা দাঁতের ঝলক। ভুরু জোড়া সমান বাগে পেতে বলল, 'যাঁইচি গ ছোট বাউনঠান।'

জবাব এলো, 'হুঁ, আসগ।'

ঝোপের আড়াল আবডাল থেকে আরও দু-এক চাপা স্বরের ফিসফাস একটু আধটু গলা খাকরি ভেসে এলো। মোতি ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এলো। ঝোপের গা দিয়ে খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে ডাইনে পায়ে-চলা পথের দাগ ধরে বাঁধের ওপর পাড়ে উঠতে লাগলো।

(হুঁ, তামুকের লিশাটা শেষ হয়ে এসেছে)। পুনির বাপ সম্পর্কে কেউ কিছু বললেই, আগে ভাল মন্দর কথাটা মনে আসে। মানুষটার মেজাজের কথা বলা যায় না। ইদিকে উদিকে কখন ছাইপাঁশ গিলে কুটে, কাকে কী বলে আসে, কোথায় কী কাণ্ডকারখানা করে আসে, তারপরে যতো হাঁক ডাক নালিশ ঝক্কি ঘরের দরজায়। ছাইপাঁশ আর কিছু না, চেলা আর মূলা। উ লিয়ে কতো ঝগড়া বিবাদ, ইস্তক হাত তোলাতুলি হয়ে গেঁইচে। সে তুমার রামায়ণ মহাভারত বিত্তান্ত। ক্যানে, তামুকের লিশা করতে পার নাই ? মোতি অনেকবার বলেছে।

বিড়ি ছিবগেট তো আছেই। তার ওপরে চেলা মূলা হেঁড়া, উ ছাইপাঁশ গুলান ক্যানে ? উই গ, মোতির সে-কথা শুনে লসকাদার তাঁতীর কী হাসি। তামুক ? তামুক সাজা করবেক পাঁচু কীত ? ক্যানে রে, তু কি আমাকে বিটিছেলা ভাবচু, নাকি তোর পেটের বিটা ভাবচু ?

মোতির গা জ্বলে যায়। সত্যি নাকি গ ক'ড়ে বউ, তুমার গা জ্বলে যায় ? মোতির তামুক লাগা ঠোঁটে হাসি ফুটলো। সোয়ামী তাব লসকাদার, মনমোহন তাঁত কারিগর বটে। অবিশ্যি দ্রব্যগুণে মাঝে মধ্যে লাগভেলকি লাগ ঝমাঝম লেগে যায়। তা বলে মরদ মানুষ উটকো হয়ে বসে, মুখে তামুক ঘষে নেশা করছে, অই গ, তুই চক্ষেব বিষ। হঁ, মোতি তামুক লাগায়, বিটাবা লাগায় উটা মানা যায়। তাও দেখ, মোতি তার বিটাদের মতন ছা-বেলাতেই তামুক ধরেনি। এমন কি, পুনি আর সোনা পেটে আসার সময়ও ধরেনি। অনেক বউ যেমন প্রথম পোয়াতি হলেই তামুক ধরে। উ সময়টায় যে ব্যাঁতে কিছু ল্যায় নাই। মুখ দিয়ে খালি জল কাটে। গা ঘুলায়, নাড়ি পাকিয়ে বমি উঠে আসে, মাথা ঘুরায়, গায়ে তাপ। ভাত মুড়ি কিছু মুখে নিতে ইচ্ছা করে না। ঘুটে পোড়ানো ছাই, উনানের মাটি ইসব ব্যাঁতে রাখতে ভাল লাগে! হঁ, আমানির জল, অম্বল, কড়া ভাজা আলুর বড়া, আমতেল রোচে। উ সময়টায় অনেকে তামুক লাগানো ধরে। ভাবে, মুখের রুচি ফিরে এলে আবার ছেড়ে দেবে।

হঁ, তামুক সে বস্তু না। একবার গলার টাগরায় গিয়ে জল কাটাবার সোয়াদ পেলেই লিশাটিও ধরে যায়। মোতি ধরেছিল সেইভাবে। সোনা এক বছরের তখন, আবার মা ষষ্ঠীর কৃপা হলো। মোতি তামুক ধরলো, কিন্তু পেটেরটি বাঁচলো না। অথচ তামুকের

নেশাটি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ছ মাস না যেতেই আবার মা ষষ্ঠীর কৃপা। সিটিও থাকে নাই। ক্যানে? কে বুলবে? রোগ ব্যায়রাম কিছু যে হয়েছিল, মোতি কিছু বুঝতে পারেনি। পুনির বাপও কিছু বুঝতে পারেনি। এমন না কি মোতির গতর টসেছিল। জমি যেমনকার তেমনি তবু দেখ, খরা অজন্মার মতো, সব যেন শুকিয়ে পুড়িয়ে ছারখার। মোতির মনে যতো অপরখোত্তা ভাবনা। তা একটা অলক্ষুণে ভাবনা মনে আসে বই কি। হুঁ, পুনির বাবার যেমন কথা। বলতো, ডাক্তার দেখা করাবেক। উয়াতে ডাক্তারের কী হাত আছে? নাড়ি ঘেটে দেখবেক কী? সব ইয়া কথা। আকাশে ক্যানে বৃষ্টি নাই, জমিতে ক্যানে জল নাই, সংসার ক্যানে খরায় ফাটে, উসব কেউ বুলতে পারে? অই করে, চার বছরের মুখে নোটো পেটে এসেছিল। খুড়া শাশুড়ী বলতো যার যেমন আনজা। মোতির কি তাই ছিল? আটকুড়ি না হলে সব বউ-বিটি বছর বিউনি হয়। না তা নাকি লয়। কারো আঁনজা বছর বছর, কারো দু বছর, কারো তিন চার বছর।

অবিশ্যি সেই হিসাব ধরলে পুনির তিন বছর বয়সে সোনা হয়েছিল। তার মাঝখানে আর পেটে কেউ আসেনি। আবার সোনার চার বছর বয়সে নোটো হয়েছিল। ই কী রকম আঁনজা? তবে মাঝে দু দুবারে রোয়া চারায় পোকা ধরল কেমন করে? উসব কেউ বুলতে লারে। হুঁ, নোটো যখন কোলে, তখনই পুনির বাপ প্রথম জেনেছিল মোতি তামুক ধরেছে। তার আগে জানবে কেমন করে? পুনির বাপকে দিয়া ত দোকান থেক্যা কখনো আনা করায় নাই। ইয়াকে, উয়ার তাঁত মাদ্দারকে কখনো বা শ্বশুরকে বুলে তামুক কিনা করাইচে। হুঁ, মোতি হাসবেক নাই ত কী করবেক গ?

এখনো ঘটনাটা নজরদার নকশার মতো চোখে ভাসে। বিকালে, মরদবিটারা যখন সবাই ফাগবাগে গেইচে, না তো বলো বুলতে গেইচে, যাকে বলে ঘুরতে ফিরতে যাওয়া সেইরকম এক বিকালে ঘরের দরজার সামনে বসে মোতি নোটোর মুখে তন দিয়ে তামুক ল্যাগাচ্ছিল। হা ছ্যাখ গ উ সময়টিতেই আনতাবাড়ি শ্বশুরের ছোট বিটা দরজায় হাজির। মোতি নোটোকে বুকে নিয়ে ঝটপটিয়ে উঠেছিল। আগে টেনে দিয়েছিল মস্ত একখানি ঘোমটা। তা বুললে কি হয়। উয়ার পেথম কথা, অই গ ক'ড়ে বউ তু তামুক লাগাচ্চ কী?

হঁ, বাপের মতো বিটার মুখ থেকেও মাঝে মাঝে ক'ড়ে বউ ডাক বেরায়ে আইত। উ কথার আবার জবাব কী আছে? মোতি তাড়া-তাড়ি নোটোকে মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে জল ভরা ঘটি নিয়ে পুনির বাপের পাশ দিয়েই বাইরে গিয়ে কুলকুচা করে মুখ ধুয়েছিল। পুনির বাপ তখন বলেছিল, হঁ, ইয়া—মাঝে মাঝে মনে লিত কি তোর মুখ থেক্যা তামুকের ঘেরান পাইচি। কিন্তু কুন দিন চখে পড়ে নাই, উ আমারই আনখা চিন্তে। হঁ, এখন দেকচি আমার ভুল হয় নাই।

হয় নাই তো হয় নাই, মোতি কী করবেক? তুমাকে বুলতে যাবেক কি আগে আমি তামুক ধরেচি। কিন্তু নিজের মনের কাছে তো ফাঁকি নেই। মোতি মনে মনে ভয় পেয়েছিল। উ মানুষের মেজাজ বোঝা ভার। ভেবেছিল, হয় তো রাগ করেছে, এখনই হাঁকোড় দিয়ে উঠবে। উঠলেই বা তখন কী করার ছিল? মোতি উ কথার কাছে ঘেঁষে নাই। বরং জিজ্ঞেস করেছিল, চা খাবেক কি? জল বসাই।

নোটো তখন ভুঁয়ে পড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ শুরু করেছিল। পুনির বাপ

পায়ের জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে, ঘরের ভিতর ঢুকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল, উয়াতে আমার না নাই, দিবি দে।

মোতি ঘরের বাইরেই ছোট পিড়ার ছোট উনুনটায় কাঠকুটো জ্বেলে বাটিতে জল ফুটিয়ে হাত চালিয়ে চা করে দিয়েছিল। চায়ের গেলাসটি পুনির বাপের সামনে রেখে তার কোল থেকে নোটোকে নিজের কোলে নিয়েছিল। সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের ভিতর বাগে, তাঁতের কাছে। হঁ, তখন এক ঘরেই তাঁত, ঘরকন্না। মোতি তাঁতের কাছ থেকে পুনির বাপের দিকেই তাকিয়েছিল। পুনির বাপও পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। চোখোচোখি হতেই পুনির বাপ হেসে উঠেছিল। মোতিও হেসেছিল। কিছুটা আড়ষ্ট, একটু বা ভয় আর লজ্জা ছিল হাসিতে, কিন্তু চোখের তারায় ছিল মীনা করা রেশমী ঝিলিক। শ্বশুরের ছোট বিটা বলেছিল, তা আমাকে বুলিস নাই ক্যানে? তোর তামুক কি তোর ভাতার কিনে লিয়া আইতে পারত নাই?

হঁ, তাঁতী মরদ মিনসেদের অমনি কথা। মোতি ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে বলেছিল, জানি নাই। উ আবার বুলব কী?

বুলতে হবেক নাই? পুনির বাপ চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেছিল, ঘরের মাগ তামুক ধরেচে, ভাতার জানবেক নাই? ই কি একটা কথা হল? ঠিক হ্যায় আজ থেক্যা আমি তোর তামুক কিনে লিয়ে আসব।

হঁ, আর উটিই হল কাল। মোতির তামুক থেকেই, প্রথমে সোনা, তারপরে নোটোটাও এই সিদিনে মাজতে আর নেশা করতে শিখেছে। তবে আর মোতি কেমন করে শাসন করবে? দাঁতে তামুক ঘষতে ঘষতে মোতির আবার হাসি পেলো। মনেও এখন টুকুস শান্তি। ঘাট ঝোপে ছোট বাউনঠানের কথা শুনে মনটা আনখা কেমন বিকল্যায়ে

উঠেছিল। হঁ, উ মানুষেব কথা কিছু বলা যায় নাই। মোতি তার দুই বিটা লিয়ে যাত ধুকপুকিয়ে মরে উয়াব থেক্যা বেশি মরে উযাদেব বাপকে লিয়ে। ছোট বাউনঠাউরেব সঙ্গে বসে পুনির বাপ আবাব চেলাটা মূলাটা খায় তো। হঁ, উবেলা বামুন তাঁতী নাই। দুটিতে বড বন্ধু। হবেক না বা ক্যানে? পুনির বাপ যে আবাব ছোট বাউন-ঠাকুরেব ভিক্ষা ভাই হয়। ছোট বাউনঠাকুবেব ভিক্ষা বাবা হলো মোতিব শ্বশুব। উ-সব হলো বামুনঠাউবদিগেব ব্যাপার। মোতিব বাবাও এক বাউনেব ভিক্ষা বাবা। দস্তুর হঁইচে কি, সোনা নোটোব বয়সে বাউনের বিটাদিগের যখন পৈতা হয়, তখন ছোট জাতের এক-জনের কাছ থেক্যা তিন দিন বাদে পেথম ভিক্ষা লিতে হয়। তবে হঁ, এমন জাত হওয়া চাই, যাদেব জল চলে। তা বুলে তাঁতী ঘবেব াঁধা ভাত খাওযা চলবেক নাই। যে দেশে যেমন নিয়ম। ই দেশে ইবকমটি চলে। পৈতা হওয়ার তিনদিন বাদে ভিক্ষা বাবার হাত থেকে, খোকা বামুন ভিক্ষা ল্যায়। যে যে রকম অবস্থাব ভিক্ষাবাবা হয়, সে সেই-রকম ভিক্ষা দেয়। চাল ডাল তেল মশলা সবজি ফল মূল মিঠাই মণ্ডা, কাপড় চোপড়। উসবে কুন বাবণ নাই। তেমন ভিক্ষাবাবা হলে এক বছর রোজকার বোজ বামুন ছেলেকে কিছু না কিছু দিয়া করে। মোতি শুনেছে, তাব শ্বশুবও নাকি এক বছব ধরে ছোট বাউনঠাউরকে রোজ কিছু আনাজপাতি দিয়ে আসতো।

হঁ ভিক্ষাবাবার বিটা হলো ভিক্ষাভাই। বোন হলো ভিক্ষা বোন। ইয়াতে কেবল নিয়মকানুন নাই, ভালবাসা ভক্তি ছেদ্দাও আছে। উটো তাঁতীর খুব মানের কথা। তা মান আছে, ভক্তি আছে, পাতা-পাত করে খাবার নিয়ম নাই। কিন্তু এক গেলাসে চুমুক দিয়া হয় কেমন করে? না, উ দব্যের নাকি কোন জাতপাত নাই। বুঝ ক্যানে?

মোতি কতদিন পুনির বাপের মুখেই শুনেছে, ছোট বাউনঠাউব ভিক্ষা-ভাইর গেলাস টেনে নিয়ে চুমুক দিয়েছে। শুনলে মোতির গা জ্বলে যায়। বাউনঠাউর টেনে লিল আর তুমি দিয়ে দিলে? উয়াতে যে তোমার পাপ হয় গ? তুমি হলে তাঁতী, সে হলো বামুন। বামুনের তো পাপ লাগবেক নাই। লাগলে তোমারই লাগবে। অই গ, মোতির কথা শুনে পুনির বাপ হাসে, বলে, লে লে। উয়াতে পাপ লাগে নাই।

উ কথা বললেও মোতির মন মানে না। ছোট বাউনঠাউবই বা কেমন মানুষ। আপনি না বাউন বটে? ভিক্ষা ভাইয়েব এঁটো তুমি খাও ক্যানে? হঁ, খালি দব্যের দোষ লয় গ, মাতালদের কুন জাতপাত নাই। উয়াদের সব চলে, সবই পারে। এ কথাটা মনে হলেই, মোতির বুকের টানায় যেন দক্তি আটকে যায়। অপর-খোতা ভাবনা আসে মনে, ভয় ভয় কবে। দ্রব্যগুণে কী না হয়? জাতপাত ভুলে যায়, ঘরের কথাও য্যাখন ভুলেও যাবেক গা? ত্যাখন?…ইয়াব উপরে আবার ঝগড়া বিবাদও আছে। উটিতেই মোতির ভয় বেশী। ঝগড়া বিবাদ অনেক সময় আপোষে হাতাহাতি মারামারিতেও পৌঁছায়। সে জন্যই ছোট বাউনঠানের কথায় মনটা আনখা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। বৃত্তান্ত শুনে এখন মনে টুকুস শান্তি। ছোট বাউনঠাউর কলকাতায় বিয়া দিতে যাবেক। উয়াদের অনেক জায়গায় অনেক বড় মানুষ যজ-মান আছে। দোল দুর্গোৎসব বিয়ে শ্রাদ্ধ, নানা পূজাপাটে ইখানকে উখানকে যাওয়া লেগেই আছে। তা দু-একখানি পাটের থান যদি পুনির বাপের হাত দিয়ে কিনা করায় দু-একটা টাকা পাবেক।

পাটের নামই রেশম। পুবা লোকেরা বুঝতে লারে। পুবা লোক হলো, কলকাতার দিকের মানুষ। উয়াদের কথাকে বলে পুবা কথা,

যাচ্ছি যাব, খাচ্ছি খাব, হচ্ছে হবে, ই রকমের কথাবার্তা উয়াদের। উয়ারা পাট বুললে ভাবে, খেটার কথা বুলছে। উয়ারা খেটাকে বলে পাট। খেটা হলো মানুষের মাথা ছাড়ানো গাছ, ইদিকেও আজকাল মাঠ জুড়ে খেটার চাষ হয়। আগেও হতো, এখনকার মতো এত না। আগে অল্পবিস্তর হতো। খেটা শাক খেতে ভালো। নাল হড়হড়ে, চুন দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে ধুয়ে সাফ করে রাঁধলে মুখে ভাত রোচে। কেউ কেউ নালতে শাকও বলে। খেটা গাছের গা থেকে যে সুতো বেরোয় তা দিয়ে চট ছালা ইসব বুনা করে। এদানি খেটার সঙ্গে পাটের মিশেলও হচ্ছে। আজকাল সবই ঘুগিদিগের কারবার। চালাকরা ছাড়া উসব কারবার কেউ করতে লারে। দিনকাল উইরকম হঁইচে।

যাতে হাত দিবে উয়াতেই ভেজাল। আলপাকায় আবার কবে খেটার ভেজাল মিশেল হতো? মোতি শোনে নাই। আরও আজকাল কী সব অঁইচে, লাইলন মাইলন টেরালিন মেরালিন কী সব ছাই নাম গ বাবা। পুনির বাপ তাই মাঝে মাঝে বুলে, উ সব ভেজালেই আমাদিগের সব লিয়া যাবেক গ।…কী অপরখোতা কথা।

অই, অই বাঁধের ওপরে এসে পচি বাতাস গায়ে লাগতে মোতির গা জুড়ালো। যতোক্ষণ বাঁধের আড়ালে ঘাট ঝোপের ওপারে ছিল, ততোক্ষণ রোদের তাপে গা জ্বালা দিচ্ছিল। আর ই সময়টায় রোদে গরমে গা শুকনো খসখসে থাকে না। চৈত বৈশেখে যেমন থাকে। ই সময়টায় বিনবিনিয়ে ঘাম ছাড়ে, গা চিটা চিটা লাগে। বাতাস লাগলে আরাম। মোতির গলা চিবুক কপাল নাকের ডগা ঘামে চিকচিক করছে। হঁ, গতরখানিও ঘেমেছে। গায়ের জামাটিও টুকুস ভিজ্যা গেঁইচে। তবু তো উই কী বুলে গ উয়াকে, জামার ভিতর বাগে আর একখানি জামা পরে নাই। মোতির মতন কুন তাঁতী বউ বা

উসব পরে। যারা পরে তারা পরে। মোতির যেন বুক চেপে দম আইটকে আসে।

না, এমন না কি যে, মোতির শরীরখানি লম্বায় চওড়ায় মস্ত। বরং দেখলে মনে ল্যায় পুনিব ওপরের দিদিটি হবেক। হঁ, এখনো মোতিকে এমন কচি কাঁচা দেখায় কে বুলবে চার বিটা বিটির মা। উয়াদের মাঝখানে তিনটি শত্তুব আবার দাগা দিয়ে গেইচে। বেঁচে বর্তে থাকলে সাত। মোতিকে দেখে কে তা বুলবে। পুনি শাড়ি পরে পাশে দাঁড়ালে পিঠোপিঠি বোন মনে হবে। পুনির তবু বাপের আড়া, চৌদ্দতেই বেশ মাথা চাড়া দিয়েছে। মোতি তার বিটির থেকেও, এক ছোট নলির মতো খাটো হবে। পলু—যাকে বলে রেশমগুটি সিদ্ধ করে তার গা থেকে প্রথম ছাড়ানো সুতোর মতো রঙ। নকশার গলানি মাকুর মতো টানা চোখ, দুই তারা যেন মীনা করা ঝিলিক দেওয়া রেশম। নাকখানি চোখা লয় বটে, তবে বোঁচা বুলতে লারবে। নাকচাবির পাথর বোদে চমকাচ্ছে। ভুরু দুটি কুচকুচে কালো, অথচ সামান্য নারকেল তেল ঘষা চুল যেন তেমন কালো না, গাঢ় খয়েরী। কিন্তু গোছাখানি দেখ, এলো খোঁপায় জড়ানো দশ গুছি পাকানো রঙের রেশম। ঠোঁট তামুক ঘষা থাকলেও পুরুষ্ট ভাব বোঝা যায়। ছিপছিপে অথচ যেন এই সিদিনে বিটির শরীরে ঢল নেমেছে। কপালে আর সিঁথেয় বাসি সিন্দুরের দাগ এখন ঝাপসা। পায়ের আলতার দাগও কয়েকদিনের বাসি। রোজ কি আর তাঁতী বউয়েবা আলতা কাজল মাখবার সময় পায়। কাজল তো কালে ভদ্রে, আলতা মাঝে মধ্যে। চুল রোজ বাঁধতে লাগে, উটি ছাড়া রাখতে নাই। দুই হাতে একখানি করে শাঁখা, পলার মতো লাল রঙের দুখানি বালা। কিন্তু পলা না। অমন দুখানি পলার বালার দাম অনেক। ইও সেই

লাইলন মাইলনের মতো কী দিয়ে তৈরি, মোতি জানে নাই। পুনি কিনে এনে মাকে পরিয়েছে।

না, মোতি এক জামাব ভিতর বাগে, আর এক আঁটসাঁট জামা পরতে লারে। অথচ তার বিটি পুনি পবে। টুকুস মাথা চাড়া দিলেই এদানি ছাখ গা সব মেয়্যা বিটিরাই পবে। লাল বাঁধের ধাবে কলেজে আর শহবেব ইস্কুলগুলোতে যায় যে মেয়্যাবিটিবা সবাই পবে। মোতিব নিজেরও ভিতব বাগেব জামা ঘবে আছে। পবে না। পুনি কতো টানা বুলা করে, হা শুন গ মা, পব ক্যানে, তোমাকে নতুন বউয়ের মতন লাগাবেক।

আ দূব ছুঁড়ি। মোতি এখন লতুন বউ হবেক বটে। বিটির কথা শোন। দু গণ্ডা ছা বিউনি এখন তন তোলা কবে খুকি সাজবেক? মোতি হাসবে না কাঁদাবে বুইতে লাবে। হঁ, উয়ারা বাপ বিটি সব এক গ। অথচ মানুষটিকে তার বিলক্ষণ জানা আছে। পাড়ার অনেক বউবিটিদেব কতো বাখান করে। কাব কেমন সাজগোজ জামা কাপড় পবা, সবহদ্দমুদ্দ তড তল্লাস যেন উয়াব জানা। ভারি ফিচলা আছে। মবদ বিটাদের এত লজর ক্যানে? আর সে সব বাখান যদি শোন, হেসে মরে যাবে। কান পেতে শোনাও লজ্জার। কার বউকে কোন শাড়ি জামায় কেমন দেখায়, কী সাজে কী রূপ খুলেছে পিতিটা কথা শুনা করাবেক। আর ওজর পেলেই মোতিকে বুলবে, অই গ, ভিতর বাগের জামাটি পরবি নাই। শাড়িখান কুচিয়ে পর। মুখে ছাই অমন সাজের। বড় ঘরের আর ইস্কুল কলেজের বিটিদের মতো শাড়ি পববে মোতি? ক্যানে? কিষ্টগঞ্জেব অনাথ সুয়ের বিটি কি নাজনজ্জার মাথা খাঁইচে?

হঁ, লোকটা বলে আর হাসে আর মোতির দিকে এমন করে

তাকায়, এই দু গণ্ডা বিউনিই এখনো লাজে মরে যায়। মোতির সাজগোজের ব্যাপারে উয়ার রাগ ঝাল কিছু নাই? আবার মাঝে মাঝে বুলে কি, 'তোঁকে একখানি বালুচবে সাজা কবাবক।'···ছি ছি, কী কথা গ। তোমার ওস্তাদ অভয় খান, দু দুখানা পাকা দালান কোঠা করাইচে। উয়াব বড় বিটির গায়ে কখনো এক কানি পাট দেখেচ? যাকে বলে বেশম? বালুচর তো দূবেব কথা।

মোতিব বুক থেকে একটা দমকা নিশ্বাস ঝোড়ো হাওয়ার মতো উঠলো। কিন্তু ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বুকের ভিতরেই আছাড়ি-পাছাড়ি করলো। ক্যানে কে জানে। সে দেখলো যমুনার মাঝখানে টেসকনাটা জলের মধ্যে টুপুস করে ডুব দিল। যাকে বলে মাছরাঙা। বিষ্টুপুরের সব বাঁধেই এখন জল শুকিয়ে গিয়েছে। তবু যমুনা যেন সব থেকে বেশি। কতো দূব বাগে, একজন একটা কেচাঁ লিয়ে কোমর জলে মাছ মাববার ফিকিবে ঘুবছে। দক্ষিণের যেদিকটায় বেড়া বনে ঠাসাঠাসি হয়ে উঠেছে, ছোট জাল হাতে আবও দুজন ঘোরাঘুরি করছে। দূবের সারিতে বিষ্টুপুব ইস্টিশন আর রেল লাইন দেখা যায়। তাব কাছখানকেই একটা চালবল।

মোতি তাড়াতাড়ি বিটিবউদের ঘাটের দিকে নামতে লাগলো। ঘাট একটা না। বউ বিটিদের দুটো ঘাট। আগের দিনের পুবনো ভাঙা ঘাটে বিশেষ কেউ যায় না। চ্যাটাং মতো শক্ত বালি কাঁকুরে জমি এক জায়গায় জলের মধ্যে নেমে গিয়েছে, সেখানেই মেয়েদের ভিড় বেশি। বিটা মরদদের ঘাট আরও উত্তর বাগে। বউ বিটিরা সবাই প্রায় চেনা। মাধবগঞ্জ পাটরাপাড়া কালীতলার বাউন তাঁতী বাউরি, সব বউ বিটিরাই আছে। হঁ, জলে কোনো জাতপাত নাই। তবু বাউড়িরা আমনার মনে একটু দূরে দূরে। কেউ কেউ বা দখিন বাগে,

চরের ওপারে।

মোতি বাঁ বগলের পুঁটলিটা সাবধানে নামিয়ে রাখলো এক পাশে। শাড়ি সায়া আর জামা আছে। তার ভিতরে আলাদা একটা ন্যাকড়া বাঁধা পুঁটলিও আছে। উটিতে আছে তসর লাড়ো। গুনে এনেছে, গোটা পঁচিশ আছে। রেখে দিয়েছিল কয়েকদিন। আজ নিয়ে বেরিয়েছে। ওসব গুটির ভিতরের মরা পোকা। পাট পলুব পোকা থেকে অনেক বড়, পুরুষ্টু মোটা মাথা ছাড়ানো চিংড়ি মাছের মতো। উয়ার নাম তসর লাড়ো। লাড়ু বলো, আর নাড়ুই বলো, উ বস্তুটি বাউরিদের বড় ব্যাতে জল ঝরানো খাবার। কেবল বাউরি ক্যানে, হাড়িডোম বাউরি সগগলারই। পস্তু দিয়া রাঁধে লয় তো ভেজে খায়। উয়ারা বুলে তসর লাড়ো ভাজা গরম তেল জিবের ঘায়ে লাগা করালে ঘা শুকয়ে যায়। মাধবগঞ্জের বাজারে মাছ আনাজপাতি নিয়ে যারা বসে তারা অনেকেই হাড়ি বাউরি। তবেই বুঝ মোতি ক্যানে তসর লাড়ো গুলান লিয়া বেরাইচে?

মোতি শাড়ি সায়া জামা দিয়ে লাড়োর পুঁটলিটা ভালো করে ঢাকা দিয়ে রাখলো। নইলে দেখতে না দেখতে পিমড়ে এসে ধরবেক। আর ইয়া—হুঁ, বুকের ভিতর বাগে জামা পরতে পারে নাই বটে, শাড়ির নিচে সায়া ছাড়া পথে ঘাটে চলা যায় না। মোতি আপন মা শাউরিকে কখনো সায়া পরতে দেখেনি, কিন্তু উটিতে মোতির ঠেক লেগে গেইচে। তাঁতের আর মিলের যেমন শাড়িই হোক, যতো মোটাই হোক, ভিতর বাগে সায়া না থাকলে কেমন আগলা আগলা লাগে। ঘরে যদি বা একরকম চলে, বাইরে বেরান যায় না।

অই গ পাঁচুর বউ, তোমার ছোট বিটির জ্বর ছেড়েচে?

মোতি ঘাটের বাঁ ঘেঁষে জলে নামতে নামতে চেনা স্বর শুনে ডান

দিকে ফিরে তাকালো। ঠাকুরপাড়ার ভটচাজবাড়ির মেজ গিন্নি। মেজ ভটচাজ হোমোপ্যাথ ওষুধ দিয়া করে। চকে বাজারে কোথাও ডাক্তারখানা নেই। যাদের বলে ডাক্তার, মেজ ভটচাজ ঠাকুর সে রকম ডাক্তারও না। কিন্তু উয়ার একখানি ওষুধের বাসকো আছে। সাদা ছোট দানা লয় তো পুরিয়া করে ওষুধ দেয়। চার আনা আট আনা, খুব বেশি তো এক টাকা ল্যায়। ডাক্তারি উয়ার পেশা লয় বটে, পুজাপাট করে। তার সঙ্গে উইটিও চলে। আশেপাশের সব পাড়ার লোকেরাই মেজ ভটচাজের কাছ থেকেই ওষুধ নেয়। ঘর করতে, হাঁচি কাসি, টুকুস জ্বর জ্বালা, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হলে, বউ বিটিরাই মেজ ভটচাজের কাছে যায়। বিশেষ করে বাচ্চাকাচ্চাদের বেলায় তো বটেই। মোতি কয়েকদিন আগে ছোট মেয়ে পটির জন্য ওষুধ এনেছিল। মেয়েটার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। মোতি বললো, হঁ গ মাঠান, বিটি ভাল আছে। কাঁচা জল পাকা হঁইচে, জ্বরটা গেঁইচে। ডাক্তার ঠাউর আমাদিগের ধন্বন্তরি।

ভটচাজদের মেজগিন্নির জলে ভেজা মুখের হাসিতে টেসকনার ভেজা পালকের ঝলক। মোতির থেকে বয়স কিছু বেশি কিন্তু চেহারা-খানি এখনো টসটসে। বললো, অই গ, ধন্বন্তরি আবার কী? বিষ্টুপুরে অনেক বড় বড় ডাক্তার রঁইচে, উয়ারা ধন্বন্তরি।

মোতি জবাব দেবার আগেই পাটরাপাড়ার এক তাঁতী বউ বুক জলে দাঁড়িয়ে বললো, উটি বলবেন নাই গ মাঠান। বিষ্টুপুরে যাতোই বড় ডাক্তার থাকুক গা, আমাদিগের ডাক্তার ঠাউরের কাছকে উয়ারা কিছু লয়।

হঁ, ডাক্তার ঠাউর না থাকলে, আমাদের ছা-বাচ্চাগুলান বাঁচত নাই। আর একজন বললো, আর উ সব বড় ডাক্তারগুলানের কাছকে

যাও মুঠা মুঠা টাকা ঢাল, গলা দিয়া গলে নাই, ইয়া বড় বড় বড়ি গিলা করাও, আর ছুঁচ ফোটাও। চিকিচ্ছেব মরণ।

হুঁ, ভটচাজদের মেজগিন্নিব মুখে টেসকনার খোলা পাখার রঙের ঝলক। সোয়ামীর কার্বকিতের গীত শুনতে কোন বউয়ের ভালো না লাগে? মোতি তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়ে কুলকুচা করে দাঁতে আঙুল চালিয়ে নিল। ঝুপ করে ডুব দিয়ে নিজেকে ধুয়ে সাফ করে এক খামচা মাটি তুলে হাতমাটি করে নিল। জল থেকে মাথা তুলে, আগে খুলে দিল এসো খোঁপা। শাড়িব আঁচল বুক থেকে খুলে নিয়ে হাত মুখ ঘষলো। উতেই গামছার কাজ চলে যায়। তার মধ্যেই কেমন একটা ঠেস দেওয়া খরখরে স্বর শোনা গেল, উ কথা বুললে ত হবেক নাই। বড় ডাক্তাররা কি আর মাদ্দার খিট্যা বড় হুইচে? গেল হপ্তায় আমার গা গতরে কী যন্তন্না, ব্যাতে কিছু রুচে নাই। চকের ডাক্তার—অই কী নাম, কায়েত গ—কী বোস যেন, গোটা কয় বড়ি দিইচিল, একদিন খেয়্যাই আমার গা গতরের যন্তন্না কুথাক গেল।

মোতি দেখলো, তার বাঁ দিকে কয়েক হাত দূরেই কোমর জলে যোগেন বাঁটের বউ। কথাগুলো সে-ই বলছে, পাশে আর একজনকে সাক্ষী করে। কিন্তু আসলে মোতি, ভটচাজদের মেজগিন্নি আর বাকিদের শুনিয়ে। উয়ার নাম টুকি। অই গ, ই আবার কখন এলো? মোতির আগে, না পরে? দেখতে পেলে মোতি কখনো টুকির এত কাছখানের জলে নাইতে নামতো না। বেহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর বুলতে লারবে, টুকি ক্যানে মোতিকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। উয়ার সোয়ামী যোগেনও পুনিব বাপকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। কথাবার্তা নাই। ক্যানে? না, উয়ার একটা কারণ থাকতে পারে। যোগেন হলো কালীচরণ হেঁসের চেলা। কালীচরণ হেঁসও একজন

লসকাদার ওস্তাদ বটে। কিন্তু বিষ্টুপুরের সবাই জানে, অভয় খানের কাছে কিছু না। উসব হলো ওস্তাদ চেলাদের ব্যাপার। কিন্তু টুকি গোড়া থেকেই মোতির ওপর খরিশ ফোঁসানি। ক্যানে? ধনে মানে রূপে টুকি অনেক বড়। যোগেন বীটেরও নিতাই দাসের মতো রাম-সাগরের মৌজায় নাকি বিস্তর চাষেব জমি জমা আছে। কেবল তাঁতে ভাতে নেই।

হঁ, আর রূপ? টুকি মোতির বয়সী হবে বা, কিন্তু দেখ, কাবাই করা রেশমের মতো গায়ের রঙ। দেখলে মনে লিবে কি জাত পোদ্দারের হাতে গড়া সোনার পিতিমে। যাকে বলে স্যাকরা সে-ই হলো পোদ্দার। পিতিমের মতোই চোখ মুখ, শরীরের গড়ন। এক পিঠ কালো কুচকুচে চুল। উদিকে দেখ, দু হাতে সোনার চুড়ি, হাতের ডানায় নকশা কাটা সোনার অনন্ত, গলায় বিছা হার, নাকে নাক-চাবি, কানে চৌকো মাকড়ি। তবে হঁ, একটা কী কথা, মা ষষ্ঠী উয়াকে কৃপা করে নাই। আড়ালে আবডালে সবাই উয়াকে আঁটকুড়ি বলে। মোতি মনে মনে বলে কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলে না। উয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতই বা কতটুকুনি? উ থাকে বৈদ্যপাড়ায়। এই যমুনায় নাহতে এলে মাঝে মধ্যে দেখা হয়। কখনো বা ইদিকে উদিকে পালা পার্বণে মেলায় মন্দিরে। তবু মোতির মন করে, উয়ার মুখ না দেখা ভালো। উয়ার সোয়ামীর মুখও না দেখা ভালো। অন্য সময়ে না হোক, সাত সকালে বটে। ঘর থেকে বের হয়ে ঘাট যাবার পথে দেখা হওয়া সে-বড় আখরপোতা বিষয়। উ দিনটি ভালো যাবেক নাই। এ হলো মনের কথা। কিন্তু টুকি ক্যানে মোতিকে দেখতে লারে? মোতি আগে আগে কয়েকবার যেচে সেধে কথা বলতে গিয়েছে। অই গ মা, কথা বুলা করা দূরের কথা খরিশ লজরে যেন আগুন ছিটায়।

উঠি গ পাঁচুর বউ। ভটচাজদের মেজগিন্নি বললো।

মোতি মেজগিন্নির দিকে ফিরে তাকালো। উয়ার মুখে হাসি চোখে রঙ্গ নজরের ইশারা টুকির দিকে। মোতি বললো, হুঁ আমারো হয়্যা গেঁইচে। বলেই ঝুপ ঝুপ করে কয়েকটা ডুব দিল। কোনোদিকে না তাকিয়ে জল ঠেলে ওপরে উঠলো।

হুঁ, ইদিকে ঘটনা অন্য রকম। মেজ গিন্নি পা চালিয়ে বাঁধের ওপর পাড়ে উঠে যাচ্ছে। পাটরাপাড়ার বউটিই, তার পাশে আর একজনের দিকে ফিরে বললো, ইয়াকে বলে গাছে উঠে মরতে জামিন হয় দিতে।

মোতি ভেজা শাড়ির আঁচল নিংড়ে হাত গলা মুখ মুছলো। চুলের গোছা পাক দিয়ে জল নিংড়াতে নিংড়াতেই দেখলো, টুকির সোনা মুখে আগুবার ঝলক। চোখের পাতা কোঁচকানো, নাকের পাটা বুকের বাঁধ ফুলে ফুলে উঠছে। নজর পাটরাপাড়ার বউয়ের দিকে। গলার স্বর থরথরিয়ে উঠলো, উ কথা কাকে বুলছ, শুনি ?

মোতি নিংড়ানো শাড়ি গায়ে জড়িয়ে জামাটি খুললো। না, ইসব ঝগড়া বিবাদ ভালো লাগে না। কিন্তু দেখ, টুকি জল ঠেলে ঠেলে পাটরাপাড়ার বউয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাটরাপাড়ার বউ মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, কিন্তু জবাব দিচ্ছে আর একজনের দিকে তাকিয়ে, জলের মাছ যদি গাছকে উঠে উয়াকেও জামিন দিতে লাগে। বেশি বাড়াবাড়ি ভাল লয়।

মোতির দাঁতে ধরা গা থেকে খোলা জামা। নীচু হয়ে শুকনো জামাটা তুলে, দু হাতে গলিয়ে বুকে জড়িয়ে নিল। টুকি দু হাতে থাবড়িয়ে ছিটকিয়ে স্বর চড়িয়ে বলো, তু কাকে বলচু উসব কথা, শুনি ক্যানে ?

লাও, কী অঘটন না জানি ঘটে। টুকির এখন মারমুখী মূর্তি। তা

পুরুষ্টু লম্বা গহনা পরা হাত দুখানিতে যে শক্তি আছে, এক নজরে বোঝা যায়। এবারে তুই তোকারি শুরু করেছে। মোতি তাড়াতাড়ি শুকনো শাড়িটি নিয়ে কোমরে বেড় দিয়ে ভিতরের ভিজা শাড়ি সায়া খুলে মাটিতে ফেলে দিল। এক নজরে দেখে নিল তসর লাড়োর পুঁটলির দিকে। না, পিমড়ে ধরে নাই এখনো। উদিকে পাটরাপাড়ার বউ জল ঠেলে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। উঠতে উঠতেই বলছে, অনেক করে বক পুষেচি শখ কর্যে হরি নাম বুলাতে গেলাম, উঠল সেটা কঁক কর্যা। কেগা বগা ভাল বুলতে লারে।

মোতি খিলখিল করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। কোনোরকমে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, হাসি সামাল দিল। সে কোনোরকমে কোমরে শাড়ি জড়িয়ে গুঁজে গায়ে চাপিয়ে ভেজা শাড়ি জামা এমনিই নিংড়ে নিল। এমন আনতাবাড়ি ঘটনা না ঘটলে জলে নেমে জামাকাপডগুলা ধুয়ে নিংড়ে নিত। কিন্তু কিসের থেকে কী ঘটে কে জানে? এখন তাড়াতাড়ি ঘাট ছেড়ে যেতে পারলে হয়। টুকি তখন জল থেকেই চিলের মতো ডাক ছাড়ে, পলাচ্চু ক্যানে ছিনাল মাগী। ঘাটে নাঙিন করতে এয়েচু? যা যা, পঁদে নাই ছাল চামড়া / লাচতে যাইচে খাটরাপাড়ায়।

মোতি এক হাতে ভেজা কাপড় জামা, আর তসর লাড়োর পুঁটলি নিয়ে পা চালিয়ে বাঁধের ওপর বাগে উঠতে লাগলো। পাটরাপাড়ার বউটা তখন ভেজা কাপড়েই ওপরে উঠতে উঠতে বলছে। হুঁ, যিয়াদের য্যাতো উয়াদের ত্যাতো পরের ভালয় জ্বলুনি, ক্যান রে বাপু, নিজের ধন দৌলত লিয়ে থাকগা। আঁটকুড়ির মুখ দেখলে পাপ।

টুকির ডাকিনী হাঁক শোনা গেল, চলে যাচ্ছ ক্যানেরে হারামজাদী।

ইয়ার পরের কথাগুলান মোতির কানে যেন খটখটির মাকুর মতো জোরে থাবড়াতে লাগল। সে তখন বাঁধের ওপর গো-গাড়ি চলবার মতো রাস্তার ওপবে। হাঁটা দিয়েছে দক্ষিণে। তার মধ্যেই একবার নিচের দিকে তাকালো। বৈদ্যপাড়ারই এক বউ টুকির হাত টেনে ধরে বলছে, আ অইগ দিদি, কুথাক যাইচ গ? উয়াব কথায় কান দিচ্ছ ক্যানে? উ ত পলাই গেঁইচে।

টুকির চিৎকাব শোনা গেল, এক মাঘে জাড় যায় নাই গ খটখটি তাঁতীর মাড় খাউনি মাগ। হাবরায় লাড়া খাওয়া করাব তোকে…।

হুঁ, গরুব খাবার দেবার পাত্রে টুকি খড় খাওয়াবে পাটরাপাড়ার বউকে। মোতির হাসিও পায়, ভয়ও লাগে। ঝগড়াঝাঁটি আব খারাপ কথাকে তার ভয়। তাব বড় জা মাঝে মাঝে উ সব গাল পাড়ে। আর দেখ ক্যানে টুকির চিৎকার গালাগাল শুনে, বউবিটি মরদরা সব রগড় দেখবার জন্য ভিড় করে আসছে। মোতি জানে, পাটরাপাড়ার বউটি তার পিছনে আসছে। উ হলো পাটরাপাড়ার কার্তিকের বউ। মোতি চেনে, পথে ঘাটে ইদিকে উদিকে দেখা হলে, কথাবার্তাও হয়। কিন্তু এখন মোতি কার্তিকের বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ক্যানে? না, কথায় কথায় মোতিকে সাক্ষী মানবে, আর টুকির কুচ্ছো গাইবে। সময় থাকলে উ সব শোনা যায়। উদিকে দেখ বেলা কেমন চনমনিয়ে বাড়ছে। সে ঘরকে গেলে, সবাই চা মুড়ি পাবেক। তবে হুঁ, কাতিকের বউ মিছা কথা বুলে নাই। যাদের যতো ধন দৌলত, তারাই পরের ভালো দেখতে পারে না। পুনির বাবাও মাঝে মাঝে টুকির সোয়ামির কথা বলে, শালা যোগেনটা চেলা গিলে ওস্তাদের নাম লিয়ে এমন ঠেস মেরে কথা বুলে, উয়াকে একদিন জুতা পিটাই করব।

অই, উয়াতে মোতির বুকে ঢাক পিটাই হয়। কিন্তু সব্বাই বুলা করে যোগেন বাঁট মাগ ভাতারের কথাবার্তা রকমসকম একরকমের। যিয়াকে দেখতে লারে, উয়ার সঙ্গেই উয়াদের ঝগড়া লাগে ক্যানে?

মোতি মাধবগঞ্জের হাটকে ঢুকবার আগে তসর লাড়োর পুঁটলি-সহ হাত তুলে, মাথার ঘোমটাটা বাগিয়ে নিল। হাট আর নেই, রোজকার বোজ বাজার বসে। কোনো এককালে হাট বসতো। বাজারে ঢুকেও, মোতি আগে গেল মদনগোপালেব মন্দিরে। মন্দিরের উচু পিড়ায় কপাল ঠেকিয়ে, মনে মনে বললো, পায়ে রেখ্য গ গোপাল, সুদিন দিয়া কর।

নাটমন্দিরের বাইরের চত্বরে তাশনের কাজ চলছে। মাধবগঞ্জ এলাকার এ পাড়ার তাঁতীরা মদনগোপালের মন্দির চত্বরেই তাশন করে। মোতি এলো বাজারের দিকে। ডান দিকে উচু চালা ঢাকা রথ রাখার ঘর। সামনের ঝাপ খোলা হয়েছে। রথের আর বেশি দিন দেরি নেই। মাজা ঘষা সারানো হবে। বিষ্টুপুরে আর আছে কী? রথ আর দোল। বাকি সব হরিবোল হরিবোল দিয়ে শেষ। মোতি ইদিকে উদিকে তাকালো। তাব লক্ষ এখন বাজারের আনাজপাতি মাছের দিকে না। উত্তর বাগে চালা ঘরের দিকে তার নজর পডলো। কয়েকটি বাউরি হাড়ি বিটি বউ এর মধ্যেই পা ছড়িয়ে বসে গল্পগাছা করছে। উয়াদের মধ্যে একটি বুড়ী, মাটি চৌচির গালের ভাজে হাসছে, আর চুটি টানছে। বুঝ ক্যানে, উয়াদের মালপত্র যা বিকোতে এনেছিল সব বিকিয়ে গিয়েছে। গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাসি গল্প করা দেখলেই বোঝা যায়, বিক্কির বাটা ভালই হয়েছে। মোতি চালা-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

হঁ, উয়াদেরও নজর খাড়া। মোতির ভেজা কাপড়ের পুঁটলির দিকে কেউ তাকিয়ে দেখলো না। তসব লাড়োর পুঁটলির দিকেই সবার নজর। তাঁতী বউ বিটিদের দেখলেই উয়ারা চিনতে পারে। মোতি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো, নজর ইদিক উদিক করে বললো, তসর লাড়ো আছে, লিবে নাকি ?

কালো হিলহিলে, একটি অল্পবয়সী বউ বললো, ক্যানে লিবেক নাই ? কতগুলান আছে ?

পচিশটা। মোতি জবাব দিল।

আর একটি বউয়ের কোলে ছাঁ। জিজ্ঞেস করলো, দর কত লিবে ?

লাড়ো পিছু দশ পয়সা। মোতি জবাব দিল।

মাটি চৌচির-ভাজ-গাল বুড়ী এক মুখ চুটির ধোঁয়া ছেড়ে বললো, অই গ, উ ত তসরের দাম বুলচ গ !

মোতি খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো, হ্যাঁ হাখ গ, তসরের দাম জান নাই কী ?

বাকি কয়েকজন বউবিটিও হেসে উঠল। বুড়ী আবার বললো, আমাদিগের বয়সকালে এক পাইসায় দশটা লাড়ো পাওয়া যাইত।

তোমার বয়সকাল কি আর রঁইচে গ মা ? মোতি টুকুস খোসা-মোদী করে হাসলো, আব ভাব ক্যানে, সে পাইসার দাম কত ছিল ?

হিলহিলে নয়া বউটি বললো, হুঁ, সে ঠিক কথা বটে। কিন্তুক দিদি, দশ পয়সা অনেক বেশি।

কোলে ছেলে বউটি বললো, লাড়ো পিছু পাঁচ দিব।

তালে আর আমার লাড়ো বিচা হল নাই গ বিটি। মোতি মুখের হাসিটি বজায় রেখে বললো, হিসাবের জিনিস। ভাববে, বউ চুরি করেছে।

মোতির কথায় বউ বিটিরা সবাই হেসে উঠলো। এতক্ষণ কথা বলেনি, মাজা মাজা রং, আঁটসাঁট গড়ন বউটি মুখ খুললো, তা মিছা বুলা কর নাই গ তাঁতীদিদি। মরদদের বকম সকম উইরকম বটে। বুলছ যাখন লাড়ো পিছু ছ পাইসা লাও।

মোতি মনে একটু জোর পেলো। হুঁ, নেহাত দর না পেলে, তাকে পাঁচ পয়সাতেই মাল বিকতে হতো। তবু সে সহজে ছাড়বার পাত্রী না। বললো, না গ বিটি পারব নাই। পারলে দিতাম।

কালো হিলহিলে নয়া বউটি বললো, মাল ত আমরাও বিকা করি গ তাঁতীদিদি। লাড়ো পিছু দশ পাইসা কেউ দিবেক নাই। কততে দিবে, ঠিক ঠাক বুলা কর।

আট পাইসা। মোতি হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, তোমরাও জান, লাড়োর বাজার দর কত।

ছাঁ কোলে বউটি বললো, তুমার সঙ্গে আর পারি না গা তাঁতী-দিদি। লাও, সাত পাইসা কর‍্যে দিয়া করবক। লাড়োগুলান বের কর, টিপ্যে টুপ্যে দেখি।

মোতি যেন ঠিক রাজী না, কিন্তু মনে মনে খুশি। উটকো হয়ে বসে, ভেজা জামাকাপড় এক হাঁটুর ওপর রাখলো। তারপরে লাড়োর পুঁটলি খুলতে খুলতে বললো, তা দেখতে চাও, দ্যাখ ক্যানে। একটাও পচা মাল নাই। তবে আমার ঠকা হয়্যা গেল।

বিটি বউরা মোতির কথার কোনো জবাব না দিয়ে, সবাই তার লাড়ো হাতে নিয়ে টিপে দেখলো। অনেক সময় পোকাগুলো পচে যায়। টিপলেই ফেটে যায়, দুর্গন্ধ বেরোয়। সেটা হয়, অনেকদিন রেখে দিলে। মোতির মনে উ নিয়ে কোনো আন ভাবনা নেই। নিজের হাতে সে প্রতিটি লাড়ো দেখে এনেছে। তাঁতীর বিটি, তাঁতীর বউ,

সে কি জানে নাই, বাউরি হাড়িরা প্রতিটি লাড়ো দেখে লিবে? উয়াদের মুখের খাবার, জিভের স্বোয়াদের দ্রব্য। হঁ, মাটি-চৌচির মুখ বুড়ীটা আবার নাকের কাছে ঠেকিয়ে, ল্যাড়ো শুঁকে দেখছে। তা উ দেখুক গা। মোতি এখন লাড়ো পিছু সাত পয়সায় পঁচিশটি লাড়োর দাম হিসাব করছে। কিন্তু উ এক ভজকট ব্যাপার গ! নোটো আঙুলের কড় গুণে ঝপ ঝপ হিসাব করতে পারে। মোতি হিসাবে মোটে সড়গড় না। হিসাবে সে আগে কয়েকবার ঠকেছে, আর ঘরের বিটা বিটিরা শুধু হাসেনি, উয়াদের বাপটিও হেসে মরেছে। মোতির গা জ্বলে যায়। ঠকবার জ্বালা তো উয়ারা বুঝে নাই। হঁ, লাড়ো পিছু যদি সাত পয়সা হয়।

লাড়োগুলান ভাল আনা করচ গ তাঁতী দিদি। ছাঁ কোলে বউটি বললো, মোতির হিসাবের টানায় চৌতারের জট পাকিয়ে দিয়ে।

বুড়ী চুটিতে টান দিয়ে আওয়াজ করলো, হঁ। কালো হিলহিলে নয়া বউটি তার মধ্যেই আঙ্গুলের কড় গোনা শুরু করেছিল, আর মাজা রং বউটি লাড়ো গুনছে। কালো হিলহিলে নয়া বউটি বললো, তা হলে তাঁতীদিদি, লাড়োর দাম হল গা, এক টাকা বার আনা।

মোতির মীনা করা চোখের তারায় ধন্দ। ই বিটিদের কি বিশ্বাস আছে? হঁ, মোতির চোখে কেমন একটু অবিশ্বাস। অই গ, ঝটপট হিসাব না কষতে পারার কী জ্বালা। সে না বলে পারলো না, এত কম হল্য কী করে?

বউবিটিগুলোন হেসে উঠলো। ছাঁ কোলে বউটি লাড়োর ওপর হাত রেখে বললো, কম হবেক ক্যানে গ তাঁতীদিদি, ই ত তুমার সজা হিসাব। বলে, লাড়োগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে আবার

বললো, পঁচিশটা লাড়ো চার পাইসা হিসাবে এক টাকা, হঁ। উয়র উপরে বাড়তি তিন পাইসা হিসাবে বার আনা হবেক। চার পাইসা আর তিন পাইসা সাত পাইসা বুঁইলে ত? ই ও তুমারই দরের হিসাব গ।

হঁ, ত তাঁতীদিদি, তুমার হিসাব মতন এক টাকা বার আনা হইচে, ইবারে আমাদিগের কথা রাখা কর, চার আনা পাইসা কম লাও। মাজা মাজা রং বউটি বললো।

মোতির বুকে যেন পাষাণলড়ির ঝাপ পড়লো, বুকের ঘরে দক্তি টানায় খাপি সুতোয় দম চাপা। বললো, না না, উ আর কম করতে লারব গ বিটিবা। যা হিসাব হঁইচে, উ দাম দিয়া কর।

বউবিটিরা সবাই হেসে উঠলো। নিজেদের শাড়ির আচল খুলে তিন জনেই পয়সা বের করে হিসাব করতে লাগলো। তার মধ্যেই ছাঁ কোলে বউটি বললো, ইবেলায় তাঁতীদিদি একেবারে মহুনি।

হঁ, উ তোরা যা খুশি বুলা কর, মোতির কিছু যায় আসে না। ঘবেব চালকে ধরে রাখে যে-কাঠ, উয়াকে বলে মহুনি। তা বুলতে পার। তাঁতী বউকে শক্ত হতেই হয়। ঘরেব চালা ধরে রাখতে না পারুক পেটার কাজ তো করতে হবেক। বাঁশের ব্যাকারির মোটা অংশের মতো ঘরের বেড়ার কাজেও লাগাতে পারে। বাউরি বউরা আধুলি সিকি দশ পয়সা পাঁচ পয়সা গুনে গুনে, এক টাকা বারো আনা মোতির হাতে তুলে দিল। মোতি হিসাব করে গুনে নিল। উটিতে তার ভুল নাই। হাতের পয়সা হিসাব করতে সময় লাগে না, দাম কষতেই যতো গোলমাল।

কালো হিলহিলে নয়া বউটি একখানি ন্যাকড়ায় লাড়োগুলো তুলে নিল। মোতি নিজের পুঁটলির ন্যাকড়াটি তুলে, হাঁটুতে রাখা

ভেজা জামাকাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি গ বিটিরা। আমার টুকুস কিনাকাটা আছে। তা ইয়া—তুমাদিগের মালপত্তর কিছু নাই?

না, সব বিচা হয়্যা গেঁইচে। ছাঁ কোলে বউটি বললো, দুরকমের ছাতু আনা করচিলম, কুড়কুড়ি আর ফুড়কি। শাগ আনা করচিলম। শেপান্না, পুনকা, আর তিন কেজি খুদ। সকাল থেক্যাই বাজার বেশ টনটনে।

মোতি বললো, কুড়কুড়ি ছাতু পাইলে লিতম।

কালো হিলহিলে বউটি পশ্চিম বাগে হাত তুলে দেখিয়ে বললো, উখানকে ছ্যাখ গা, দু জনা ছাতু লিয়া আইচে। বেলায় আঁইচে, থাকতে পারে।

মোতি পয়সা মুঠো করা হাতের পিঠ দিয়ে ঘোমটাটা বাগিয়ে নিয়ে, পশ্চিম বাগের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। হঁ, ছাতুর নাম শুনলে ঘরের সকলের জিভে জল। যাকে বলে পাতালকোঁড় সেই-রকমের বস্তু। পাতালকোঁড় জাতে বড়, উয়াকে বলে কাড়ান ছাতু। ই সময়টায় কাড়ান ছাতু তেমন মিলে না।

শাঁওনের শেষে, ভাদরে বন জরকালে কাড়ান ছাতু বনে ফোটে। সর্ষে বাটা দিয়ে আলতির সঙ্গে রেঁধে খেলে মুখে ভালো রোচে। যাকে বলে কচু, তারই নাম আলতি। তবে হঁ, কুড়কুড়ি ছাতু যেন একখানি শাদা গুলির মতন। ছালটি ছাড়িয়ে লিয়ে উয়াকেও সর্ষে বাটা দিয়ে রাঁধলে ভারি স্বাদু হয়। গরাসে গরাসে শুকনো ভাতে মাখা উঠে যাবেক গা। ফুড়কি ছাতু ছোট, নাকের নাকচাবির মতো। রান্নার তাগবাগ একই রকমের। ফুড়কি কুড়কুড়ি মোতির শ্বশুর খুব ভালো খায়। দাঁতে চিবোবার বিশেষ দরকার

হয় না, মাড়ির চাপেই বেশ খাওয়া যায়। হঁ, মোতি সুযোগ সুবিধা *পেলেই তার বুড়া বিটাটির জন্য ছাতু কিনে লিয়ে যায়।*

ইদিকটায় ভিড়। মাটিয়ালিরা মাটি নিয়ে, অনেকখানি ছড়িয়ে বসেছে। সেই কোন ভোরকালে জয়পুরের শালবনের থেকে কুড়িয়ে ভেঙে নিয়ে আসা শালের শুকনো ঝাটি কাটি সরু ডালপালা। লম্বা আঁটি করে বাঁধা। গেরস্থদের জ্বালানি। বাউরিপাড়ার দিকে যাবার রাস্তাটা সামনেই। নোটোদের ইস্কুলও কাছেই। মোতি ইদিক উদিক তাকিয়ে দেখতে পেলো, এক মাঝবয়সী বউ আর উয়ার দশ বারো বছরের বিটি হবেক বটে, কিছু কুড়কুড়ি ছাতু নিয়ে বসে আছে। অই গ, ঝাটির আঁটি রাখবার আর জায়গা নাই। আর লোকেরও চলাফেরা দেখ, যেন ঘাড়ে পড়বে।

মোতি ছাতুওয়ালী মা বিটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, মুখখানা টুকুস উদাস করলো, নাক কোঁচকালো, ঠোঁট বাঁকালো, ছাতুগুলান তেমন পুরুষ্টু লয়।

ইয়ার থেক্যা পুরুষ্টু কুড়কুড়ি ই সময়ে আর কুথা পাবেক গ মা। মাঝবয়সী বউটি বললো। মাথার ওপরে রোদ, বউটি ঘামছে। গরমে বুকের কাপড় খোলা। পাশে ছেঁড়া ময়লা, বুক খোলা জামা পরা মেয়েটা অন্যদিকে হা করে তাকিয়ে আছে। বউটি আবার বললো, বিষ্টিবাষ্টা হল্যে টুকুস পুরুষ্ট হতক বটে। কিন্তু ফুট্যে গেইলেই লষ্ট।

হঁ, কুডকুড়ি ফুটে গেলে আর খাওয়া যায় না। ফেটে যায়। সব কিছুরই সময় আছে। সময়ের বস্তু সময়ে কাজে লাগাতে হয়। আসলে মোতি মুখে বললেও ছাতুগুলো তার পছন্দ হয়েছে। নীচু হয়ে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে জিজ্ঞেস করলো, কত দুব?

সবগুলান লিবে?

উয়ার আর সবগুলান কী গ বিটি। মোতি বললো, ই কটা ত ছাতু।

মাঝবয়সী বউটি হাসলো, দাঁতে এখনো তামুকের দাগ, ধোয়া হয়নি। বললো, ছাতু কি আর সেব মাপা হয়? সব গুলান লাও ত আট আনা দিয়া কর।

অই গ। মোতিব চোখ কপালে উঠলো, আট আ-না। ই কি কুড়কুড়ি না সনা গ বিটি, অ?

মাঝবয়সী বউটিব ঘামে ভেজা মুখ গম্ভীব হলো, বললো, সনা রোপাব কথা কি আমবা জানি গ মা? ছাতু বিচা করতে আইচি, আট আনাতে আধ কেজি চালও মিলবেক নাই।

মোতি কি তা আব জানে না? উসব হল দরদাম করার দস্তুব। ছাতুগুলান পছন্দ বটে, কিন্তু তুমি তো আর চাষ আবাদ করে নিয়ে আসো নি! মা বিটিতে বনে বাঁদাড়ে ঘুরে নিয়ে এসেছো, যা তুচার পয়সা পাওয়া যায়। এই কটা ছাতু বিক্রি কবে কেউ চাল কেনার কথা ভাবে না। বললো, চার আনা তুব!

না মা, পাববক নাই। মাঝবয়সী বউটি নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল, ফিবে তাকালো অন্য দিকে।

লাও, আর পাঁচ পাইসা তুব।

না মা, হবেক নাই। সাতগণ্ডা পাইসার এক পাইসা কম হবেক নাই।

সাতগণ্ডা হলো সাত আনা। মোতি জানে, ছাতুব বাজার খাবাপ না, পড়ে থাকবে না। কিন্তু তাঁতী ঘরের বউকে হিসাব করে চলতে হয়। বললো, লাও লাও হঁইচে গ বিটি, ছ গণ্ডা পাইসা তুব, তুলা কর। লাড়োর পুঁটলির ন্যাকড়াটা পেতে দিল।

মাঝবয়সী বউটি মাথা নাড়লো, মিছে ক্যানে বুলবক মা, সাত গণ্ডার কমে হবেক নাই।

তাঁতী বউ কি কেবল হিসাব করে? রান্নার তাগবাগ, সবাইকে বেড়ে খেতে দেবার কথাও কি ভাবে না? সে পয়সা গুনতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত আধুলিটি দিয়ে বললো, বাজারে আর আইতে ইচ্ছা করে নাই, সব জিনিসের আগুন দর।

মাঝবয়সী বউটি তামুক মাখা দাঁত দেখিয়ে হাসলো। আধুলিটি নেবার আগে মোতির ন্যাকড়ায় ছাতুগুলো তুলে দিল। আধুলি নিয়ে, ময়লা খাটো নীল পাড় শাড়ির আঁচলের গিট খুলে, একটি পাঁচ পয়সা বাড়িয়ে দিল। মোতি বললো, আর এক পাইসা?

নাই গ মা, ই ছ্যাখ ক্যানে। গিট খোলা আঁচলের আরও কিছু পয়সা দেখিয়ে দিল।

মোতির মুখখানি ভারি হলো, এক পাইসা কম দিলো। ছাতুর পুঁটলিটি সাব্যস্ত করে নিয়ে উঠলো সে। দক্ষিণ বাগে, মাছের দিকে গেল। বউ বিটিই বেশি, দু-একজন বুড়া মরদ। বড় মাছের দিকে মোতি তাকিয়ে দেখলো না। যাতে পোষাবে না, সেদিকে দেখেও লাভ নেই। দু জায়গায় ছোট ছোট পুঁটি আর ময়া মাছ রয়েছে। মোরলারই নাম ময়া। দু-একজনের কাছে শামুক গুগলি আছে। উসব তাড়াতাড়ির সময় ভেঙে ছাড়ানো, তৈরি করা চলে না। পুঁটি ময়ারও দাম কম না। আট, লয় ত সাত টাকার কমে কথা নাই। ইদিক উদিক দেখতে দেখতেই, এক বুড়ীর কাছে কিছু ইজলি চোখে পড়লো। কুঁচো চিংড়ির স্বাদ আছে। তবে ইজলিগুলান বড় ছোট, তার মধ্যে বুড়ী আবার গুচ্ছের শ্যাওলা জড়িয়ে রেখেছে। চার টাকা কেজি-র ইজলি দরাদরি করে তিন টাকায় নামিয়ে, বারো আনা দিয়ে

আড়াইশো কিনলো। ইদিকে ভিতরে বড় তাড়। আর দেরি করা যায় না। মোতি আলু পটল ঝিঙে, রাম ঝিঙে—যাকে বলে ঢেঁড়স, কোনো দিকে না তাকিয়ে ফিরে যাবার মুখে, দু আঁটি খেটা শাক কিনে নিয়ে, বাড়ির দিকে পা চালালো। ঘর তো ঠায়ে লয়। কুলি কুলি দিয়ে যেতে হবে। তার আগে একবার অন্নপূর্ণার মন্দিরে মাথা ঠেকাইতে হবেক।

অজা ঢুকলো তাঁত ঘরে। নামেব ফের বটে। অজিত নাম মুখে মুখে অজা। বছর বিশ বয়স। রোগা লম্বা, গায়ের রঙ কড়াই কালো না, টুকুস মাজা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল—আজকাল সব জোয়ান বিটা-দেরই যেমন থাকে, গালপাট্টা জুলপি, গোঁফের বহর তেমনি। যেন ন্যাজমোলার উড়ন্ত পাখা। ভুরু মোটা, ছোট ঝকঝকে চোখ। কিন্তু নাকটি খাঁদা। তবে মুখে একটা চকচকে ভাব, যেন খোলস ছাড়ানো খরিশ। মাথার চুলে ঢেউ, কপালের কাছে একটা গোছা এলানো। ই সময়ে অজা লুঙ্গি আর জামা গায়ে আসে। অন্য সময়, যখন বন্ধু-দিগের সঙ্গে ইদিক উদিক যায়, সিনিমা টিনিমা দেখতে যায়, তখন প্যাণ্টলুন পরে। এই হলো পাঁচুর তাঁত মাদ্দার। বা বলো মজুরি খাটা বানিদার।

অজা ঘরে ঢুকলো, পায়ের রবারের স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে রাখলো দরজার কাছে। কিন্তু অই গ, পুনির লাটাই ফাঁদালি চালানো হাত জোড়া আনখা এলোমেলো হয়ে যাঁইচে, ক্যানে? হঁ, অজা ঘরে ঢুকেই একবার চারদিকে চোখের তারা ঘুরিয়ে পুনিকে দেখে নিল। সোনার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সোনাও তাঁতে বসে চোখ তুলেছিল। হেসে বললো, আঁইচেন আজ্ঞা?

বাপের সামনে সোনা, আর এ সোনা আলাদা। এখন উয়ার চোখে মুখে হাসি, কচি মুখে কেমন পাকা পাকা ভাব। বারো বছরের সঙ্গে কুড়ির যেন তফাত নেই, দুটিতে যেন ইয়ার বকসি। অজা বললো, হুঁ, আইলাম আঁজ্ঞা। পাঁচুকাকা ঘরকে নাই, নাই কী? বলে চোখের তারা আর একবার পুনির দিকে ঘুরে গেল।

হুঁ, অজাকে লতুন দেখচে কি পুনি? লাটাইফাঁদালি এমন বেসামাল হয়ে যাইচিল ক্যানে? পুনি একবারও চোখ তুলে দেখছে নাই ক্যানে? পুনি বুলতে লারে। ক্যানে? না, অজা যেন এদানি কেমন কেমন হাসে, তাকায়, গলানির কাজ করতে ডাকে, আর উ কী কথা বটে, পুনির দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে। ঘুগি না অঁড়কঁক, বুঝা দায়। আনতাবাড়ি গাওনা ধরে দেয় গুনগুনিয়ে, আর কী সব বুল্যা কওয়া করে, মন ভাল নাই।...ধূস শালা, কাজে মন লাগে নাই। ইদেশ ছেড়্যে চল্যে যাবক গা।...পুনি জবাব দিবে কি, উয়ার হাসি পায়, লজ্জা করে। আবার উই কী বুলে, ভালোও লাগে। অজা না আসাতক, দরজার বাইরে কান পড়ে থাকে। ক্যানে? না, পুনি কিছু বুঝে নাই। অথচ বুক কাঁপে। বাপ মা যদি কোনোদিন মনের কথা জানতে পারে, রক্ষা থাকবেক নাই।

নোটো বললো, বাপ ওস্তাদের ঘরকে গেঁইচে।

লতুন লসকাটা লিয়ে? অজা নিজেই বললো, বুঁইতে পারচি। কাকী কি নাইতে গেঁইচে।

নোটো বললো, হুঁ।

পুনি চোখ তুলছে না। কিন্তু অজার চোখ বারে বারে পুনির দিকে ঘুরে যাচ্ছে। হুঁ, সে কথা কি পুনি জানে না? ও বিটিছেল্যা বটে। ওর চতুর্দশী মন, না দেখেও অনেক কিছু টের পায়। টের

পেলেও, তা জানতে দেওয়া যায় না। এখন নেহাত ঘরে সোনা নোটো রয়েছে। নইলে, কতো কথাই বুলা কওয়া হয়্যা যাঁইত। এই সিদিনেই যেমন আনতাবাড়ি বলে উঠেছিল, আজ সাঁজবেলাতে লালবাঁধেব উদিকে বুলতে যাবেক কি?

অই গ, মাথা খাবাপ না হলে, পুনিকে উ কথা কেউ বলতে পাবে? পাড়ার আশেপাশে, কখনো সখনো বোলতলার দোকানে যাতায়াত আছে বটে। তাও ঘবেব দবকাবে, বাপ মায়েব কথায়, দিনে দুপুবে। নেহাত যখন সোনা নোটোকে পাওয়া যায় না। বাপেব কাজ থাকলে, মায়ের শবীব খাবাপ হলে সোনা নোটো না গেলে, মাঝে মধ্যে সকাল বাগে মাধবগঞ্জের বাজারেও পুনি যায়। এই যেমন মা ঘবকে এলে পুনি চা মুড়ি খেয়ে যমুনায় নাইতে যাবে। তাও একলা না। হরিকাকা, নিতাই জ্যাঠাব বিটিবা যাবে, পুনি উয়াদের সঙ্গে যাবে। নিজেব জ্যাঠার বিটিরা কথা বুলে না। বরাবব এমনটি ছিল না। নিতাই জ্যাঠার এই ঘরখানি যখন ভাড়া নেওয়া হলো, তখন থেকে আপন জ্যাঠার কী যে হলো, পুনিদেব সঙ্গে একদম মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ঝগড়াঝাঁটি আগেও ছিল, কিন্তু আবাব মিটমাট ভাবসাবও হতো। পুনি তো আগে ফুড়কির সঙ্গে দোকানে বাজারে যমুনায় নাইতে যেতো। এখন উসব বন্ধ। এখন হরিকাকার বিটি মালতী আব নিতাই জ্যাঠার বিটি বুদার সঙ্গে যায়। কিন্তু একলা যমুনায় যাওয়া বাবণ। আর তাকেই কি না বলে সাঁজবেলাতে বুলতে যেতে? বুলতে চলো, ফাঁকবাগে যাওয়া বলো আর বেড়াতে যাওয়া বলো, কথা একই। তাও আবার লালবাঁধের উদিকে? কোনো বাঁধের ধারেই সাঁজবেলাতে যাওয়া যায় না, একমাত্র পোকা বাঁধ ছাড়া। ক্যানে? না, পোকা, বাঁধ চকের

কাছকে, শহরের মধ্যিখানে। চারদিকে গাড়ি লরি মোটর বাস রিকশা, জমজমাট দোকানপাট। তাও সাঁজবেলায় ঘরে বাত্তি জ্বললে, চকের দিকেও যাওয়া বারণ। আর লালবাঁধ? অই গ, উয়ার ধারে কাছে এখন দু চারখানি বাড়ি হয়েছে বটে। কিন্তু আশেপাশে জঙ্গল, ওপারে শালবন আকাশের গায়ে লেপটে থাকে। আশেপাশে জঙ্গল, ঢিবি, পুরনো মন্দির, ভাঙা রাজবাড়ি, পাথরের দরজা, গড়খাইয়ের ঝুপসি বন। কদিন আগেও সাঁঝের পরে পুনি, সোনা আর মায়ের সঙ্গে মনসাতলায় গিয়েছিল, পঞ্চমীতে পঞ্চমের পূজা দেখতে। ফিরতি পথে রাসমঞ্চের পাশ দিয়ে নিরালা রাস্তায় চলতে চলতে লালবাঁধের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, উদিকে ঝিঁঝি ডাকার আঁধারে সাপখোপ বাঘ ভাল্লুক না থেকে যায় না। বেহ্মদত্যিও থাকতে পারে। বড় ইস্কুলটার পাশ দিয়ে আসতে আসতে, পুনির গা ছমছম করছিল। মায়ের গা ঘেঁষে চলছিল। উখানকে কি মরতে যাবেক? ও অজাকে বলেছিল, তুমার মাথায় কি লাথা ভরা?

হঁ, ওসবের ঝুট যাকে বলে। অজা, ঝকঝকে চোখে যেন নোটোর মতো তাকিয়ে বলেছিল, ক্যানে?

সাঁজবেলায় কেউ লালবাঁধে যায়? পুনির চোখের রেশমি বুটি তারায় অবাক ঝিলিক ছিল, ডর লাগে নাই?

অজা—হঁ, পুনি অজাদা বলে ডাকে। অজাদা বলেছিল, ক্যানে, আমি ত রইচি, ডর কিসে?

পুনি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠেছিল, জানি নাই, যাও।

তবে কুথা যাবেক? অজা যেন হুতোশে ডাক ছেড়েছিল।

অই গ, কী জবাব দিয়া করবেক পুনি? মনে হইচিল কি, অজাদা নোটোর থেক্যা ছাঁ-বাচ্চা। হঁ, এদানি অজাদা পুনিকে তুমি বলে

ডাকে। ক মাস আগেও তু তুকারি করতো। পুনির মনেও কোনো ইয়া উয়া ছিল না। সকলের সামনে সহজভাবে কথা বলতো। ক মাস আগে, পুনির প্রথম নজরে পড়েছিল, অজাদা যেন কেমন কেমন চোখে তাকায়। ক্যানে? মনে হতো, উ যেন পুনিকে নতুন দেখছে। হাতেব কাজ থেমে যেতো বানিদারের, চোখের পলক পড়তো না। ক্যানে? উয়ার চোখের নজরে এক নতুন ঝলক, কী যেন বুলা করতে চায়। কী? পুনি যেন থল পেত না, কিন্তু ওব চতুর্দশী শরীর যেন ঝটকা বাতাসে জলের মতো শিউড়ে উঠতো। মনেব ভিতরটা লাজ লাজানো খুশিতে রাঙা হয়ে উঠতো। উ আবার কী? পুনি বুলতে পারে না। হঁ, মনে হতো, গায়েব জামাটা বড় ছোট হয়্যা গেঁইচে, হাঁটুর বড় বেশি উপর বাগে উঠে গেঁইচে। উয়াকে টেনে টেনে লম্বা করবার লেগে, টানাটানি করতো, অথচ ঠোঁটের কোণে কোন নকশাদার হাসির নকশা ফুটিয়ে তুলতো। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতো, ভাবতো আর তাকাবে না। কিন্তু অই গ, ই কি চোখখাগী চতুর্দশী মনেব টানা, পাষাণলড়িতে চাপ পড়ে যেন আপনা থেকেই টানা সুতোর খাড়ি উঠে যেতো। চোখ না তুলে উপায় থাকতো না। অজাদা তখন হাসতো। উয়াকে কী হাসি বলে?

হঁ, প্রথম প্রথম সেই এক খেলা। খেলা একটা শুরু হলে, আর একরকম থাকে না। নকশা একটা শুরু হলে, উয়ার রকম সকম বদলায়। বালুচরের রহস্য পুনি কী জানবে? জলের ঢেউ, আকাশের রঙ, পাখীর ঝাঁক, শ্যাওলার চিত্রবিচিত্র আঁকিবুঁকি। বালুচরের অনেক খেলা। তাবপরেই দেখ, পুনিকে গলানির কাজে না পেলে, অজাদার বানির কাজ যেন চলে না। হঁ, গলানি কাজের সময়, বানিদারের কি ভব হয়? ভর হলে যেন কথার থই থল মেলে না, অজাদা সেইরকম

আনতাবাড়ি কথাবার্তা শুরু করেছিল। আর উয়ার গায়ের কি তাপ গ। নকশার মীনা মাকু গলাতে পাশে বসে, উয়ার গায়েব তাপ যেন পুনির গায়ে লাগে। সেই তাপ, মনে ল্যায় কি, যেন পুনির গায়ে অইচে। ধমনীর রক্তে ঢাকের দগর বাজে। হঁ, উয়াতে জ্বালা দরদ নাই, ঝিমঝিমানি নাই। কিসের একটা মাতামাতিতে বুকেব জামা ভিজে যায়। অথচ একটা ভয় ধুকধুক করে বাজতে থাকে। পাঁচু কাঁতের বিটি পুনি, ঘবের ক'ড়ে বউয়ের বিটি। বিটির মনের বৃত্তান্ত জানতে পারলে, লরাজেব ডলায় পিষে মারবে।

না, লালবাঁধকে ক্যানে, পুনি কোথাও যাবেক নাই। সাঁজ-বেলায় ক্যানে? দিনেমানেও কোথা যাবেক নাই। হঁ, অজাদার পায়ের শব্দের লেগে পুনিব কান খাড়া হয়ে থাকে। হঁ, উয়ার চোখের দিকে তাকালে, বুকে মীনার নকশা ফোটে। হঁ, গলানির কাজে উয়ার পাশে বসলে, পচি ঝড়ের মাতন লাগে, বুক ভিজে যায়। কিন্তু, পুনির পায়ে তার নিজের মনেব বেড়ি। উ বেড়ি ও ভাঙতে লারবে, কাটতে লারবে, ই কথাটা বুঝ হে জোয়ান বানিদাব। অজাদার হা হুতোশি জিজ্ঞাসা শুনে, পুনি হেসে বলেছিল, আমি কুথাও যাব নাই।

ক্যানে? অজাদা যেন তরাসে জিজ্ঞেস করেছিল।

পুনিব মনে হয়েছিল, অজাদাব প্রাণখানি যেন গলাব টাগরায় এসে ঠেকেছে। তবু পুনির হাসি পেযেছিল। বিশ বছ্বের একটা জোয়ান মরদ বটে তুমি, বুঝ নাই ক্যানে। ও বলেছিল, 'ক্যানে, কী? আমি ঘরের বাইরে যাব নাই।'

'ক্যানে, তুমি আমাকে আঁতে বাস নাই?' জোয়ান বানিদার যেন মগুরের ঘা খেযা বুলা করছিল।

অই, কী জবাব দিবে গ পুনি? পুনি যে সত্যি জানে না,

অজাদাকে ভালবাসে কী না। ও মাথা ঝাকিয়ে হেসে বলেছিল, জানি নাই!

হঁ, অজাদা আর কিছু বলেনি। ছুদিন ব্যাঁতে কুলুপ আঁটা ছিল। পুনিকে গলানির কাজে ডাকে নাই। অবিশ্যি মজুরি দেওয়া গলানি একজন আছে। হবি কাকার সাত বছরের বিটি মিনি—মিনতি যাব নাম, গলানির কাজে উয়াকে রাখা হঁইচে। মিনি আসতে দেরি করলে, অজাদা পুনিকে ডাকা করবেক। অই, ঘরকে য্যাখন কেউ থাকে না, পুনি ছাড়া, অজাদা ত্যাখন মিনিকে ছুটি করে দেয়, যা মিনি, অনেক গলাইচু, টুকুস খেলা করগা যা। মিনি তো এক পায়ে খাড়া। উয়ার মনটা এখনও পাকে নাই। অজাদার কথা শুনে চোখে মুখে হাসি ধরে না, যেন অজাদার মতো বানিদার হয় না। এক কথাতেই তাঁত ঘর ছেড়ে ছুট। হঁ, তাঁতী ঘরের কোন বিটা বিটি খেলতে পায়! তাও যদি আবাব খটখটি তাঁতের তাঁতী হয়! থান গামছা বুনা করে।··· তারপরেই পুনির ডাক। হঁ, বানিদারের বড় দয়ার প্রাণ গ। ছাঁ-বিটি মিনির জন্য বড় দরদ। হঁ, ছেল্যামানুষ, টুকুস খেলতে পায় না বটে। অজাদা বুলা কবে। অবিশ্যি এমন সুযোগ সন্ধান কম মিলে। বাপ যদি বা ঘবের বাইরে অন্য কাজে থাকে, ভাইয়েরা খেলায় যায়, মা ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে তাঁত ঘরে আসা যাওয়া কবে। ঘরকন্নার কাজ না থাকলে, লাটাই ফাঁদালি চরকা, যা হোক কিছু নিয়ে বসে যায়। কাজের তো শেষ নেই।

হঁ, সিদিনের সেই কথার পরে অজাদা ছু দিন কথা বুলে নাই। পারডোবে ছু পা ডুবিয়ে, বানিদারটি যেন বকের মতো নিবিষ্ট হয়ে, জলের দিকে তাকিয়েছিল। তাঁত থেকে মুখ তুলা করে নাই। পুনির মনটা যে আতুর পাতুর হয় নাই, উটি বুলা যাবেক নাই। কিন্তু মনটার

মধ্যে গোঁসাও হইচিল। ক্যানে, পুনি মন্দ কিছু বুলা করেছিল? কার ঘরকে বানিদারের মজুরি খাটো তুমি, জান নাই? পাড়ায় শহরে লোকজন কি সব কানা হয়ে গেঁইচে? পুনি তোমার সঙ্গে ঘরের বাইরে যাবে, কেউ দেখতে পাবে না, আর আঁতেবাসা? উ একটা কী বৃত্তান্ত, পুনি বুঁইতে লাবে। তা আঁতে বাসলে কি, ঘরের বাইরে যেতে লাগে? ক্যানে? পাড়া ঘরে বিটি মেয়্যাদের লিয়ে কী সব কীর্তি-কেলেংকারি ঘটছে, তুমি জান নাই? পাড়া পঞ্চায়েতের বাখান শুনা করচে, আর শুতা চোখের মতো নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে? আর উয়ারা জিগিব দিবে, আমার বাপকে বুলবে হাজার টাকা দিয়া কব, আর তোমার মাথা কামায়ে ঘুরা করাবেক। সেরকম ঘটাতে চাও তুমি? পুনি পারবে নাই। বেশ, হঁ, ইয়া, পুনির সঙ্গে কথা বুল নাই, উয়ার দিকে চোখ তুল নাই, তোমাকে কেউ মা মনসার দিব্যি দিবেক নাই। হঁ, ইয়া, মনে মনে কথাগুলান বলতে বলতে, পুনির বুক টাঁটাইচিল, লসকা বুটি চোখের তারা ঝাপসা হয়ে গেঁইচিল। না, আঁতেবাসা পুনি বুঝে নাই। কিন্তু কে তোমাকে পুনির মন কাড়া করতে বলেছিল? তুমি চখ তুলা করবেক নাই, পুনিও করবে নাই।

অই, আঁতেবাসা বুঝে নাই পুনি, কিন্তু ই কি চৌদ্দ বছরের দোষ? উ ক্যানে চোখখাগী হয়েছিল। বানিদারটা ঘরকে এলেই ক্যানে উয়ার দিকে চোখ পড়তো? হঁ, কথা অবিশ্যি বুলে নাই। বুলা করছিল অজাদাই। দিন বুঝে ক্ষ্যাণ যে। মিনির পেট চিনচিন করচিল। আসলে পেট নামাইচিল। ত্যাখন অজা বানিদারকে আর পায় কে? নিজে থেকেই সকলের সামনে ডেকেছিল, পুনি তালে গলানির কাজটা কর। ক্যানে, লোটোকে ডাকা কর নাই ক্যানে? মাও তো কত

সময় গলানির কাজে হাত লাগায়। কাকীকে ডাকা কর নাই ক্যানে? পরে অবিশ্যি পুনিকে একা পেয়ে বলেছিল, 'তোমার মন না চাইলে, আর ঘরের বাইবে যেত্যে বুলব নাই।'

পুনি জবাব দেয়নি। অজা বলেছিল, 'গোঁসা কর নাই অই। আমার মন ডুখাইচে।'

রাগ করেছিল পুনি? তবে অজাদা বারে বারে ডাকা করতে, ক্যানে হেসে ফেলেছিল? তা কে বলতে পারে? উয়ার ঠায় বসে বারে বারে 'পুনি অই পুনি' শুনে হাসি পেয়েছিল। লসকাবুটি চোখের তারায় ঝিলিক হেনে বানিদারের মুখেব দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে আরও জোরে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিয়েছিল। আর বানিদারটি ঝুঁকে পড়ে কাঁধটা ঠেকিয়েছিল পুনির মাথায়। পুনির বুক তখন ভিজে গেঁইচিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে। উয়ার ঠায়ে বসলেই, পুনির গা ঘেমে যায়। বড় যে তাপ লাগে!

এখন অজা পুনিকেই ঘুরে ফিরে দেখছে, পুনি তা জানে। পটিটা আবার ঘাড়ের ওপর পড়ে ঝাপাঝাঁপি করছে। পুনি মুখ ফিরিয়ে ধমক দিল, অই পিটাই ডুব, দেখবি? বলেই একবার অজাদার দিকে তাকালো। অই, চোখ ফিরাইতে জান নাই কি? অঁড়কঁকের মতন লাগে, হাসি পায়। মাথায় একগাদা কপালে থোকা চুল আর ও রকম গোঁফ লিয়ে কেউ বোকা বোকা চোখে তাকায়?

'হুঁ, ইয়া মিনিটা আসে নাই?' অজা বললো, পুনির দিকে তাকিয়ে।

পুনি তখন চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নোটো জবাব দিল, মিনি এখন আসবেক নাই, চা মুড়ি খাবার টাইমে আসবেক।

অজা তাঁতের দিকে তাকালো। খাচান দড়ির দিকে একবার

চোখ তুলে দেখলো। কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে টানা সুদ্ধ পেট লরাজের ওপর ঢাকা দেওয়া কাপড়খানি তুললো। আঁজলার কাজ শেষ—এক শাড়ির। এখন পাড় আর বুটির কাজ চলছে। অজা আটাঙিটায় একবার হাত বুলিয়ে দেখলো। কাপড় যাতে গুটিয়ে না যায়, তার জন্য আটাঙি দিয়ে দুদিকের পাড় সহ কাপড়ের জমি আজলা টান টান করে টেনে রাখা হয়। দুটো শক্ত বাখারির ডগায় আকড়ি দিয়ে টান করা থাকে। হঁ, অজা দেখে নিচ্ছে, আটাঙিটা নড়াচড়া হয়েছে কী না। হয়নি। নজর খাড়া করে, পুরো ঢাললরাজ পর্যন্ত টানার ঘর দেখে নিল। চোখ তুলে দেখলো পাড়ের ডাং। জালি পাটা আর খাচান দড়ির ছুঁচ মৌরি ঠিকই আছে। তা নইলে একবার মেসিন দেখবার জন্য মাচার ওপরে উঠতে হতো। ঘরের ডান দিকের কোণেই রয়েছে, মাচায় ওঠার মই।

পুনি কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে একবার তাঁতের দিকে তাকালো। যেমনি তাকানো, অজারও যেন পাষাণলড়িতে ঝাঁপ পড়লো। পুনির দিকে চোখ ফেরালো। পুনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে একবার সোনার দিকে দেখে নিল। অবিশ্যি আওয়াজেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, সোনা নিজের কাজ করছে, ইদিকে উয়ার নজর নাই। নোটোটাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। কিন্তু সোনাটা এদানি টুকুস সেয়ানা হঁইচে বটে। তবু অজার দিক থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। ই কী বিপদ। উয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ঠোঁটের কোণ মচকে যায়। বাপ মা ঘরে থাকলে, পুনি অজার দিকে তাকায় না। কিন্তু নাকচাবিটা যে ঝিলিক হানতে থাকে ও জানতে পারে না। হাসি চাপলেও নাকের পাটা কাঁপুনি থামাবে কেমন করে?

অজা পাবডোবে পা ডুবিযে বসলো। পাষাণলডিতে আলতো কবে পা রাখলো। মেসিনেব তুই ঢেঁকিতে একবাব পা ঠেকিয়ে দেখে নিল। তাবপবে দেখলো বুটি নকশাব মাকুগুলোব দিকে। পাড়ের ধাবে টানাব ওপব মীনাব নলি পরানো ছোট ছোট ইস্পাতেব মাকু-গুলো সাজানো থাকে। চোখ তুলে তাকালো পুনিব দিকে, আর একবাব সোনাব দিকে, তাবপবে আবাব পুনিব দিকে তাকিয়ে বললো, 'গলানি আসবেক নাই, নাহঁ কি ?'

পুনি লাটাই ফাঁদালি থামিয়ে মুখ ফিবিয়ে তাকালো, কিন্তু কিছু বললো না। নোটো বলে উঠলো, 'অই অজাদা, আমি মাকু গলানি করবক কি ?'

'আঁজ্ঞা না দাদা।' অজা এক গাল হেসে নোটোব দিকে ফিবলো। হাসলে উয়াব চোখ তুটো নকন চেবা দেখায়, গালে ভাঁজ পড়ে যায়। বললো, 'আমনি আজ্ঞা আমনাব পড়া করে ল্যান, লইলে মাস্টেরেব পিটানি খাইতে হবেক।' বলে চোখ ফিবিয়ে পুনিব দিকে তাকালো, 'মিনির লেগ্যে বস্যা থাকা লাগবেক কি ?'

হুঁ, উ পুনি জানে। লাটাই ফাদালি কি আব এমনি থামিযেছে ? তবু একটুও না হেসে বললো, 'টুকুন ছাখ ক্যানে, মিনি এস্যে পড়বেক।'

'উ য্যাখন আসবেক, ত্যাখন আসবেক, কাজটা ত শুরু করা যাক।' অজা বললো।

পুনির নাকের নাকচাবির কাঁচে ঝিলিক লাগছে। লাটাই ফাঁদালি তালাইয়ের ওপর বেখে, উঠে তাঁতের সামনে এগিয়ে গেল। পায়ে পায়ে গেল পটি। অই, উয়াকে কী বুলে ? চোখ সরাতে লারছ যে ? পুনি কোমরের কাছে লালফুল ছিটেব জামা টেনে দিল। গলার

কাছে টুকুস টেনে বুনে কী যে ঠিক করতে চায়, নিজেও জানে না। বুঝ ক্যানে, উয়ার গায়ে এখন শাড়ি থাকলে আঁচল টানা করতে পারতো। রূপোর চুড়ি হাতের ওপর বাগে টেনে আঁট করলো। বানিদারেব বাঁ দিকে হাঁটু মুড়ে বসলো। পটিও দিদির পাশে, দিদির মতো কবে বসেই, হাত বাড়ালো মীনানলির ছোট মাকুগুলোর দিকে। পুনি উয়ার হাত চেপে ধরবার আগেই, অজা হৈ হৈ করে উঠলো, 'অই র‍্যা পটি, তুই আমাব সব্বনাশ করবি। কাপড়ে টুকুস দাগ লাগলে, পাঁচুকাকা আমাকে কেট্যে ত্বখান করবেক।'

হঁ, কাপড়ে দাগ লাগবার লেগে কেটে দুখান হবার ডব, আর সেই পাঁচুকাকার বিটিকে ডাকা কর, লালবাঁধকে যেত্যে। মবদ হে। পুনি পটিকে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'যা, উধারকে যা, মুড়ি খা গা। মা আইলে পিটাই দিবেক।'

পটিও তাঁতীর বিটি বটে। উয়ার রক্তেও তাঁত বুনা করার ডাক লাগে। ইদিকে কাজ শুরু হয়ে যায়। বাঁয়ের মাকুগুলান পুনি গলায়, ডাইনের মাকুগুলান বানিদার গলায়। উটাই নিয়ম। বানিদার পাষাণ-লড়িতে চাপ দিল, ডান দিক থেকে ভরনার মাকু দিল ফাবড়িয়ে। পাষাণলড়ি ছাড়া করালো, ঝাপ পড়লো। মেসিনের ঢেঁকিতে চাপ দিতেই আওয়াজ উঠলো, ক্যারেং···ঝট। বানিদার দক্তি টেনে জমিন খাপি করলো। পাড় আর নকশা বুটির এক সুতো বুনা হলো।

চলো এইভাবে। হঁ, ই ত আর আঁজলার কাজ না, বাঁ দিকে চোখ ফিরাবার সময় মিলে বানিদারের। আর পুনির গায়ে জ্বরের তাত ফুটতে থাকে, বুক ভিজে যায়। হঁ, ইয়া, তাঁতের কাছকে এসে বসবার জন্যে মনটা কি আতুর পাতুর হইচিল? পুনি বুঁইতে লারে।

অই গ পুনি, আমি বাজার লিয়া আঁইচি। দরজার কাছে মোতি

মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে, ভিতরে ঢোকেনি। বললো, 'একবারটি আয় মা, আমাকে টুকুস হাতে হাতে যোগান দিয়া করাবি। ঝটস্তে কাঠের উনানটা ধরা করায়ে আমি চায়েব জল বসাইগা, তু সব্বাইকে হাতে হাতে মুড়ি দিয়া দিবি।' বলে আর একটু ঝুঁকে ভিতর ভাগে দেখে বললো, 'তোর বাপ বের হয়্যা গেঁইচে?'

নোটো সে সব কথা কানেই নিল না। বই খাতা রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে তিড়িংবিড়িং নেচে উঠলো, মা আঁইচে, মা আঁইচে।

'হুই শালা, চুপ করবি কি?' সোনা খেচামেচা করে উঠলো।

হঁ, উইটি তাঁতী ঘরের ব্যাতের দোষ বটে। শালা বলার কোনো মানামানি নাই। দ্যাখগা ক্যানে, জোয়ান বাপ-বিটা ই উয়াকে শালা শালা করছে। নোটো লাফ দিয়ে ঘরেব বাইরে গেল। আর ইদিকে দেখ বানিদাবেব বোদ মুখে মেঘেব ছায়া। পুনি উঠে দবজার দিকে যেতে যেতে বললো 'হঁ, বাপ লসকা লিয়ে ওস্তাদের ঘরকে গেঁইচে। বুলেছে, দেরি হল্যে সগলকে চা মুড়ি খেয়্যা লিতে।'

'হুঁ, বুঁইচি, লসকাদারের এখন মাথার ঠিক নাই, নাই।' মোতি বললো, 'লসকাখানি ওস্তাদের লজ্জর ধবা হবেক কি না হবেক, এখন উইটি উয়াব দশবা একাদশী শাঁওনের সপ্তমী। অই অজা, তু টুকুস বস ক্যানে বাবা, মিনি বিটি ঘাটকে গেঁইচে, আমার সঙ্গে দেখা হঁইচে, এখন এখনই এস্তে পড়বেক।'

ইতিমধ্যে পটি দরজার কাছে গিয়ে ঝুঁকে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরেছে, নোটোর মতোই খুশিতে কলকল করছে, মা আঁইচে, মা আঁইচে।

'পটিটাকে ধর গ পুনি, আমার দু হাত কাড়া।' মোতি সরে যেতে

যেতে বললো।

পুনি পটির একটা হাত টেনে ধরলো, 'মাকে ছেড়্যা দে পটি, আমার সঙ্গে চল।'

পটি কান্নার থেকেও রাগে আর জেদে চিৎকার করে উঠলো। মোতি পিছন ফিরে বাড়ির ভিতর বাগে পা বাড়াতেই জগত বুড়া ডেকে উঠলো, 'ক'ড়ে বউমা এল্যে কি গ?'

'হঁ। বাবা। টুকুস বস, তোমার চা মুড়ি দিয়া করচি।' মোতি চলে যেতে যেতে বললো।

জগত যেন তার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া মোতির ছায়াখানি ধরে রাখতে চাইলো। হঁ, উ আমার আগের জন্মের মা ছিল বটে। জগত আতুর শিশুব মতো মোতির চলে যাওয়া আবছা মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার হা মুখের ভিতর এলানো জিভটা কাঁপছে। না, চা মুড়ির কথা তার কানে বাজছে না। কানে বাজছে উ কথাগুলান, 'লসকাখানি ওস্তাদের লজর ধরা হবেক কি না হবেক এখন উটি উয়ার দশরা একাদশী শাঁওনের সপ্তমী।' হঁ, উটি বানিদার লসকাদারের বউয়ের মতো কথা বটে। বছরের যে-ক'দিন তাঁত চালায় না, পূজা পাট করে, দশহরা একাদশী শ্রাবণের সপ্তমীর দিনগুলান উয়ার মধ্যে পড়ে। একাদশীগুলান হলো ভীষ্ম, উত্থান, শয়ান, ভীম। হঁ, এখন তা হলে পাঁচুর পূজাপাট চলছে? ছোট বিটাটা লতুন লসকা করেছে? জয় বাবা বিশ্বকর্মা, লসকাদারের লসকাখানি ধরা করাও হে, ধরা করাও।...

ইদিকে ঘরের মধ্যে, সোনার কাণ্ডখানি দেখ। পারডোব থেকে পা তুলে লরাজের কাছ থেকে সরে অজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওস্তাদ, ঝট করে একটা মাল ছাড় ত টেন্যে লিই।'

অজার মেজাজ খারাপ। তবু হাসলো, বললো, 'বুঁইচি র‍্যা ওস্তাদ, তু ফাঁক খুঁজচিলি বটে।' বলে জামার পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করলো, 'উঠি আঁজ্ঞা লইলে বিড়ির ছাই আমার তাঁতে পড়বেক।' সেও পারডোব থেকে পা তুলে, ঘরের মাঝখানে সরে এলো।

সোনা যেন ছিটকে এলো ঘরের মাঝখানে। অজার হাত থেকে বিড়ি আর দেশলাই থাবা দিয়ে নিয়ে বেশ বাগিয়ে দাঁত দিয়ে বিড়ি কামড়ে ধরে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালো। চলে গেল রাস্তার ধারের জানলার দিকে, বললো, 'অজাদা, তুমি দরজার বাগে লক্ষ রাখা কর, কেউ এলে আওয়াজ দিবে।'

কথা শেষ করবার আগেই, খকর খকর কাসি, আর মুখ থেকে ভলকে ভলকে ধোয়া বেরতে লাগলো। হুঁ, এখন বুঝ ক্যানে, বারো বছরের সঙ্গে কুড়ির এত পীরিত জিগির কিসের।...

পাঁচু এলো অভয় খান ওস্তাদের ঘরকে। ডাইনে সাবেকি ঘরে সীমানার পাচিল, বাঁয়ে ওস্তাদের নিজের খরচে তোলা পাকা কোঠা ঘর। দুইয়ের মাঝে কুলি দিয়ে ভিতর বাগে গেলে, কাঁচা উঠোন। সামনা-সামনি আর একখানি পাকা কোঠা বাড়ি। বিশ্বকর্মা আর মা লক্ষ্মী ওস্তাদকে চার হাতে দিয়া করেচে। বাঁয়ে আর সামনে ছখানা কোঠা বাড়িই ওস্তাদ নিজের টাকায় তুলা করেছে। কিন্তু নিজে থাকে বাপের আমলের দোতলা মাটির ঘরের একতলায়। মাটির ঘর বটে, মেঝে পাকা। দোতলা ঘরের মেঝে অবিশ্যি মাটির মাথায় লাড়ার চাল। যাকে বলে খড়। নিচে, ঘরের দরজার কোলে পাকা পিড়া, সামনের নতুন কোঠা ঘরের পিড়ার সঙ্গে জোড়া। হুঁ, মাটির ঘরের সঙ্গে পাকা দাওয়াটিও ওস্তাদ নিজে করেছে।

ওস্তাদ ক্যানে নিজের টাকায় তোলা পাকা ঘরে থাকে না?
্যানে মাটির ঘরের দালানের এক কোণে নিজের জায়গা লিয়ে
রখেচে? না্হ্, ভাল লাগে নাই। কোঠা ঘর তুলা করেচি, উয়াতে
বটারা, বিটার বউরা লাতী লাতীনরা থাকুকগা। আমি আমনার
াপের ভিটায় থাকব। এই হলো ওস্তাদের কথা। যেমন কথা,
তমনি কাজ। বিটার বউরা ভাত জল দিয়া করে। ওস্তাদ দালানের
এক পাশে নিজের বিছানা আর তালাইয়ে শোয়া বসা করে দিন
কাটায়। খেজুর পাতায় বোনা চাটাইয়ের নাম তালাই। হঁ,
ওস্তাদ-মা মাবা গেইচে দশ সালের উপর হবেক। তিন সাল আগে,
ওস্তাদ উয়ার শেষ লসকাখানি আকা করেছিল। অবিশ্যি ঘর টানা
কাগজে, লসকাটি পাঁচু নিজেই তুলেছিল। জালিপাটা থেকে, ছুঁচ
মোরির হিসাব, খাচান দড়ি আর মেসিনের যাবতীয় কাজ সে
করেছিল। অবিশ্যি এখন যে লসকাটির ওপর পাঁচুর তাঁতে কাজ
হচ্ছে, ইটি সেইটি লয়। তিন সাল আগের শেষ লসকায় বারোখানি
শাড় বুনা হঁইচিল, আর হয়নি। ঈশ্বরদাসের বাখান হলো, উ লসকার
শাড়িটি বাজার ল্যায় নাই। পাচুর তাঁতে এখন যে শাড়ি বোনা
হচ্ছে, এ নকশা আরও আগের করা।

পাচুও মোতির মতো একেবারে ঘাট যাওয়া সেরে এসেছে।
ঘর থেকে বেরবার আগে শুকনো জামা কাপড় গামছা নিয়েই
বেরিয়েছিল। রাস্তায় বেরিয়ে, চায়ের দোকান থেকে দু গেলাস চা
টেনে নিয়েছিল। তারপরে যমুনায়। ভেবেছিল, মোতির সঙ্গে দেখা
হয়েও যেতে পারে। হয়নি। কিন্তু মেয়াবিটিদের ঘাটের বাখানি
শুনেছে। যোগেনের রূপসী বউটি তখন ঘাটে ছিল না। ঘটনা নিয়ে
তখনো জিগির জাঁক চলছিল। পাঁচুকে সব বৃত্তান্ত বুলা করেছিল ছোট

বাউনঠান। উয়ার সোয়ামী নিকুঞ্জ চকরোত্তিকে পাঁচু ছোটঠাউরদ
বলে ডাকে। পাঁচু ছোটঠাউরদার ভিক্ষাভাই। নিকুঞ্জ চকরোত্তি না
সকলের মুখে সে কুঞ্জা ঠাউর। ছোট বাউনঠান পাঁচুর সঙ্গে সবখানে
কথা বলে। বাউন বউ তো আর তাঁতীর মিতেনি হতে পারে না
কিন্তু ছোট বাউনঠান পাঁচুর সঙ্গে হেসে জিগিব দিয়ে বুলা কওয়া করে
আবার চোখ পাকিয়ে ধমক ধামকও করে। চেলা-মুলার নেশাটি বেশি
হয়ে গেলে মোতির মুখে খবর পায়। আর ছোটঠাউরদার তো কথাই
নেই। যিদিনে উয়ার লিশাটি বেশি হয়্যা যাবেক, তা হলেই বউয়ের
কাছে গিয়ে হাত জোড়, উ শালা পাঁচুটা জোর কর‍্যে গিলা করালেক।

হুঁ, যতো দোষ পাঁচু কীতের। বরং পাঁচু বারণ করলে, সে হবে
শালা অদধপুতা, চুপ কর।···অবিশ্যি ছোট বাউনঠান উয়ার কত্তাটিকে
ভালোই জানে। তবু পাঁচুকে চোখ পাকাতে ছাড়ে না, হুঁ, উসব
ছাইপাঁশ গিলা ছাড়া কিছু শিখ নাই, নাই? আমি উসব বাউন
তাঁতী ভিক্ষাভাই, কিছু মানি নাই। দুজনাকেই হাবরা থেক্যা গরুর
জাব গিলা করাব।···

পাঁচুর উত্তর বাগে, ঘাট সেরে ফেরার পথেই বাঁধের ওপরে
ছোটবাউনঠানের মুখে যোগেনের বউয়ের মহিষমর্দিনী মূর্তির কথা
শুনেছে। হুঁ, পাঁচুব হাতে তখন নকশা, নেয়ে ধুয়ে তাড়াতাড়ি
ওস্তাদের কাছে যাবার জন্য মন আনচান, তবু টুকির চেহারাখানি
চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অই গ, গরীব লসকাদার অদধপুতা
পাঁচু কীত টুকির কথা ভাবতে চায় না। বৈদ্যপাড়ায় পথে যেতে
পাঁচুর বুকে মাকু খটখট করে। যোগেনের ঘরের বর্না আর আঁকড়
গাছের আড়াল আবডাল থেকে কার মূর্তি উঁকিঝুঁকি মারে? কাঁচের
চুড়ির ঝনাৎকারের মতো কার হাসি বেজে ওঠে। ঝোপঝাড়ের মাঝে

তার সোনার পিতিমে মুখ মেঘের ফাঁকে চাঁদের মতো ভেসে ভেসে ওঠে? ঝিলিক হানে কার কালো চোখের তারায়? এলানো চুল কার লাল নীল শাড়ির আঁচলে ঝাপটা খায়? অই কি বুকের পাটা হে, কে হাসির বাজনায় সঙ্গত করে, লসকাদারের কী অংখার গ, চখ তুল্যে দেখতে লারছে। অই ছোট বউ, আমি শুনি নাই রে, কিন্তু আমার বুকে ঢাকের দগর বাজে। অই ছোট বউ, আমি চখ তুলা করতে চাই না, কিন্তু মনে ল্যায় কি আমার পেট লরাজে বালুচরী। লজর কাড়া হয়ে থাকে।

হঁ, উ যোগেন বীটের বউ বটে, মোতিকে চোখের কেঁচায় মারে। আর যোগেন যেন পাঁচুকে দেখে কেঁতরের মতো। গরুর গায়ের ডেঙরটাকে খুঁটে তুলে টিপে মারতে চায়। যোগেনের বউ তুমি, তোমার রোপের কথা মাধবগঞ্জের বাউন কায়েত তাঁতী লোয়ারের মুখে মুখে। বড় মানষের ঘরনী তুমি, পাঁচুর বুক-তাঁতের পাষাণ-লড়িতে ঝাঁপ টিপা কর ক্যানে? অই, সোনার অঙ্গ টুকি, তুমি পাঁচুর বুকে কী বুনা করতে চাও? কী লসকা ফুটাতে চাও ই গরীব প্রাণের জমিনে? অংখার লয় গ বীটের ঘরনী। ভাদরের উথালপাথাল জগত ভাসানো বিঁড়াই তুমি, আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপে।

হঁ, যমুনার বাঁধের ওপর নতুন নকশা হাতে নিয়ে ছোটবাউনঠানের কথা শুনতে শুনতে বুঝা গৈইচিল, টুকির আসল গোঁসা মোতির ওপর। মোতিকে দেখলেই উয়ার বদংবদ মূর্তি। উয়াকে বলে আমি বধ করছি তোমাকে, তুমিও আমাকে বধ কর। ছোট বাউনঠানের মুখে বৃত্তান্ত আর জিগির হাসি শুনে পাঁচুও হেসেছিল। কিন্তু প্রাণে লাগেনি জিগিরের মজা। ক্যানে? না, মোতি যদি পেটলরাজে, টুকি মাকু ফাবড়ায়। ··

পাঁচুর ডান হাতে কাগজ পাকানো নকশা। ডান হাতে ভেজা জামা কাপড়। ওস্তাদের ঘরে পাকা পিড়ায় উঠে, এক পাশে নিংড়ানো ভেজা জামা কাপড় রাখলো। কয়েক পা এগিয়ে, ডান দিকে ওস্তাদেব ঘবে ঢোকবাব দরজা।

'নেয়ে ধুয়ে এলো মনে ল্যায়।' সামনের কোঠা ঘবেব পিড়া থেকে স্ত্রীলোকের স্বব ভেসে এল।

পাঁচু তাকিয়ে দেখলো, বড ব উদিদি। ওস্তাদের বড় বিটার বউ, বয়সে পাঁচুব সমান সমান হবেক। পাঁচু বললো, 'হঁ, ঘাট নাওয়া সেবে এল্যেম।'

'চা খাবেক কি?' বড়বউদি জিজ্ঞেস কবলো।

পাঁচু হেসে বললো, 'উয়ার সঙ্গে চাডটি মুড়িও দিয়া করবেন গ বড়বউদি।'

বড়বউদি কোনো জবাব না দিয়ে, টুকুস হেসে, কোঠা ঘরে ঢুকে যায়। পাঁচুব বুক ধড়াস ধড়াস কবে। হাতেব পাকানো লসকাটি পিছন বাগে রেখে, ওস্তাদের ঘবে ঢোকে। হঁ, নিজের বিছানা ছেড়ে তালাইয়ের ওপব বসে আছে। দৃষ্টি দরজার দিকে, তবু নির্বিকার। পাঁচুর বাপেব বয়সী হবে। নতুন তামার পয়সা এখন আর কেউ দেখতে পায় না। পাঁচু দেখেছে। ওস্তাদের গায়ের রঙটি সেইরকম। খালি গা, পরনেব ধুতি হাঁটুর কাছে তোলা। ভুরুতে বিশেষ চুল নেই, মাথার সাদা চুলও পাতলা। মুখে দিন দুয়েকের আকাটা গোঁফদাড়ি। সামনে খোলা পড়ে রয়েছে একখানি মোটা খাতা। খাতা না, উয়ার নাম আলাবাম। উয়ার পাতায় পাতায় সাঁটা আছে ওস্তাদের সব লসকার ফটো। একখান দুইখান না, আজ তক আটাশখানি লসকা কিনেছে ঈশ্বরদাস, ওস্তাদের কাছ থেকে। এদানি এক-একখানি

লসকার দাম ছ হাজার টাকা। আগে ছিল হাজার চারেক। তবেই বুঝ ক্যানে, পাকা কোঠার সোপকুডা খোঁড়া হঁইচে কেমন করে। ভিতের মাটি খোঁড়া যাকে বলে। হঁ, ই মানুষটি এই বয়সে আটাশ-খানি লসকা করেছে। আর লসকাদারের য্যাত কাজ। জালিপাটা খাচনদড়ি ছুঁচ মৌরি আড়িখাড়ির হিসাব আর মেসিনের সঙ্গে লাগা করা। অবিশ্যি গত দশ বছর প্রত্যেকটা কাজেই পাঁচু চেলা ছিল।

পাঁচু দেখলো, অভয় খান ওস্তাদ, তালাই-এর উপর বসে আছে। চোখ চেয়ে আছে, তবু যেন জেগে ঘুম যাঁইচে। হঁ, এদানি এ রকমটি হয়েছে। পাঁচুর বাপ জগতের মতো, ওস্তাদের নজর খারাপ হয়নি। এখনো সব দেখতে পায়, তবে চোখে চশমা আঁটতে লাগে। এখন দেখ, আলারামের উপরেই চশমা পড়ে রয়েছে। আর ওস্তাদকে দেখাইচে যেন, হঁ, সেই ছবির গান্ধী বাবার মতো। গালে ঠেকান দেওয়া রয়েছে হাতের কবজির উলটো পিঠ। একখানি পাতলা তোষক বিছানো বিছানার এক পাশে বিস্তর কাগজপত্র, ছোটখাটো গাঁটরি বোঁচকা। উসব কাগজপত্রগুলান সবই ঈশ্বরদাসের গদীর চুক্তিপত্রের কাগজ। আরও নানা জায়গা থেকে ওস্তাদকে লেখা বিস্তর চিঠিপত্র আর ইংরিজি বাঙলায় লেখা অনেক ছাপা বয়ান। হঁ, উয়ার নাম অভয় খান। বেনারসে যাও, ব্যাঙালোর যাও, বমবাই যাও, কলকাতা আর দিল্লিতেই যাও, অভয় খানের নাম কারো অজানা নাই। আর গাঁটরি বোঁচকাগুলানের মধ্যে আছে, আটাশখানি আঁজলার টুকরো।

পাঁচু কাছে গিয়ে, বিছানার পাশে কাগজপত্রের মাঝখানে, আগে নিজের নকশাখানি রেখে দিল। অভয় খান মুখ ফিরিয়ে দেখলো। না, আনখা অবাক চমক নাই, ভাঙা ভাঙা সরু গলায় জিজ্ঞেস

করলো, 'পাঁচু এঁয়েচু ?'

'হুঁ, আঁজ্ঞা শরীলটা কেমন আচে আঁজ্ঞা ?' পাঁচু সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো।

অভয় খান ফোগলা মুখে হাসলো, চোখ তুলে তাকালো পাঁচুর মুখের দিকে, 'অই কালিন্দী বাঁধের ধারকে যাই যাই করচে।'

পাঁচু হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারে না। কালিন্দী বাঁধের ধারেই শহরের নিকটতম শ্মশান। তুমি যেমন রোজ রোজ এক কথা জিগেঁসা কব, উয়ার জবাবও সেইরকম। আবার বললো, 'তু এঁয়েচু, আমার শান্তি। চা খাইচি, জামগোড়ায় ঘাট সারা করো্যে আইচি।'

হুঁ, পাঁচুকে আর কিছু বলার দরকার নেই। সে তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে রাখা মলমের কৌটা আর তুলা নিল হাত বাড়িয়ে। ওস্তাদের সামনে তালাইয়ের ওপর রেখে, ঘরের এক পাশে মাটির দেওয়ালের দড়িতে ঝোলানো একখানি তাঁতে বোনা মোটা আট হাত ধুতি পেড়ে নিয়ে এলো। সেটাও তালাইয়ের ওপর রেখে, কাগজ-পত্রের কাছে রাখা একটা কলাইয়ের মগ নিয়ে ঘরের বাইরে গেল। এ ঘরের পাকা পিড়ার সঙ্গে, লাগোয়া পিড়া, কোঠা ঘরের রান্না ঘরটা সামনেই। পাঁচু রান্না ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বড়বউদি কুথাক গেলেন গ ?'

ভিতর থেকে বড়বউদির স্বর ভেসে এলো, 'গরম জল চাই ত ! ই লাও।' বলতে বলতে বড়বউদি হাতে ন্যাকড়া দিয়ে ধরা গরম জলের বাটি নিয়ে এলো। ঢেলে দিল পাঁচুর হাতের কলাইয়ের মগে। তার মধ্যেই পাঁচু জিজ্ঞেস করলো, 'বিটি বিটারা কুথা ? অবিদাদা কুথা ?'

'বিটিবিটারা উপর ঘরকে পড়ছে, মাস্টের আইচে যে।' বড়বউদি বললো, 'তোমার দাদা বাজারকে গেঁইচে।'

অবি হলো অবিনাশ, অভয় খানের বড় বিটা। তাঁতীর বিটা এখন
ার তাঁতী নেই, অবি খান ঘড়ি সারাইয়ের ডুকান দিয়েচে। কারবার
ালো। শহরে হাটে বাজারে দ্যাখগা, সগলার হাতে হাতে ঘড়ি।
কের বাজারে যে মাছ বিচা করে, আর শহরে রিকশা চালায়,
য়াদের হাতেও ঘড়ি দেখতে পাবে। বড় বড় গদীর মালিক, বাবু-
দগের তো কথাই নেই। হঁ, অনেক তাঁতীও হাতে ঘড়ি বাঁধে।
যাগেন বাঁট, নিতাই দাসদের মতো তাঁতীরা তো বাঁধেই। যেমন কি
া বাঁধে ওস্তাদের তিন বিটা আর বড় বড় লাতীরা। এদানি তাঁতী
ারের অনেক জোয়ান বিটাদিগের হাতেও ঘড়ি দেখা যায়। কোথা
থেকে টাকা পায়, ঘড়ি কিনা করে, পাঁচু বুঁইতে লারে। অজাটাও
কোনদিন হাতে একখান ঘড়ি বেঁধে আসবেক, কিছু বলা যায় না।
পাঁচুর নিজের বিটা সোনাটা তো এখন থেকেই ঘড়ির আবদার করে।
ক্যানে? ই একটা যুগের হাওয়া। প্যান্টালুন পরতে লাগবে, হাতে
ঘড়ি বাঁধতে হবে। ইস্তক বিটি মেয়্যাদিগেরও উদিকে ঝোঁক। উয়াতে
বাউন কায়েত বদ্যি, তাঁতী শাঁখারি লোয়ার কারো মধ্যে ফারাক নাই।

তবে হঁ, আজকাল অনেক বাউন কায়েতদের বিটিরা প্যান্টালুনও
পরে। দেশটা কুথাক যাঁইচে গ মা। ইয়া, পাঁচুরও কি মনে ল্যায় না,
কবজ্জিতে একখান ঘড়ি বেঁধে ঘুরাফিরা করে? কিন্তু ডুই ডুইখানি
লসকার লসকাদার জোটাতে পারেনি।

হাতে হাতে এত ঘড়ি, ঘরের দেয়ালে টেবুলে এত ঘড়ি, উ কার-
বারটি লেবেক নাই ক্যানে? ওস্তাদের আর এক বিটার মনোহারির
দোকান আছে। যা, পাঁচুর জামাইদাদার মতো মনিহারি দোকান
না, বেশ জমজমাট। সেই যিয়াকে বুলে, যদি চলে মনেহারি কী
করবেক জমিদারি, উই রকম। আর এক বিটা ঈশ্বরদাসের সঙ্গে

কারবার করে কলকাতায় মাল চালাচালি করে। ওস্তাদের ঘরে তাঁত
নেই। ওস্তাদ নিজেও কোনোকালে বানিদার ছিল না। পারডোবে
পা ডুবিয়ে বসেনি। উয়াকে অর্ধপুতা বলা যাবেক নাই। দুই পুরুষে
ওস্তাদের ঘর জাত পালটে লিয়েছে। কিন্তু ছ্যাখ গা, উয়াদের জ্ঞাতি-
গোষ্ঠীরা এখনো যে-অর্ধপুতা, সেই অর্ধপুতাই আছে।

পাঁচু ঘরে ঢুকে ওস্তাদের তালাইয়ের সামনে গরম জলের
কলাইয়ের মগ রাখলো। বিছানার তলায় রাখা ধোয়া ন্যাকড়ার
ফালিগুলো বের করলো। তারপরে মলমের কৌটা আর ওষুধ
লাগানো লাল তুলো নিয়ে ওস্তাদের পাশে বসল। ই কাজটি পাঁচুর
রোজকার। কোনোদিন ঘাট যাওয়া নাওয়ার আগে, কোনোদিন
পরে। ওস্তাদের দুই উরুতে, পাছায় ঘা আছে। শুয়ে বস্যে শোষ ঘা
হয়ে গেঁইচে। কেউ বলে অন্যরকম। উ যাই হোকগা, পাঁচু উয়ার
কাজ করে। বাসি ন্যাকড়াগুলো খুলে, ওষুধের তুলো গরম জলে
ডুবিয়ে নিংড়ে নিংড়ে, ঘা চেপে চেপে ধুয়ে দিল। ঘা থেকে পুঁজ রক্ত
বেরোয়। গরম জলের ছোঁয়া লাগলে, ওস্তাদের মুখখানি কুঁকড়ে
ওঠে, গোঙায়। হঁ, গরম জলের ছ্যাঁকটা সহ্য হয় না। ধোয়া মোছার
পরে পাঁচু ঘাগুলোতে চেপে চেপে মলম লাগালো। ধোয়া ন্যাকড়া
জড়িয়ে বেঁধে দিল।

না, পাঁচুর কাছে ওস্তাদের লজ্জা ঘেন্না নাই। ই এক জেবন বটে।
ওস্তাদের কোঠা ঘরে বিটারা ঘর সংসার করে, উয়ার টাকায় আপন
আপন ব্যবসা ফেঁদেছে। কিন্তু ঘায়ের সেবা কেউ করে না। হঁ,
ওস্তাদের তিন বিটাই বুলা করে, 'পাঁচু তু আমাদিগের ভাইয়ের থেক্যা
বেশি।' পাঁচু ওস্তাদের দু হাত ধরে বললো, 'উঠেন আজ্ঞা।'

স্থবির অভয় খান পাঁচুর হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কোঁথ

াড়া করে গোঙায়। পাঁচু ধোয়া ধুতিটা ওস্তাদের কোমরে জড়িয়ে দিয়ে বাসি ধুতিখানি খুলে দেয়। ধোয়া ধুতি কোমরে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে, কাছা পাকিয়ে, বাকিটা কোঁচায় গুঁজে দিল। ওস্তাদ পাঁচুর কাঁধে হাত রেখে সরু গোঙানো গলায় বললো, 'অই র‍্যাঁ পাঁচু, তু আমার কে বটে, জানি নাই র‍্যা। তু ক্যানে উয়ার পেটে জন্মালি নাই।'

হঁ, উয়ার পেটে মানে, ওস্তাদের বউয়ের পেটে। পেটে জন্মালেই কি সব হয়? তা হলে উয়ার পেটের ছেলেরা ফারাক থাকে ক্যানে? ওস্তাদের আপন বিটা হলেও পাঁচুও কি বাপের ঘা ধোয়া করতো? ই কথা বলা যায় না। সে ওস্তাদকে ধরে বসিয়ে দিল। ই সব বাজকার কথা, জবাব দিবার কিছু নাই। বললো, 'বসেন আঁজ্ঞা, আমি ইসব ধোয়া করে রোদে রেখ্যা আসি।'

পাঁচু বাসি কাপড় ঘায়েব ন্যাকড়া নিয়ে উঠোনের এক ধারে ইদাবার ধারে গেল। বালতিতে বাঁধা দড়ি ইদারায় ডুবিয়ে জল তুলে আছড়ে-পাছড়ে ধোয়া করলো। উত্তর বাগে কিছু পুরনো ইটের পাঁজায় সব টান টান মেলে দিল। দিয়ে ইটের ভাঙা টুকরো কাপড়ে ন্যাকড়ায় চাপালো। হাতমাটি কববার মতো, মাটিতে দু হাত ঘষে ঘষে ধুয়ে নিল।

'অই গ ঠারপো, চা মুড়ি খেয়্যা লাও।' বড বউদি রান্না ঘরের পিড়ায় দাঁড়িয়ে বললো।

পাঁচুর মাথায় এখন নতুন লসকা। ওস্তাদকে লসকা দেখানো নয়, বাঘের খাঁচায় ঢোকা। উয়ার নাম অভয় খান ওস্তাদ। রেশম খাদি ভাণ্ডারের গদীতে উয়ার ফটো ঝোলে। মেলা সার্টিপিকেট বাঁধাই করে ঝোলানো আছে। এখন দেখতে এমন অশক্ত, কালিন্দী বাঁধের ধারে যাবার জন্য গোঙায়। কিন্তু পাঁচুর অনেক লসকা দেখে

উয়ার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়্যা গেঁইচে, চোখে যেন আংরা ধঃ ধকানি, 'শালা, ইকে কি লসকা বুলে? চখের সামনে এত লস দেখচু, আর ইটি কুন লোমের কাজ লিয়া আইচু তু অঁ?' ফঁ্যাস ফঁ্যা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, 'যা, অদধপুতার বিট সুতির কাপড় গামছা বুনা কর গা, আলপাকায় হাত পাকাগা।...'

বড়বউদি রান্না ঘরের পিড়ায় মুড়ির থালা বসিয়ে দিয়ে বললে 'ঠারপো, আমি বাবাকে মুড়ি মেখ্যা দিয়া করচি, তুমি এখানে বসে খেয়্যা লাও।' বলে একখানি পিড়ি পেতে দিল।

হঁ, ঘা ঘোয়া মোছা করে কাপড় বদলে ওস্তাদ সকালের জলখাবা খায়। পাঁচু পিড়িতে বসলো। মুড়ির ওপরে ছুটো আলুর চপ। পা রাখা জলের ঘটি। পাঁচু মুড়িতে অল্প জল ঢাললো, আলুর চপ সুদ্ধ মওলিয়ে মুখে পুরলো। কিন্তু গলা দিয়ে যেন যেতে চায় না। উখানে আইটকে রঁইচে লসকাখানি।

অই, ওস্তাদ তোমার যে সে মানুষ তো না। তাঁতীর ঘরের বিটা জোয়ানকালে ভেবেছিল রঙের কারবার করবেক। বাপ-ঠাকুর্দা তাঁতী হলেও, তখন রেশমকে পাকা রঙ করার মালমশলা বিষ্টুপুরের তাঁতীদে জানা ছিল না। উটি বরাবর বাইরে থেকে আনা করা হতো। কিন্তু তুমি ভাবো এক, হয় আর এক। ইসব কথা ওস্তাদের নিজের মুখে শোনা। শুন তবে বুলা করি, আঁকুড়্যা বংশীলাল বীট ত্যাখন বালুচরী বুনা করার তালে ছিল। ক্যানে? না, ঈশ্বরদাস মাড়োয়ারির ঠাকুর্দ চন্দরবাবু ত্যাখন দিল্লি বোমবাই কলকাতা ঘুরা কর‍্যা এস্যে তাঁতীদিগে ডেকে বুলা করলেক, বালুচরী বুনা কর।

হঁ, বালুচরী চোখে দেখেছে কে? চন্দরবাবুর গদীতে একখানি

াড়ি আনা করা হঁইছিল। উটি বাদশাই আমলের শাড়ি। চন্দর-
াবুব কথা শুনা করেই, আঁকুড়্যা বংশীলাল সেই শাড়িটি লিয়ে
ডলো। বংশীলাল বীট হলো যোগেন বীটের কত্তাদাদা। যাকে
লে ঠাকুর্দা। আঁ্যাকুড়্যা ক্যানে? হঁ, বৈত্তপাড়ার আঁকুড় ঝোপে
য়ার ঘর ছিল। সেইজন্য উয়াকে আকুড়্যা বংশীলাল বলতো।
খনো দেখবে যোগেন বীটের বাড়িখানি আঁকুড় ঝোপে ঢাকা।

অই, উটি আর পাঁচুকে বুলতে হবেক নাই। যোগেনের বাড়ির
াকুড় আর বর্ণা গাছের ঝোপঝাড় তাকে চিনাতে হবেক নাই।
াই আকুড় আর বর্ণার ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে এক সোনার অঙ্গ
ায়বর্টাদা সাপিনী সড়সড়িয়ে চলে। ঠিনঠিনিয়ে হাসে। রোদে
ায়ায় বিজলায়, চোখের কালো তারায় হানে আর কালীতলার
সকাদারকে ডাকা করে, 'এত অংখার ক্যানে গ লসকাদারের,
কবারটি ভিতর বাগে আসতে পারে না?'···অই অই গ, মা মনসা,
কিকে বারণ কর গ। পাঁচু কীত, উয়ার যুগ্যি চন্দ্রবোড়া হতে
ারবেক। অই রোপসী ক্যানে পাঁচুর টানায় মাকু ফাবড়ায় গ।···

হঁ, তা ইদিকে হঁইচে কি শুন র‍্যা পাঁচু, আমার বন্নুই মাধবদাসও
খন বালুচরীর লসকা তুলবার লেগে মন করেচে। উয়ার সঙ্গে ত্যাখন
ামগোড়া হিঞ্চেগোড়ায় ঘাট যাই, এক সঙ্গে হুঁকা টানা করি।
য়াদের ঘরের পাট তসরের কাজের ত্যাখন নামডাক ছিল। মাধব-
াস এস্থে আমাকে ধরলেক। ক্যানে না, উ জানত আমার টুকুস
াকাজোকার হাত আছে। আমারও মনটা নেচ্যে উঠল।

কিন্তু সেই বালুচরী শাড়ি কুথাকে মিলবেক? উতো আছে
টিদের ঘরকে। হঁ, তখন একটা মতলব করতে হলো। শালা বুন্নুই,
মি আমনার আমি আমনার। তোমার সঙ্গে আমার মুখ

দেখাদেখি নাই, কথাবার্তা নাই। একটা কাজ বাগাতে হলে টুক্
ঘুগি চাল চালতে হয়। ওস্তাদ বংশীলালের ঘরকে গেল। হুঁ, ই
বুলতে হবেক, বংশীলাল কাজের মানুষ। যদি বিষ্টুপুরে কারো না
করতে হয়, উয়ার নাম সব্বার আগে করতে হবেক। ওস্তাদ নিজে
চোখে দেখেছে বংশীলাল বালুচরীর লসকাখানি নিখুঁত তুলা করেচে
ওস্তাদের কথায় বীটদের বিশ্বাস হলো। বালুচরীখানি দেখবার জ
বাড়ি লিয়ে আসতে দিল। আর ওস্তাদেরও নাওয়া খাওয়া ঘুম ঘু
গেল।

উদিকে মাধবদাসের সবুর সয় না। সে যখন তখন ওস্তাদের ঘরে
আসা যাওয়া করতে লাগলো। ব্যাপার দেখে বীটদের মনে সন্দে
হলো। অভয় খানের মতলব কী? বংশীলাল এসে বালুচরীখা
ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তখন ওস্তাদের নকশা তোলা শেষ। উদি
বংশীলালের তখন রুলকাটি দিয়ে কাগজে ঘর কেটে আসল নকশ
কাজও শেষ। একজন এক কদম আগে, আর একজন এক কা
পিছে। ওস্তাদও রুলকাটি দিয়ে কাগজে ঘর কেটে, চৌকো ঘরে নক
আঁকলো। চন্দরবাবু ত্যাখন বরানগর থেক্যা জেকার্ড মেসিন আ
করালেক। সেই শুরু।

ইদিকে ওস্তাদের বনুইয়ের মন খারাপ। কাজটা ধরতে পা
নাই। রেশম কাবাই করে সিজিয়ে, মীনা করে, তাশন করা শে
এমন কি ঢাললরাজেও সুতা গোটানো শেষ, যিটি কোলেরও ল
কোলেরও লয়, দোটানার ভিতর দিয়া পেটলরাজের সঙ্গে টানা ব
হয়। ওস্তাদ নিজে গেল চন্দরবাবুর কাছকে। '...ই গ্যাখেন আ
আমার লসকাখান। ইয়াকে খি-য়ের মাপে, জালি পাটা ক
আমি। আমাকে আপনি আঁজ্ঞা জেকার্ড মেসিন আনা করাই দেন

খি হলো সুতো। সুতো বুনোটের চৌকা মাপে জালিপাটায় কশা তোলা তখন সহজ কাজ না। বংশীলাল উয়ার কাজ দেখতে দিবেক নাই। ওস্তাদ আঁকুড়ার ঝোপের কাছে আনাগোনা করলে বংশীলালের বিটারা কুকুর তাড়া করে আসত। কিন্তু ওস্তাদের মাথা ত্যাখন খারাপ। চন্দরদাস দেওড়া মাড়ারি কথা রাখলেন নাই। আ-ধূস ত্যাখন মাধবদাস বনুই। উ ত মুখখানি হাঁড়ি করে তাঁত ঢাকা দিয়ে বসে আছে আর হুঁকা ফাটাচ্ছে। ওস্তাদ টাকা যোগাড় যন্তর করে নিজে চলে গেল বরানগর। হুঁ, ত্যাখন বরানগরের এক কোম্পানি জেকার্ড মেসিনের মালিক। উয়ারাই বিচা করে। ওস্তাদ উখানেই জেকার্ড মেসিনের নাড়িনক্ষত্র বুঝে সুঝে, মেসিন লিয়ে বিষ্টুপুরে ফিরে এলো।

উদিকে আঁকুড়্যা ঝোপে ত্যাখন তাঁতীদের ভিড। লতুন তাঁতের কাজ দেখছে সবাই। আর মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে, ই হিসাব মাথায় রাখা যায় কেমন করে? তবে হুঁ, ওস্তাদ আর একটা কথাও বুলেছিল, হুঁ, ওস্তাদি যদি বুলতে হয় ত বংশীলাল বীট। ক্যানে? না, জেকার্ড মেসিনের সংবাদটা উয়ার কাছে পরে আইচিল। তার আগেই সে তাঁতের সঙ্গে জাঁক পাখী বসিয়ে খাচান দড়ি আর শিকলান খাটিয়েছিল। লরাজের টানা সুতোয় ছুঁচ পরিয়ে তারের কাটি দিয়ে মৌরি বানিয়েছিল। ছুঁচের ছিদ্রের নাম মৌরি। ত্যাখন শিকলানে লসকার হিসাব ফুটে উঠতো। উটি হলো বাদশাহী আমলের কারিগরি। চন্দরবাবু তখন জেকার্ড মেসিন এনেছিলেন।

মাধবগঞ্জ আর কিষ্টগঞ্জে রটে গেল, অভয় খানও জেকার্ড মেসিন এনে, বালুচরী বুনা করতে লেগেছে। কিন্তু ওস্তাদ মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সব নিয়ে বসে, হিসাব মিলাতে পারে না। কতো ঘরে কতো

কূণিক হবেক, কতো খাড়িতে কতো সুতো ঢুকবে, হিসাবে আসে না
···হঁ, ত্যাখন কি ভাবলাম র‍্যা পাঁচু 'হুজুগে পাল লিলে / বিয়াতে প
ফাটে। হুজুগে গাই গরুতে পাল লিলে, তখন বাচ্চা বিয়াতে গিয়
মবে।' আমার সেই অবস্থা। তবে হঁ, তাঁতীর ঘরের বিটা আমি তাঁত
বটে। উয়ার শেষ দেখতে হবেক। পারি ভাল, নইলে বংশীলালে
বানিদার হয়্যা চেরকাল থাকা করবক।'

হঁ, পাঁচুর মনে মনে ভাবা আর ওস্তাদের মুখে শোনা, ফারাক
বিস্তর। ওস্তাদেব কাছে উসব দিনের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বুকেব
মধ্যে খটখটিব মাকু চালাচালি করতো। বংশীলালের বালুচরী শেষ।
চন্দরবাবু সেই শাড়ি লিয়ে চলে গেল কলকাতা না দিল্লি না বোমবাই
কে জানে? মাধবদাসের মন খারাপ। বুনের ঘরে কুটুম্বিতা নষ্ট হয়ে
যাবার যোগাড়। তা বুললে কি হয়? ওস্তাদ নিজে নিজে হিসাব
মিল করালেক। পাঞ্চিং বাকসায় মগুর মেরে, জালিপাটায় বিঁধ কেটে
লসকা ফুটালেক। মেসিনের সঙ্গে খাচান দড়ি আর জালি পাটা খাটা
করলেক। সব গোছগাছ করে বনুইকে বানিদার করে বসানো হলো।
নিজে একবার মাচার ওপর মেসিন দেখতে যায়, জোপাতি, কাটানি,
আটডি সব কিছুর ওপর নজর খাড়া। নিজের হাতেই লসকার মীনা
মাকু গলিয়েছে, হাত বাড়িয়ে ভরনার মাকু ফাবড়িয়ে দিয়েছে। হঁ,
পাষাণলড়িতে চাপ দিয়া কর, ঝাঁপ ছাড় ঢেকিতে মার, ক্যারেং—
ঝট। দড়ি টানো জমিন খাপি কর।···

হঁ, অই সজনী ইকি শুনি। এত রাতে চরকার খুনখুনি। চন্দরবাবু
মাধবদাসের ঘরকে এস্থে হাজির। আঁজলা দেখে ওস্তাদকে বুকে
জড়িয়ে ধরে বুললে, অই কি মরি মরি হে অভয়। একই লসকায় দুই
রকমের কাজ। ই কেমন করে হয়, দেখি আবার তোমার লসকাখান।

ওস্তাদ লম্বা করে মেলে দিল নিজের বানানো নকসার ঘর কাটা কাগজ। চন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ লসকার কারকিতে ফারাক, বানিদারের কাজেও ফারাক। এ শাড়ি আমি লিব। খরচ খরচা আমার।'

সেই থেকে শুরু। পাকা রঙের মালমসলা খোঁজা আর হলো না এ জীবনে। ভয়ে ভয়ে প্রথম ছখানা শাড়ি বুনা করা হইচিল। সময় লেগেছিল পাঁচ মাস! তিন মাসে হওয়ার কথা। কিন্তু লসকাদার বানিদার, ছুইয়েরেই প্রথম কাজ। সময় বেশি লেগেছিল! চন্দরবাবু শাড়ি লিয়ে কলকাতায় গেল। হপ্তা না যেতে ফিরে এসে বললে, 'অভয়, তোমাকে কলকাতা যেত্যে হবেক। তোমাব শাড়ি দেখ্যে, লাট খুশি হঁইচেন।'

হঁ, লাট তখন হরেন মুখুজ্জে মশাই। ওস্তাদকে কাজের লেগে ডাকা করচেন। বীণাদাস ঠাকরূণ, ওঁয়াদের মেয়্যাবিটিদের কো-অপারেটিভ। ওস্তাদ টুকুস দোমনা করলেক। কলকাতা বুলে কথা। উখানকে কে কী বুলা করবেন কে জানে? তবু ওস্তাদ গিয়েছিল। অ হরি, কো-অপারেটিভ প্রথম কাজ দেখালো জামদানির। ওস্তাদ তখন একবার একটি লসকা দেখলে মাথায় গেঁথে যায়। মন চলে কেবল সুতোর বুনটে। জামদানি জামদানিই সই। লসকা করে বানিদারকে সব বুঝসুঝ করে, মেসিনে খাটিয়ে দিল। শাড়ি দেখে বিবিদিগের আনন্দের আর সীমা নাই। সেই ত্যাখন একবার লাটসাহেব হরেন মুখুজ্জেমশাই কো-অপারেটিভে আইচিলেন।

অই-হে, লাট বেলাটি বুলে কথা। ওস্তাদের বুকেও নাকি মাকু ফাবড়াচ্ছিল। তবে হঁ, মানুষটিকে দেখে মনে হইচিল কি কাছের মানুষ। হঁ, চিনিস্টার ত্যাখন বিধান রায় মশাই। ওঁয়ারও আসবার কথা ছিল। কাজে পড়্যে আসতে পারেন নাই। কিন্তু আর একজন

এসেছিলেন। শুনিচি, উনি নিজে এক বড় লসকাদার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেচিস? ওস্তাদের অইরকম আনখা আনখা জিগেঁসা। পাঁচু অনেক ভেবেও বাঁকুড়া বিষ্টুপুরের কোনো অইবকম ঠাকুরের নাম শুনে নাই। বলেছিল, মনে করতে লারছি আজ্ঞা।

পারবি কী কব্যে। পুঁথিপত্তর ত ঘাঁটা করিস নাই। উ ঠাকুরবাবু কবিতা নিকতেন, আমাদিগেব সঙের গান লয় ব্যা, কবিতা বুলে উয়াকে। কবিতা নিকে বিলাত থেক্যা পুরস্কার পাইচিলেন, লাখ টাকা, বুঁইলি। ওঁয়ারা মস্ত বড় মানুষ। ত ওঁয়াব এক কি ভাতিজা হ্বেন, কি লাতী হবেনগা, নামটা ভুল্যে গেইচি। ভব ঠাউর কি স্থব ঠাউব মনে কবতে লারছি। ত উনি কি করলেন, একদিন বাদশাই আমলের পঁচিশখান বালুচরি আমার সামনে রেখ্যা দিয়া বুললেন, ই শাড়িগুলানের কুন লসকাগুলান আপনি বানাতে পারবেন আব কুনগুলান পারবেন নাই, আলাদা কর্যে রাখা করবেন। হ, বড় ঘরেব বিটা ওঁয়ারা সব্বাইকে মান দিতে জানেন, আমাকে তুমি বলেন নাই। বেলা ত্যাখন হবে এগারটা। তা পবে ঠাউর য্যাখন ঘুরে এলেন ত্যাখন বিকল পাঁচটা। এসে দেখলেন শাড়িগুলান যেমন ছিল তেমনি রঁইচে। হঁ, ওঁয়ার মনে মনে টুকুস গোঁসা হইচিল। আওয়াজে মালুম দেয় ত। বুললেন, 'উকি ব্যাপার মশাই, শাড়িগুলান ছ্যাখেন নাই ক্যানে?' আমি বুললাম, 'দেখব নাই ক্যানে আজ্ঞা? আমার সব দেখা হয়্যা গেইচে।' শুনে ওঁয়ার আরো খানিক গোঁসা হল, বললেন, 'দেখা হয়্যা গেইচে তো, যে-গুলান পারবেন আর পারবেন নাই, আলাদা কবে রাখেন নাই ক্যানে?' আমি বুললাম, 'আজ্ঞা আলাদা করবার দরকার হয় নাই। সবগুলান আমার দেখা হঁইচে, আমি সবগুলানই পারবক, ইয়ার লেগ্যেই আর আলাদা কর্যে রাখি

নাই।' ত, আমার কথায় ওঁয়ার কেমন যেন ধন্দ লাগা করল। নিজের হাতে গোটা কয়েক শাড়ি বেছে বেছে, আমাকে দিয়া করে বুললেন, ই শাড়িগুলোনের লসকা তুলে, বুনা করাতে হবেক। পারবেন কি? বুললাম, ক্যানে পারব নাই। আপনি আজ্ঞা করেন।

হঁ, সবগুলান বুনা করতে হয় নাই। ওস্তাদ দুখানা বুনা করেছিল। উয়াতেই ঠাউরবাবু সন্তুষ্ট হঁইছিলেন। কিন্তু তখনই, কাজের ফাঁকে ফাঁকে লসকাগুলান কাগজে আঁকা করে রেখেছিল। পরে কাজ দিয়েছে। অই, কলকাতার বৃত্তান্ত অনেক হে, ওস্তাদ বুলতে আরম্ভ করলে দিন রাত কাবার হয়ে যাবেক গা। যেমন একবার সম্বলপুরী লসকাদারদের ডাকা করা হল কলকাতায়। লসকাদার আর বানি-দারেরা এসে শাড়ি বুনে চলে গেল, কিন্তু ওস্তাদকে ওয়াদের কারকিত কিছু দেখালো না। উয়াতে কী হয়? পাতের ভাতে যার লসকা ভাসে, ঘুমের ঘোরে সুতোর বুনোটে লসকা ফোটে, উয়াকে তুমি কী ফুটো দিবেক ভাই? ওস্তাদ সম্বলপুরীর লসকা করে, বানিদারকে দিয়া বুনা করিয়েছিল। কলকাতায় তখন ওস্তাদের ভারি কদর। রেশম তসরের বড় বড় গদীওয়ালা আর মিল কম্পানিগুলানের নজর ওয়ার উপর পড়েছিল। এক মেমসাহেব ধরে নিয়ে গিয়েছিল, উই কী বুলে দারজিলিন না কালিনপন। সেখানে শাড়ির কাজ হয়নি, মেমসাহেব-দিগের রেশম তসরের পোশাকে লস্‌কার কাজ হয়েছিল। লসকাদারের চাকরির জন্য আমেদাবাদ থেকে ডাক আইচিল। ওস্তাদ বমবাই সরকারের কাজে গেঁইছিল। তারপরেও অনেকদিন কলকাতায় কাজ করেছে।

কিন্তু অই, টাকা বড় না জীবন বড়। উয়ার মধ্যে আবার ব্যায়রামটি শরীর পাত করে। কলকাতার জলে ওস্তাদের পেট

ব্যায়াবাম হইচিল। বিষ্টুপুরের জল হাওয়া উখানকে মিলে নাই। বিষ্টুপুরের মাটিতে ঘুরাফিরা না করলে, বাঁধে না নাইলে, ভাত জল না খেলে, শরীর ঠিক থাকবে ক্যানে? দেশের টান বড় টান, আর ওস্তাদকে কেউ ধরে রাখতে পারে নাই। তা উয়ার মধ্যেই চৌদ্দ বছর কেটে গেঁইচিল। রামের বনবাস যেন। বিষ্টুপুরে ফিরে ওস্তাদের কদর বেড়েছিল বই কমে নাই। চন্দরবাবুর বিটা মহাদেব দাস, উয়ার বিটা ঈশ্বরদাসের আমল পর্যন্ত রেশম খাদি সেবা মণ্ডলের লসকার কাজ করেছে।

'খাঁইচ নাই যে গ পাঁচু ঠারপো।' বড় বউদি চা ভরা কলাইয়ের গেলাস সামনে রেখে বললো, 'কত্তা কি বকা ঝকা করেচে?'

পাঁচু আনখা হাসলো, হাত দিয়ে মুড়ি মুখের কাছে তুলে বললো, 'না, ই সব নানান কথা ভাবচি, সংসার এক জায়গা বটে।'

বড় বউদি হাসলো, 'উ ত ঠিক কথা, তা ভেবে আর কি করবেক।'

'হুঁ। কত্তাকে খাবার দিইচেন কি?' পাঁচু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো।

বড় বউদি ঘরের ভিতর বাগে যেতে যেতে বললো, 'হুঁ দিয়া করচি, তুমার সঙ্গেই। খাওয়া হয়্যা গেল বোধায়।'

পাঁচু তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করলো। হুঁ, এক লসকার চিন্তায়, কতো কথাই মনে এসে গেল। আসলে চিন্তা তো একটাই। মুড়ি খেয়ে, ঢকঢকিয়ে জল গিলে, চায়ের গেলাস হাতে তুলে নিল। বারে বারে ফুঁ দিয়ে চা ঠাণ্ডা করতে করতে, সুড়ুৎ সুড়ুৎ চুমুক দিল। ঘরকে থাকলে একখান চ্যাটান বাটি লিয়ে ঢালা করে খেতে পারতো। গরম গরম চা কোনোরকমে শেষ করেই, পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে, একটা বিড়ি জ্বালালো। ইটি না হলে নয়, বিশেষ চায়ের

পরে। কিন্তু শান্তিতে টানা করতে পারল না। উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ওস্তাদের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, ওস্তাদ ইদিক উদিক হাতড়াচ্ছে। পাঁচু ঘরের ভিতরে ঢুকে বললো, 'কী খুঁজচেন আঁজ্ঞা?'

'কে পাঁচু এঁয়েচু?' ওস্তাদ চোখ তুলে তাকালো, 'আমি ভাবি তু চলে গেঁইচিস। আমার ছিকরেট দেশলাই কুথাক গেল, দেখতে লারছি।'

হুঁ, ওস্তাদ এখনো দু চারটে ছিকবেট টানা কবে। উটি কলকাতার ধবা অভ্যাস। পাঁচুর ব্যাতে আবার উটি রোচে না। উয়াব স্বাদ কেমন আলুনা আলুনা লাগে। বিড়ির মতো সুখ নাই। ওস্তাদের বিছানার শিয়রেব বালিশের কাছেই ছিকরেটের বাকসো দেশলাই ছিল। পাঁচু তুলে এনে ওস্তাদের হাতে দিল। আলাবাম আর চশমাখানি এখন পাশে সরানো। চায়ের গেলাস মুড়ির বাটি খালি। ওস্তাদ চোপসানো ঠোঁটে ছিকরেটটি দেশলাই জ্বেলে ধরা করালেক। অই, পাঁচুর বুকে ধড়াস্সে যাচ্ছে। গায়ে ঘাম দিচ্ছে। ঘন ঘন নিজের কাগজ পাকানো লসকাটির দিকে দেখছে, আর আড়চোখে ওস্তাদের মুখের দিকে।

হুঁ, ওস্তাদ চোপসানো গালে ছিকরেট টানা করছে, ধোঁয়া ছাড়ছে, আর জানালার দিকে আনমনা তাকিয়ে রয়েছে। আনমনা না। দেখলে মনে হয় আনমনা। ওস্তাদ সব সময় কী ভাবে আর মাঝে মাঝে নিজের মনেই বলে ওঠে, 'হুঁ।' যেন ভিতর বাগে টানার ঘরে, সব সময়েই ভরনার মাকু দাবড়িয়ে চলেছে, আর কী বুনা করে চলেছে।

'ইয়া, বানির কাজটা কেমন আগাইছে র‍্যা পাঁচু?' ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলো।

পাঁচুর তাঁতে এখন যে বালুচরি বুনা চলছে, উয়ার কথাই জিজ্ঞেস

করছে। ওস্তাদ উটি রোজ একবার জিজ্ঞেস করে।

পাঁচু বললো, 'ভালই আগাইচে আঁজ্ঞা।'

'বাজারকে যাবি কি?' ওস্তাদ জানালার দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলো।

জানালার বাইরে একটা আতাগাছ দেখা যায়। পাঁচু বললো, 'রোজ আর বাজারকে কী কিনা হবেক আঁজ্ঞা। কেড়ালির ডাল আর ভাত হবেক।'

'উয়াব সঙ্গে পস্তুলাড়া অঁ?' ওস্তাদ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়া কবে। মাড়ি বের করে হাসলো।

পাঁচুব জামা ঘামে ভিজে উঠছে। গোঁফের চারপাশে, ভুরুর ওপবে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকের ঘরখান দগরেব পিটাইতে ফুটে যাবেক গা নাকি? ওস্তাদের মনটা ভালই আছে, হাসছে। সে বললো, 'আঁজ্ঞা হঁ, পস্তুটি না হলো চলে নাই। একটা কথা আঁজ্ঞা—।' কথা শেষ করতে পারলো না।

ওস্তাদ মুখ ফিরিয়ে তাকালো, 'বুল ক্যানে? বেপদ আপদ কিছু হঁইচে কি?'

'আঁজ্ঞা না।' পাঁচুর গলার নলিতে স্যুতোর জট পাকিয়ে যায়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবেক। তবু বললো, 'একখান লসকা তুলা করেচি আঁজ্ঞা।'

ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলো, 'কুথা থেক্যা? লতুন কিছু পাইচিস?'

ইয়ার অর্থ নতুন কোনো শাড়ি থেকে পাঁচু লসকা তুলেছে কী না। সে বললো, 'আঁজ্ঞা আমনার মন থেক্যা আঁকা করেচি।'

'বটে?' ওস্তাদ ছিকবেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'লিয়া আসিস দেখব।'

পাঁচুর স্বর যেন হড়কিয়ে গেল, 'আঁজ্ঞা লিয়া আইচি।'

'লিয়া এঁয়েচু?' ওস্তাদের নয়া তামার পয়সা কপালে কতগুলো ভাঁজ পড়লো, 'দেখি, দে।'

পাঁচু আগে চশমাখানি নিয়ে ওস্তাদের হাতে দিল। তারপরে হাত বাড়িয়ে পাকানো কাগজখানি নিয়ে, ওস্তাদের দিকে এগিয়ে দিল। 'এখন ছিঁড়া কুটা করেন, আর যা-ই করেন, আপনার মর্জি আজ্ঞা।' পাঁচু মনে মনে বললো, কিন্তু সামনে বসে থাকতে যেন শরীরে খিচ ধরছে।

ওস্তাদের পিছনের দেওয়ালেই আর একটা জানালা ফোটানো। দিনের বেলা যা কিছু দেখাশোনা, সবই জানালার আলোয়। ওস্তাদ চোখে চশমা এঁটে কাগজখানি হাত বাড়িয়ে নিলেন। কাগজের পাক খুলে চোখের সামনে তুলে ধরলেন। হুঁ, হাত এদানি তেমন সাব্যস্ত নেই, টুকুস টুকুস কাঁপে। দেখ এখন মুখখানি। হাসি কোথায় গেল? কাঁচের ভিতর চোখ দুটি যেন ধারালো কেঁচার মতো জলের তলে মাছ খুঁজে ফিরছে। ভুরু দুইখান ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে উঠেছে। নাকের পাটা ফোলা, ঝকঝকানো তামারও মুখের চামড়া টান টান। হাতের ছিকরেটটা তালাইয়ের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাঁচু সেটি কুড়িয়ে নিয়ে পিকদানিতে ফেলে দিল।

পাঁচুর যেন চেত ভেদ নেই। কলকল করে ঘামছে। সমস্ত প্রাণ দুই চোখে এসে ঠেকেছে, সেই চোখ দেখছে কেবল কাঁচের ভিতর বাগে দুখানি কেঁচা খাড়া চোখের দিকে। অই, জগত সংসারখানি কি থেম্যে গেঁইচে হে? কুথাকেও টুকুস শব্দ নাই। বেলাও কি ঠেক খেয়্যা গেঁইচে? বাইরে কি কেগা বনা ডাকে না?

ইয়া—! ওস্তাদের গলা থেকে শব্দ বেরুলো, 'মনসার পিতিমে

আঁকিস নাই ক্যানে পাঁচু ?'

পাঁচুর বুকের টানায় যেন চৌতারের জট পাকিয়ে গেল, 'আঁজ্ঞা উটি আপনার কাছকে শিখা করেচি, লসকাতে দেবদেবীর মুতি্ তুলা করতে নাই। মা-ঠানদেব গায়ের শাড়ি পায়ে লাগে, উটির ভয়ে দেবদেবীর লসকা শাড়ি কেউ পরতে চান নাই।'

হুঁ হুঁ। ওস্তাদ মাথা ঝাঁকালো। তামা রঙ গালে ভাঁজ মাড়ি দেখা যাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে পাঁচুর কাঁধে রাখলো, 'শুন র‍্যা পাঁচু, লসকাখান ভাল হঁইচে র‍্যা বিটা।'

অই অই, পাঁচুব টানার ঘরে সুতোয় বড় টান লাগছে, ছিঁড়ে যাবেকগা। অনেক লসকার পরে একখান। অই, পাঁচুর চোখের সামনে বালুচরের জমিন, সব ঝাপসা হয়ে যাঁইচে। সে উপুড় হয়ে ওস্তাদের দু পা জড়িয়ে ধরলো, 'আপনার আশীর্বাদ আঁজ্ঞা।'

ওস্তাদ পাঁচুব মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, 'হুঁ, উঠ র‍্যা চ্যালা। সোন্দর আঁকা করেচু র‍্যা বিটা। ইয়াকে বুলে লসকাদারের ধেয়ান। লসকাদাবের ধেয়ানে লসকা থাকা কবে। ইটি সেই ধেয়ানের কাজ। উঠ কর বিটা, বস।'

পাঁচু উঠে বসলো। দু হাত দিয়ে দু চোখ ঘষা মোছা করলো। দেখ লসকাদারেব চোখ দুখান যেন লাল করমচা। এতক্ষণ বুকের ঢাকের দগরে বিসর্জনের বোল বাজছিল। এখন আরতির বোল বাজা করছে। হ্যাঁ, এই হল ওস্তাদ। কেবল ফ্যাস ফ্যাস ছিঁড়ে না, গাল-মন্দ করে নাই। আদরও করে। দেখ, এখনও কেমন লসকাখানি দেখছে, আর টুকুস টুকুস মাথা ঝাঁকাচ্ছে, গলায় আওয়াজ, হুঁ হুঁ···। তারপবে জিজ্ঞেস করলে, 'জমিন লসকার রঙ কিছু ভেবেচু ?'

পাঁচুব গায়েব ঘাম এখন ঠাণ্ডায় জুড়াচ্ছে। বললো, 'আঁজ্ঞা

াম রঙের জমিন— ।'

'না।' ওস্তাদ মাথা নাড়লো, 'বাঁধের মাঝখানকের জলের যেমন
ঙ জমিনটা সেই রঙ হবেক।'

পাঁচু বললো, 'তবে উটিই হবে আঁজ্ঞা। লসকা হবেক আমাদিগের
বিষ্টুপুরের লাল মাটি রঙ, আর উয়ার সঙ্গে মেজেন্টা।'

ওস্তাদ অন্য জানালায় আতা গাছের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে
াইলো, তারপরে আবার পাঁচুর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'হুঁ হুঁ,
টি খুলবেক। মাটির রঙটা বিষ্টির জলে ভিজা রঙ করিস।'

পাঁচু আবার ওস্তাদের পায়ে হাত দিতে গেল, 'আপনি
আশীরবাদ করেন আঁজ্ঞা।'

ওস্তাদ পাঁচুর হাত ধরে বললো, 'লে, আর পায়ে হাত দিতে
হবেক নাই র‍্যা বিটা। উ ত তু রোজ দিয়া করিস। আমি তোকে
এমনিই আশীব্বাদ করি। এখন ঈশ্বরদাসের কিরপা।'

পাঁচু ঈশ্বরদাসের জন্য ভাবে না। ওস্তাদের যখন পছন্দ হয়েছে,
উয়ারও পছন্দ হবেক। সে বললো, 'উসব আঁজ্ঞা আপনি জানেন।'

'হুঁ, আজকালের ভিতর ঈশ্বরদাস আসবেক। ত্যাখন উয়ার সঙ্গে
কথা বুলব।' ওস্তাদ লসকাটি নিজের সামনে তালাইয়ের উপর
রাখলো।

হুঁ। ইয়ার মানে ওস্তাদ এখন বসে লসকাখানি দেখবে, আর
ভাববে। যেমন আলাবামখান লিয়ে নিজের লসকাগুলান দ্যাখে,
পাঁচুরটাও সেইরকম দেখবে। কিন্তু ইদিকে পাঁচুর ভিতর বাগে দেখ।
ই এখন আরতির লাচ লাচবেক হে।

বললো, 'ত আমি এখন যাই আঁজ্ঞা?'

'হুঁ, তু যা।' ওস্তাদ অনুমতি দিল।

পাঁচু উঠলো, ঘরের বাইরে এলো। জয় বাবা বিশ্বকর্মা। পিড়া
পুববাগে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে একটা
বিড়ি ধরা করাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠোনে
নামলো। পায়ে ঘোড়ার দৌড় লেগেছে। ভিজা জামা কাপড় যে
পিড়ার এক পাশে পড়ে রইলো, উদিকে লসকাদারের খেয়াল
হলো না।

হুঁ, ক্যানে? আঁকুড়্যার জঙ্গল ঝোপঝাড় সবখানি তো আর
যোগেন বীটের জমিদারি লয়। পাঁচু এখন আকুড়্যার বনের ভিতর
দিয়েই যাবে। ই অংখারের কথা লয় গ যোগেন বীটের বউ, পাঁচু
কীতের পরান এখন আহ্লাদে লাচ করচে। তুমি আমাকে রাস্তায়
দেখতে পারবেক নাই। আমি আজ তুমাদিগের হিঞ্চেগোড়ার ধারে
দিয়ে চলে যাবকগা। কে জানে, আ— যদি তুমি আওয়াজ দিয়া কর,
পাঁচু কী কর্যে বসবেক কুন ঠিক আছে কী? হুঁ, ওস্তাদ বলেছে লসকা
ধেয়ানে থাকে। তুমিও এক লসকা বটে, বড় জবর লসকা। আজ
লসকাদারের মন প্রাণের ঠিক নাই।

যোগেনও একজন লসকাদার। কালীচরণ হেঁসের চ্যালা। কালী-
চরণ হেঁস বেনারসে গিয়েছে, ব্যাঙালোরে গিয়েছে। বেনারসী
ব্যাঙালোরের লসকা বানিদারের কাজ ভাল জানে, উয়ার নাম
আছে। কিন্তু বালুচরিতে সুবিধা করতে পারে না। অথচ যোগেন
হলো বংশীলাল বীটের নাতী। উয়ার কপাল মন্দ, বয়স হবার
আগেই বংশীলাল মারা গিয়েছিল। বংশীলালই বিষ্টুপুরের
বালুচরির প্রথম লসকাদার। আর উটিই কাল করেছে। অভয় খান
উয়াদের কাছে চিরকালের শত্রু। নইলে যোগেন কি অভয় খানের
চ্যালা হতে পারতো না?

চ্যালা হবেক ? অই গ, উয়ার সামনে কেউ অভয় খানের নাম
ালে, চোখে আংরা ধকধকায় । ব্যাঁতে কুন কথা আটকায় না । বলে,
় বড়া খান শালা ত চোর । আমার কত্তাদাদাকে ভুলে ভাল্যো
াপড় লিয়াগা লসকা তুলা কর‍্যেচিল । উ শালা ত পাকা রঙের
কিরে ছিল ।'

হঁ, পাঁচুকে দেখতে পেলে যোগেন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে ।
ার সময়ে অসময়ে চেলামূলাটি পেটে আছেই । ত্যাখন যদি পাঁচুকে
াখে পড়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই । 'অই দ্যাখ, চোরেব
াগরেদ যাঁইচে হে ।'···হঁ, যোগেনের গতরখানি দশাশয়ী, তাগদ বেশি
াকতে পারে । হঁ হঁ, রামসাগরকে তুদিগের শালা অনেক জমিজিরাত
াছে, বছুরকের খোরাকি মিলেও কিছু বিচা করতে পারিস । পাকা
াঠা ঘরকে তুদিগের চারটে তাঁত আছে, চারটে জেকার্ড মেসিন
াড়া । বাজারের বানিদার দিয়ে ব্যাঙালোর বুনা করাইচুঁ, তাও
ব সময় খাঁটি পাট দিয়া লয় । অই, পাট মানেই রেশম হল্যগা । আর
ালপাকার শাড়ি বুনা করাইচুঁ । ব্যাঙালোরের লসকাদার তু, বড়
সকাদার হঁয়েচু । উদিকে পাট তসরের থান বুনা করাইচুঁ, লাখা
টকার থান বুনা করাইচুঁ । ঈশ্বরদাসের সঙ্গে কারবারের হাতটি
ারি তেলা । ঘরকে আছে বড় গোয়াল, খুব দুধ খাঁইচু, উদিকে
ারাণশিলা আছে, রোজ সকালকে পূজা হঁইচে, সাঁজবেলাতে শীতল
ইচে, বাভন ঠাউরের আনাগোনা ঘণ্টা কাসী বাজা হঁইচে, ত দুনিয়ার
াথা কিনা কঁরেচু, অঁ ? যিয়ার বিষয়ে য্যাখন যা ব্যাঁতে আসবে, তাই
লবেক ? পাঁচু তোর মাহিন্দার বানিদার লোক না । সেও দাঁড়িয়ে
ায়, বলে 'কুন শালা কাকে কী বুলা করচে, নাম লিয়া করে বুলা
রুক ।'

রাস্তার আশেপাশের দোকানদার, চলতি লোকজন সবাই ঘুটিকে দেখে থমকে যায়। হঁ, যোগেনের উইটি ঘুগিগিরি, আনখা অভয় খান ওস্তাদ বা পাঁচুর নাম লিয়া কিছু বুলবেক নাই। চেলামূলাটি পাঁচুর পেটেও যে কখনো থাকে না, উটি ত বুলা যাবেক নাই। তবে তা টুকুস সময় অসময় আছে। কিন্তু ওস্তাদের নামে যোগেন বীট পাঁচুকে শুনিয়ে কিছু বুললেও, তারও মাথায় রক্ত চড়ে যায়। যোগেনের দশাশয়ী তাগদদার চেহারাকে সে ভয় পায় না। উ বকম ঘটনা অনেকদিনই পথে ঘাটে ঘটেছে। চেনা পথ চলতি মানুষজন আব দোকানদারেরাই হেঁকে ডেকে বুলা করেচে, 'অই অই যোগেন, কী বুলছ হে? অই পাঁচু ঘরকে যাওগা।'

পাঁচু কারো খুঁটি ধরে লাড়ি করতে যায় না। কিন্তু উদিকে ত্যাখন কালো কাঁড়াটার মতো যোগেন লাল টকটকে চোখে আংরা জ্বেলে, উরুতে চাপড় মেরে হাঁকড় দেয়, 'আমি আমনার মনে যা খুশি তা বুলা করচি। আমি কারুকের বাপের নাম লিয়া করচি?'

পাঁচুও জবাব করে, 'আমিও কুন শালার নাম লিয়া কিছু বুলা করি নাই। কিন্তু আমাকে যদি কেউ গালি বকে, উয়ার জিবটো টেন্যে ছিঁড়া লিয়া করবক, হঁ।'

আশেপাশের লোকেরাই সামাল দেয়, হঁ হঁ, তোমরা আমনার আমনার কথা বলচ, এখন আমনার আমনার ঘরকে যাওগা বাবারা।

পাঁচু পা বাড়ালেও যোগেন সহজে ছাড়বার পাত্র না। দু হাতের মাংসে গুলি উঁচিয়ে বলে, 'চোরকে চোর বুলব, উতে কুন শালা আমার জিভ টেন্যে লিয়া করবেক, সে বাপের বিটাকে দেখতে চাই।'

পাঁচুকে ত্যাখন আশেপাশের কারোর দিকে তাকিয়ে সাক্ষী মানতে হয়, 'চোর কে? কাকে তু চোর বুলা করেচু, একবার নাম

লিয়া কর। আমি বাপের বিটা হেঁথাকে খাড়া হয়্যা রইচি।'

না, রাস্তাঘাটে দোকানদার লোকজনের সামনে যোগেন কারোর ামটি লিয়া করবেক নাই। উয়ার পেটে চেলা মূলা থাকলেও ঘুগি- গিরিতে উয়ার জুড়ি মিলবেক না। নিজের নেহাই চওড়া বুকের পাটায় াপড় মেরে হাঁকবে, 'চোরকে চোর বুলা করব, উয়ার নাম লিব নাই। াামি আমনার মনে যিয়াকে খুশি চোর বুলা করব, উয়াতে কার কী াাস্তে যায়?'

লোকজনেরাই তখন যোগেন আর পাঁচুকে ছুদিকে ঠেলাঠেলি রে সরিয়ে দিতে থাকে।

'হুঁ, হঁ হঁইচে হে, তোমরা যে-যার আমনার মনে বুলছ, এখন ামনার আমনার ঘরকে যাওগা। যাও, যাও। আসলে রাস্তাঘাট াড়ার লোকেরা সবাই বোঝে, সবাই জানে, যোগেন কাকে চোর লতে চায়। যোগেনকেই বেশির ভাগ দোষ দেয়। তবে ইয়াকে কেউ াটাতে চায় নাই। টাকা আছে, তার উপরে মুখে খারাপ বুলি, ারামারি করবার তাল খোঁজে। ইদিক উদিক কলাটা মূলাটা না পল্যে, চকের ষাঁড় যেমন করে। সবাই বোঝে, যোগেন পায়ে পা য়ে ঝগড়া করতে চায়। কিন্তু বিষ্টুপুরের লোকের কাছে অভয় খান স্তাদের নামে খারাপ গাইবে উটি কেউ শুনতে চায় নাই। ঘুগি াগেন বীট সেটাও খুব ভালো জানে।

অই, জানলে কী হবেক হে, পাঁচুকে যেথাকে দেখতে পাবে, য়ার মাথায় রক্ত উঠে যাবেক। দিনে মানে রাস্তাঘাটে তবু এক- কম, রাত্রে বাউরিপাড়া হলে তো কথাই নেই। তখন দূর থেকে চেলা ালতে গিলতে ওস্তাদের নাম নিয়েই যা মুখে আসে, গালি বকতে াকবে। পাঁচুও চুপ করে থাকতে পারে না। ক্যানে থাকবে? অভয়

খান কি চোর? তোর কত্তাদাদা যে-শাড়ি থেকে লসকা তুলা
করেছিল, ওস্তাদ অভয় খানও সেই শাড়িটির লসকা তুলা করেছিল।
হুঁ, ই বুলতে পার কি ওস্তাদ মিছা কথা বুলে শাড়িটি লিয়া আইচিল।
মিছা না বুললে বংশীলাল দিয়া করত নাই। কিন্তু চুরিটা কোথায়
হলো। এখনও অভয় খান বুলা করে, 'বালুচরির পেরথম লসকাদার
বংশীলাল বীট। উয়াব পবে আমি।…তা তুমি লসকা আর বানি
কারকিত দেখবে নাই? উয়াতে চুরির কী আছে? চন্দরবাবু কি
ল্যাকা অঁড়র্কক বটে? উয়ারা মাড়ারি গদীদার। য্যাতেই উয়ার ব্যাট
লাতী রেশম খাদি সেবা মণ্ডলের মাইনা খাওয়া সেকেরটারি হোক।
ব্যবসাদার গদীওয়ালা তো বটে। বংশীলালের বালুচরের লসকা আর
বানি যদি দেশ বিদেশের নজর-কাড়ানি হতো, তবে কি মাড়ারি
গদীদার অভয় খানকে তেল দিয়া করত?

হঁ, উ কথাটি তুমি যোগেনকে বুঝাতে লারবে। রাস্তাঘাটে যেমন
বাউবিপাড়াতেও তেমনি এক-একদিন ধুতুমাব লেগে যায় আর কি
ত্যাখন য্যাতো মাতাল আর বাউরি মরদ বিটি বউরা সামাল দিতে
আসে। দু একবার ছোটখাটো হাতাহাতি হয়্যা গেঁইচে। ইবাবে
কুনদিন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়্যা যাবেক। শালা পাঁচুকে দু চক্ষে
দেখতে লাবে। ক্যানে। পাঁচু তোকে কুনদিন আগ বাড়িয়ে কিছু
বুলতে গেঁইচে? ইয়া, নিজের ঘরকে, ইদিকে মাকু ফাবড়াতে, উদিকে
সুতা ফুরিয়ে যায়, যোগেনের সঙ্গে ক্যানে লাগতে যাবেক?

উটি বুল নাই, উ জানেন দেবতা বিশ্বকর্মা। দেবতাই জানেন
যোগেন বালুচরের অনেকগুলান লসকা ঈশ্বরদাসকে দিয়েছে, কুনটা
সে ল্যায় নাই। সে দোষ কি পাঁচুর? হুঁ, দেবতার মনের ই কথাটা
জানলেও পাঁচু বুঝে উঠতে পারে নাই, মোতি ক্যানে উয়ার বউ টুকির

ছু চক্ষের বিষ। পাঁচুর 'ছোটবউ' আমনার মনে চরকা বুনা করে, নলিতে সুতা পরায়, রান্নাবান্না করে শ্বশুর বিটাবিটি বানিদারকে খাওয়ায়। এমন না যে, আর আর কোনো কোনো তাঁতী বউয়ের মতো পাড়ায় ঘোরে, ইয়ার কথা উয়াকে বুলে আর লারদ লারদ বুল্যে ঝগড়া বিবাদ লাগায়। উয়াকে তুমি খরিশ নজরে ছ্যাখ ক্যানে যোগেনের বউ? তোমার ঘর ভরা ধান চাল তাঁত গরু। গায়ে সোনার গহনা। উয়াকে যেথাকেই দেখবে, তুমি একেবারে ফোঁস মনসা। ক্যানে গ সোনার অঙ্গ রোপসী পিতিমে? হুঁ, দেবতার ই মর্জিটির হদিস পাঁচু পায় না। ভাবে, ছোট বউ তো আর লসকাদার না, তবে?

অই, সে আবার আর এক লসকা। মোতি মাঝে মাঝে ছোট মাকুর মতো টানা চোখের মীনা ঠিকরিয়ে হেসে বলে, 'তুমি টুকির কাছকে একদিন যাও ক্যানে, তালে উ ঠাণ্ডা হবেক।'…পাঁচুর বুকে মাকু ফাবড়ায়। ক্যানে, মোতি আবার ওসব জিগির দেয় ক্যানে? টুকির আওয়াজ বাখানের কথা কিছু জানে নাকি? শুনা করেচে কিছু? পাঁচু জির্গেসা করলে মোতি জবাব দেয়, আর ত কুন কারণ মারণ দেখি না। আমি লসকাদারেব বউ বুল্যেই উয়ার গোঁসা হত্যে পাবে।

পাঁচু 'ধুস, তু মাগীদিগের য্যাত আনতাবাড়ি কথা' বলে সামনে থেকে চলে যায়। কিন্তু মনে মনে ভাবে, হতেও পারে। আবার মনে হয়, তাই যদি হবে, তবে পাঁচুকে ওরকম আওয়াজ বাখান শোনায় কেমন করে? উ ত ডোম বাউরি মাতাল বউ বিটিদের বাড়া। এতো সাহস!

হুঁ, আজ পাঁচু আঁকুড়ার জঙ্গল দিয়েই চলেছে। রাস্তা দিয়ে গেলে টুকির কথার জবাব কুনদিন দিতে লারবে। আজ আঁকুড়ার ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে রোপসীটিকে দেখা যাবেক। ক্যানে? না, অংখার

লয়, আজ এখন পাঁচুব প্রাণে লাচ হুইচে হে। 'লসকাখানি সোন্দ
আকা করেচু র‍্যা।'···ওস্তাদ আজ আদর করেছে না? হঁ, আজ
টুকিকে একবার চোখে দেখবে। কথা তো কোনোদিন বলতে পারে
না। পাঁচ কান হয়ে বিঁড়াইয়ের জল যশোদায় গিয়ে বানে ভাসাবে

'কে যাঁইচু র‍্যা? পাঁচু না?' ছোট বাউনঠাউরের গলা।

পাঁচু বিড়িটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। অই একেবারে যোগেন বাঁটের ঘরের দরজায় ছোট ঠাউরদা দাঁড়িয়ে পরনে তসর, গায়ে পুবনো একখানি মটকার চাদর. হাতে একট কিসের পঁটুলি। পাঁচুর মনে পড়ে গেল, ছোট ঠাউরদা যোগেন বাঁটের বাড়ি নারাণ পূজা করে। সে কিছু বলবার আগেই কুঞ্জ ঠাউর আবার বললো, 'তু আকুড়্যা ঝাড় লাড়ি দিয়া কোথাকে যাঁইচ র‍্যা? হিঞ্চেগোড়া?'

অই, শুন হে ছোট ঠাউরদার কথা। পাঁচু কুনদিন আঁকুড়্যার ঝোপে হিঞ্চেগোড়ায় ঘাট করতে এসেছে? গোড়া মানেই ডোবা। ঘাট যাওয়া মানেই পায়খানা ফিরতে যাওয়া। পাঁচু এমনিতে কোনোদিনই দিনেমানে আঁকুড় বনে ঢোকে না, হিঞ্চেগোড়ায় ঘাট সারতে কোনোদিনই আসে না। সাঁজবেলাতে কোনো কোনোদিন বাউরিপাড়া যেতে হলে, আঁকুড় বনের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ে যেন কেউ দেখতে না পায়। তা ছাড়া পাঁচুর এখন মনে পড়ে গেল, ঘণ্টা কাবার হয় নাই, যোগেনের বউ যমুনায় মহিষমর্দিনী রূপ দেখিয়ে এসেছে। খেয়াল থাকলে, এ পথ দিয়ে যাবার সাধ হতো না।

ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে যাকে একবারটি চুরি করে দেখে যাবে, সে এখনো নিশ্চয় হাঁড়ি চাপা শিয়রচাঁদার মতো ফুঁসছে। অই র‍্যা শালা অদধপুতা, লসকাদারি ছেড়ে, দৌড়া ক্যানে? অসময়ে পাল

লিতে এঁয়েচু বকনা গাইয়ের মতো ? সে বললো, 'হিঞ্চেগড়া যাবক নাই গ ছোট ঠাউরদা। ওস্তাদের ঘরকে গৈইচিলম। কাজের ভারি তাড়া, ঘরকে যাঁইচি।'

কুঞ্জ ঠাউর—পাঁচুর ছোটঠাউরদা তখন দরজার পিছন ফিরে কার সঙ্গে কথা বলছে। যোগেন বীট হবে বটে।

পাঁচু যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, 'পেন্নাম আজ্ঞা ছোট ঠাউরদা, চলি।'

'আরে শুন শুন।' ছোটঠাউরদা দরজা থেকেই ডাকা করলেক, 'ইদিকে আয়, যোগেনের বউ তোকে পেসাদ লিতে ডাকচে।'

অই শালা, হিতে বিপরীত গ। পাছে লসকাদার আজ টুকির আওয়াজ বাখানের জবাব দিয়ে ফেলবে, উ ডরকে ঘরের সামনে দিয়ে যায় নাই। বাড়ির অন্যদিকের বনের রাস্তা ধরেছিল, একবার যদি চোখে পড়ে। ই কি মরণের ডাক নাকি ? ইকেই বুলে কাটরা মেমায়, না ছাগল মেমায়। হাঁড়িকাঠি ডাকে, না ছাগল ডাকে ? বাড়ির ভিতরবাগে যোগেন বীট কি ঢেঁকি কাঠ বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? এমন অপরখোতা কথা কেউ শুনেছে, পাঁচু কীত ঢুকবে যোগেন বীটের ঘরকে ? আরতির বোল আর বাজছে না, বুকে এখন বিসর্জনের দগর। সে তাড়াতাড়ি বললো, 'ছোটঠাউরদা, আমাকে এখন গদীতে যেত্যে লাগবেক গ। ওস্তাদের হুকুম ঈশ্বরদাসবাবু ডাকা করাইচে।'

'ক্যানে গ ঠাউর কত্তা, লসকাদার টুকুস পেসাদ লিতে আসতে পারে নাই, নাই কি ?' টুকির গলা শোনা গেল, আর তার মুর্তিটিও দেখা গেল, ছোট ঠাউরের হিলহিলে সরু গতরের পিছনে।

হুঁ, ই যে বাবা কাটরা মেমাইচে গ। পিতিমের সোনার অঙ্গে লালপাড় শাড়ি। খোলা চুলের গোছা ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের

পিড়ায়, তার ওপরেই ঘোমটা টানা মাথার মাঝখানতক। কপালে যেন এই মাত্তর সুয্যি উঠেচে আর উয়ার ঢল খেলে গেঁইচে সিঁথের ওপর দিয়ে। ঠোঁটের কোণে হাসির লসকা, চোখের কালো তারা বিজলায়। কিন্তু বাজ ডাকে পাঁচুর বুকে। লসকাদারকে প্রাণে মারবেক গ?

'অই শালা পাঁচু আয় ক্যানে।' ছোট ঠাউরদার গলায় এবাব ঝাঁজ, 'শালা' বুলা করচে।

হুঁ, গলায় দড়ি বাঁধা নেই, তবু ছাগলটাকে যেন কেউ হাঁড়িকাঠের দিকে টেনে নিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে, আগে ঝপ করে নিচু হয়ে কুঞ্জা ঠাউরের পায়ের ধূলা নিতে যায়। ছোট ঠাউরদা এক লাফে বাড়ির ভিতর বাগে আর একটু হলেই টুকির ঘাড়ে গিয়ে পড়তো। খিঁচিয়ে উঠলো, 'শালা অদধপুতা আর কাকে বুলে। এখনো তু ঘরকে পূজা করতে যেত্যে হবেক আর তু আমাকে ছুঁতে আঁইচু? শালা অড়কঁক।'

হুঁ, ভিক্ষাভাইটি এখন তোমার কাছে শালা অঁড়কঁক। ছুঁয়ে দিলেই যজ্ঞি নাশ। আর য্যাখন চেলা মূলার বোতলটি ছিনিয়ে লিয়ে মুখে চেপে গলায় ঢালা কর? কিন্তু উদিকে শুন, বৌটের ঘরনী হেসে বাঁচে না। নাকের চাবিতে ঝিলিক মারে। বুকের উঁচু পিড়া থেকে আচল খসে যায়, গলায় সোনার হার কালনাগিনীর মতো বের হয়্যা আসবেক মনে ল্যায়। উ বাবা, পাঁচু দেখতে লারবে। কিন্তু দেবতার কী মর্জি বটে। এই টুকুস আগে না তুমি যমুনার জলে রণরঙ্গিণী রোপ ধারণ করেছিলে? তবে কি না, ইও এক রণরঙ্গিণী মূর্তি।

'ভিতর বাগে আয় শালা, আমাকে যেত্যে দে।' ছোট ঠাউরদা হাঁকোড় দিল।

টুকি তাড়াতাড়ি বললো, 'ঠাউরকত্তা, আপনি উয়াকে লিয়ে পিড়ায় আসেন গ, আমি পেসাদ লিয়া আনা করচি।' বলে, পাঁচুর দিকে একবার বিজলানো চোখ হেনে শাড়ি খসখসিয়ে কোঠা পিড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

অই গ। সোনার অঙ্গে কাটরা মেমাইচে হে। রোপসীর কোমরে বাঁধেব জলের ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। পায়ে বাসি আলতার দাগ, চলনে বড় স্ফূর্তি। টুকি পিড়ায় উঠে ঘরের ভিতর ঢুকলো। পাঁচু তাকালো ছোটঠাউরের দিকে। ছোটঠাউরের নজর তখনো পিড়ার দিকে। ফিরে তাকাতেই পাঁচুর সঙ্গে চোখাচোখি। পাঁচু ঢোক গিলা করলেক। ভব হইচে কী? ছোটঠাউরের ভুরু জোড়া কেঁচার মতো খোঁচা হয়ে উঠেছে। চোখে সন্দেহ। গলা নামিয়ে বললো, 'শালা, কী কঁরেচু তু অ? ব্যাপার কী?'

'অই গ ছোট ঠাউবদা, বিশ্বকর্মার নাম লিয়া বুলচি, কিছু করি নাই।' পাঁচু হাত জোড় করলো, 'ই ঘরকে সেই ছাঁ বেলায় আইচি, যোগেনের বিয়াতে নিমন্তন্নও করে নাই। কতকাল বাদে ই পেথথম, মাকালীব দিব্যি করচি গ।'

ছোটঠাউবের চোখের সন্দেহ তবু কাটলো না, ভুরু যেমন তেমনি খোচা। একবার উঠান পেরিয়ে উঁচু পিড়ার দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'যোগেন ঘরকে থাকলে দুঃশাসনের বুক ফালা ফালা করো্যে রক্ত খেত্য। তু আজ ফিরে যেত্যে পারতিস নাই। আর বাঁজা ঠমকী মাগী আমাকে সাক্ষী রেখ্যে, ভাতারের শত্তুরকে পেসাদ খেত্যে ডাকা করচে? তু শালা বামনাকে জপ শিখা করাইচু র‍্যা?'

'অই গ ছোটঠাউরদা, জিতাষ্টমীর শিয়াল শুকনিতে খাবেক আমাকে, মিথ্যা বুলি নাই।' পাঁচু হাত জোড় করেই বললো।

দোতলা কোঠা ঘরের নিচেব পিড়া থেকে টুকির ডাক ভেসে এলো, ‘আসেন গ ঠাউরকত্তা, উয়াকে লিয়া আসেন।’

পাঁচু দেখলো বুক অবধি ঘোমটা ঢাকা এক বিধবা পিড়াতে দুটো আসন পেতে দিল দূরে দূরে। টুকি একটা আসনের সামনে ছোট একটি কাঁসার থালা আর জলেব গেলাস রাখলো। আঁকুড়ের বন ছাড়াও বর্গা, আঁশফল, আশেপাশে গোটাকয় তাল গাছ, একটা বড় জাম গাছের ছায়ায় উঠোনটি ঠাণ্ডা। ঘোমটা ঢাকা বিধবাটি ঢুকে গেল ঘরের ভিতর বাগে। টুকি পিড়ার ওপর দাঁড়িয়ে, বিজলানো সেই চোখের তারা পাঁচুর দিকে। অই, কাটরা মেমাইচে, বলির পশুর ডাক পড়েছে।

ছোটঠাউর তাকালো পাঁচুর দিকে, ‘চল, পেসাদ খেয়্যা লিবি।’ পিড়ার দিকে পা বাড়িয়ে বললো, ‘আমাকে আর দেরি করাইচ ক্যানে গ যোগেনের বউ। আমার যে আরো দু ঘরকে পূজা সারতে হবেক।’ বলতে বলতে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পিড়ায় উঠলো।

‘বসেন আঁজ্ঞা ঠাউরকত্তা, একটা কথা বুলতে ভুল্যে গেঁইচি।’ টুকি বললো ছোটঠাউরকে, কিন্তু উয়ার কালো চোখের বিজলানো নজর পাঁচুর দিকে, ‘বসেন গ আঁজ্ঞা লসকাদার, টুকুস পেসাদ স্যাবা করেন।’ বলেই দরজা দিয়ে ভিতর বাগে ঢুকে গেল।

পাঁচু দেখলো, কাঁসার থালায় দুটি মণ্ডা, একখানি ছোট সন্দেশ, এক টুকরো পাটি, একটি কলা। অই, পাটি বলো আর পাটালি গুড় বলো, বস্তু একই। ছোটঠাউর নিজের আসনে বসে বললো, ‘লে লে, বস, তাড়াতাড়ি খেয়্যা লে।’ গলা নামিয়ে বললো, ‘বানচত।’

ই কি রগড়, না জিগির? ইয়ার পরে ছোটঠাউর বাগে পেলে পিটাই না করে ছাড়বেক না। পাঁচুর প্রাণের লাচে এখন ঠেক লেগ্যে

গেঁইচে। হাত মুখ ধোয়া নেই, খেতে শুরু করে দিল। টুকি এল ঘরের বাইরে, হাতে একখানি লাল পাড় মিলের নতুন কোড়া শাড়ি। শাড়িটি ছোটঠাউরের সামনে রেখে বললো, 'বাউনঠানের লেগ্যে কিনা রেখ্যা করচিলম, রোজই দিয়া করবক ভাবি, আর ভুল্যে যাইগা। আর ই পাইসা বাবা ঠাউরকে দিবেন, যা মন চায়, কিনা করবেক।' বলে শাড়িখানির উপরে একটি চকচকে আধুলি রাখলো।

হঁ; এখন ছোটঠাউরের মেঘ ভিজা মুখে রোদ ঝলক দিচ্ছে, 'ইয়া, উ ত তুমি যিদিনকে খুশি দিয়া করলেই হত্য। ভালই হল্য, তোমাদিগের বাউনঠান খুশি হবেক। এখন ত শাড়ি পাওয়ার কথা নয় বটে।' বলতে বলতে শাড়িটি হাতে নিয়ে আধুলিটি ট্যাঁকে গুঁজলো। পাঁচুর দিকে একবার দেখলো।

পাঁচু মাথা নিচু করে থালা পরিষ্কার করার তালে। টুকি বুঝি মাথায় গন্ধ তেল মাখা করেচে? হঁ, বাসটি বড় মিঠা। টুকি বললো, 'বুঁইলেন গ ঠাউরকত্তা, আপনার ই ভিক্ষাভাইটির বড় অংখার।'

অই, আবার সেই বাখান। পাঁচু চোখ তুলে টুকির দিকে তাকালো। উপর বিজলানো কালো তারা ঠকঠকি মাকুর মতো চালাচালি হলো। আবার ঢাকে দগর, বুকে না রক্তে, পাঁচু বুঁইতে লারে। অই গ বীটের ঘরণী, কী লসকা বুনা কর তুমি, বুঁইতে লারছি গ। ছোটঠাউর বললো, 'অই, তাই বটে?'

'লয়?' টুকি বললো, 'ঘরের লোক রোজ এস্যে মাথা গরম করে বুলে, বোষ্টমপাড়ার লসকাদারের বড় অংখার।'

অই, ই কুন কথায়, কুন আনখা কথা, শুন। যোগেন এসে ঘরে বলে, পাঁচুর বড় অংখার। টুকি তাকে সেই কথা শোনায়? সেই কথা শোনাবার জন্য ডেকে পেসাদ খাওয়ায়? উয়ার লেগেই যেতে আসতে

রোপসীর ঠিনঠিন হাসি আর জিগির বাখান? আর গোটা বিষ্টুপুরের লোকে জানে, পাঁচুকে দেখলেই যোগেনের চোখে আংরা জ্বলে ছোটঠাউর কি কিছু জানে নাই? অথচ এখন হেসে হেসে বলছে, 'বটে বটে? ভেব্য না গ যোগেনের বউ, উয়ার অংখার আমি ধোলাই দিয়া ছাড়া করাবক।'

টুকি খিলখিল করে হেসে উঠলো। অই, হঁ, তাড়াতাড়ি বুকের আঁচলখানি সামলাও গ। ফলন্ত বেল গাছে বাতাস লাগে যে। গলায় কালনাগিনী সরু চিকণ হারখানি বের হয়্যা আসতে চায়। শাড়ি-খানি এত চিটা মাজা ক্যানে? টুকুস নবম সরম হলে গায়ে থাকে, নইলে নড়তে চড়তে খসে। হঁ, দেখ, আবার ঢাকের বোলে আরতি বাজনা বাজা হঁইচে। উ হাসিতে লাচের তাল আছে।

'না গ ঠাউরকত্তা, ধোলাই মলাই করবেন নাই।' টুকি উয়ার ছিপছিপে পিতিমে শরীরখানি বাঁকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকালো, 'আপনার ভিক্ষাভাইটিকে বুল্যে দ্যান, আমি ডাকা করলে য্যান ই ঘরকে আসে। ক্যানে? না, ই ঘরের লোকের সঙ্গে, বোষ্টমপাড়ার লসকাদারের বিবাদ মিটা করাবক আমি।'

যোগেনের সঙ্গে পাঁচুর বিবাদ ভঞ্জন? অভয় খান ওস্তাদকে নিয়ে তিন পুরুষের বিবাদ। পাঁচু সেই ওস্তাদের চ্যালা। উয়াদের বিবাদ মিটাবেক টুকি? ঘরকে ডেকে আনা করিয়ে? অই হে বিশ্বকর্মা, তোমার মতিগতি বুঝি না। আর ছোটঠাউরের বাখান শোন, 'হঁ হঁ, আসবেক আসবেক। আসবেক না ক্যানে? মানষে মানষে সুবাদ হবেক, উটি ত ভাল কথা। বুঁইলি র‍্যা পাঁচু, বউ ডাকলে আসবি।'

পাঁচু গেলাস তুলে ঢকঢক করে গলায় ঢাললো। ই দিনটার দিক বাগ হালহদিস কিছুই বুঁইতে লারছে। লসকা নজর কাড়ে ওস্তাদের।

যাগেনের বউ ঘরকে ডাকে। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায়, কিছু বোঝা যায় না। সে টুকির দিকে তাকায়। টুকির চোখও পাঁচুর দিকে, হুঁ, সাঁজবেলা হলেই ত বাউরিপাড়ায় দৌড় কর। দু দণ্ড ইখানকে এল্যে কি হাতের লসকা ফসকাই যাবেক ?

সাঁজবেলায় ইখানকে ? যোগেন বাঁটের ঘরকে, উয়ার বউয়ের কাছে ? পাঁচু চোখের মাকু একবার ফাবড়িয়ে নিল ছোটঠাউরের দিকে। ছোটঠাউবের নজর টুকির দিকে, চৌতারে আইটকে গেঁইচে। মন্তর জপছে কী ?

টুকি আবার বললো, 'তা'লে কথা দিয়া করলেক লসকাদার, বাউনকত্তার সামনে।'

'হুঁ'। একটি মাত্র শব্দ করে, পাঁচু উঠে দাঁড়ালো। অই, টুকির হাসি ক্যানে খিলখিলিয়ে বাজে না আর ? বিজলানো চোখে ক্যানে মেঘের দল নেমে আসে ?

ছোটঠাউরও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'হুঁ, আমার সামনে কথা দিয়া করলি র‍্যা পাঁচু। এখন তাড়াতাড়ি চল। আমার আরো দু ঘরকে পূজা সারতে হবেক।' বলেই সে পিড়া থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

ইদিকে পাঁচুর আর টুকির যেন ভব হয়েছে। ইয়ার দিকে উয়ার নজর, উয়ার দিকে ইয়ার। না না, আরতি না, পাঁচুর বুকে আবার যেন দগর বাজছে। ই দগর বলির দগর বটে। কেবল বুঝা যায় না, এখন কাটরা মেমায়, না ছাগল মেমায়। পাঁচুর গলার নলিতে চরকার পাক লাগলো, আওয়াজ বেরালেক না। উ এক লাফে নিচে নেমে, ছোটঠাউরের পিছন পিছন হাঁটা ধরলেক। দরজার কাছ থেকে আর একবার মুখ ফিরিয়ে পিড়ার দিকে তাকালো। অই, টুকি যেন অনড়

পিতিমে হয়ে গেঁইচে। ঠোঁটের হাসির লসকাটায় তেমন ঝলক নাই।
ই কিসের ডাক দিয়া করলেক গ তুমি ? তোমার হাসি মসকরা জিগির
বাখান বুঝি, রণরঙ্গিণী ঝগড়া বুঝি, ইয়ার কিছু বুঝি নাই। আমার
বুকের তাঁতে খাচান দড়ি, জালিপাটায় মেসিনে হালা করলেক। ই
কি বন্ধন গ ? পাঁচু মুখ ফিরিয়ে ছুটে বাইরে এলো। ইদিক উদিক
তাকিয়ে, বনের ভিতর পা চালালো। ছোটঠাউর কুথাকে গেল ?

'শালা, রোপসী বাঁজা মাগীর সঙ্গে নাঙিন করতে এযেচু তু ?'
পাঁচুর পাশ থেকেই ছোটঠাউর যেন বন ফুঁড়ে বেরালেক, ফরসা
মুখখানি রাগে রাঙা হয়্যে গেঁইচে। হাতের লাল পাড় মিলের শাড়িটি
দেখিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, 'আর উয়ার লেগ্যেই শালা
আমাকে এই ঘুষ ?'

পাঁচু আবার ছোটঠাউরের পায়ে হাত দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো,
'আমাকে মা মনসায় কাটবেক গ ছোটঠাউরদা—।'

'আই শালা, আমাকে ছুঁবি নাই।' ছোটঠাউর লাফ দিয়ে সরে
গেল, 'আমাকে এখনো দু ঘরকে পূজা সারতে হবেক। শালা আমাকে
অঁড়কঁক ভেব্যেচে মাগী, উয়ার ছিনালি আমি বুঝি নাই ? ই কথা
যোগেনের কানে গেল্যে, তোর কী গতি হবেক আর আমাকে কী
বুলবেক উ ?'

পাঁচুর এবার তাঁতীর গোঁ জাগলো, 'ইয়াতে তোমার আমার কী
হাত আছে, বুল ছোটঠাউরদা ? চুরি সাফাই ত কিছু করি নাই, নাই
না ? তোমাকে দিয়া ডাক করাইচে, পেসাদ খাইচি। যোগেন কিছু
বুলতে আসুক, জবাব আমি দিয়া করবক।'

'কিন্তু উ সব কথার অর্থ কী র‍্যা শালা। সাঁজবেলায় বাউরিপাড়ায়
ছুটা না কর্যে, উয়ার কাছকে যেত্যে বুলছে ?'

পাঁচু হাসলো, 'হুঁ, উ কথাটা আমি বুঁইতে লারছি গ ছোট-
াাউরদা।'

'শালা জুতা ছুব তোর মুখে।' ছোটবাউনঠাউর খেঁকিয়ে উঠলো,
উ কথাটিতে আঁতে বড় রঙ লেগেচে? আবার হাঁসচু? আমি শালা
যাগেনের বিয়ার আগে থেক্যা ই ঘরকে পূজা করচি, মাগীকে টুকুস
ছপাতে পারি নাই, আর তোকে বল্যে সাঁজবেলাতে উয়ার ঘরকে
যেত্যে হুঁ?'

পাঁচু মাতালের মত হেসে উঠলো, 'আমাকে শিয়াল শুকনি
ছিঁড়ে খাবেক গ ছোটঠাউরদা, কুন বউয়ের এ্যাত্ত বড় বুকের পাটা
দখি নাই।'

'উ সব কথা ছাড় হারামজাদা।' ছোট বাউনঠাউর আবার
খেঁকিয়ে উঠলো, 'সাঁজবেলাতে তু উ মাগীর কাছকে যাবি কি?'

পাঁচু হাসতে লাগলো, হাসতেই লাগলো। 'হুঁ, কিছু না খেয়েই
যেন মাতাল হয়্যে গেঁইচি গ।' ছোটঠাউর থক করে এক দলা থুথু
ছটাই দিলে পাঁচুর রবারের জুতার ওপর, 'শালা রা কাড়া করবি কি
াাই করবি?'

পাঁচু জুতোর দিকে দেখলো না, বললো, 'উ আমি বলত্যে লারছি
ছোটঠাউরদা। আজ দিনটা আমার কীরকম যেন মাইরি বুলছি।
ওস্তাদ আমার লতুন একখান লসকা পছন্দ করেচ্যে, আমি উতেই
মেত্যে রইচি। এখন আমি লাচা গানা করবক।' বলেই হাঁটা ধরলো।

ছোটঠাউরের কোঁচকানো ভুরুর নিচে চোখ জোড়ায় চিতার নজর,
অই শালা অদধপুতা, তু উদিক কুথাকে যাঁইচু? বাউরিপাড়া?'

পাঁচু ফিরে তাকালো না, জবাব দিল, 'এখন বিশ্বকর্মার ধ্যান
করবক ছোটঠাউরদা। আজ আমার মনের কিছু ঠিক ঠিকানা নাই গ।'

ছোটবাউনঠাউর দাঁতে দাঁত পিষে মাথা নাড়লো। একবার
তাকালো যোগেনের বাড়ির দিকে। দরজাটা আঁকুড় বনের আড়ালে
লাল পাড় নতুন মিলের শাড়িটা একবার দেখলো, তারপরে আবার
পাঁচুর দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'শালা, আমাকে অঁড়কঁব
বানাইচু? আমার নাম কুঞ্জা চকরোত্তি, তোদিগে মোওলা কে
খাবক।' বলে ডান দিকে ফিরে হাঁটলো।

হুঁ, অল্প জলে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়ার মতো, পাঁচু আর টুকিকে
ছোটঠাউর খাবেক।

পাঁচু আকুড় ঝোপের ভিতব দিয়ে হিঞ্চেগোড়ার পাশ ঘেঁষে
উঁচু জমি থেকে ডান দিকের কুলিতে নামলো। কুলির এক পাশে
খান কয়েক তাঁতী ঘর, উয়ার মধ্যেই দু-এক ঘর হল বাগদি।
খটখটি তাঁতের মাকু খটখটাচ্ছে। পাঁচু হিঞ্চেগোড়ার বাঁ বাগে
গেলে, বাউরিপাড়ার রাস্তায় যেতো। না, এখন সে কুলি পেরিয়ে দু
ধাপ সিঁড়ি ভাঙা করে পাকা রাস্তায় উঠে এলো। পুবে গেলে
বেলিতলা, পচিতে গেলে রেশম খাদি সেবা মণ্ডলের অফিস। উটি
সরকারি ভাড়া ঘর। আর আরও পচিতে গেলে, ঈশ্বরদাসের মস্ত
মোকাম আর গদীঘর। ব্যবসা কারবার বলো, মজুদ মালা বলো,
সব উখানকে। ঠায়ের পচিতে আর একখান দোতলা কোঠা বাড়ি
তুলা করেছে, উটি ঈশ্বরদাসের নিজের করা। উখানকে এখন ছাপা
শাড়ির কাজ হয়। উয়ার সঙ্গে রেশম খাদি সেবা মণ্ডলের কোন
সম্পর্ক নাই।

আসল মোকাম গদী চন্দরবাবুর আমলের। খাদি সেবা মণ্ডলের
কাজ যখন থেকে শুরু, উ মাডারি দেওড়াবাবুরাই সব কিছুর হালহদিস

চরে আসছে। গদী ঘরে বিরাট বিরাট আলমারিতে কেবল বিষ্টুপুরী রশম তসরের মাল নেই। তাবত দেশের মাল উয়াদের গদীতে। ্যাবসা কারবার যা কিছু উখান থেকেই। তবে হঁ, পাঁচুদের জন্যে মাসল কাজ খাদির সরকারি ভাড়া অফিস ঘরে। পাট রঙ পলু গুটি া লিবার উখান থেকেই লিতে হয়। লিবার সময় পয়সার কোন চারবার নাই। ওজনে আর গুনে মাল লিয়া কর, পাকা মালটি দিবার ময়, নিজের পাওনাটি গুনে লিয়ে যাওগা। কিন্তু হিসাবে গোলমাল হলে, পাওয়ানার বেলায়ও গোলমাল।

হঁ, এখন আর ঘরকে পলু কাটানি করার কোনো কাজ নেই। তবু ছোট বউ তসরের কাটানি করে। আর পাঁচু সেবা মণ্ডল থেকে কাঁচা পাট নিয়ে যায়। রেশমের লাচি যাকে বলে। এক কেজি কাঁচা পাটে, সাড়ে সাতশো গ্রাম পাকা মাল তোমাকে দিতে হবেক। তা, সাড়ে সাতশো গ্রাম পাকা মাল বলতে, প্রায় তোমার আড়াইখানি বালুচরী বুনা হবেক। হঁ, তিনশো গ্রামের বেশি একখানি বালুচরী হবেক নাই। হয় না এমন কথা কেউ বুলতে লারে। উ হলো নকশাদার আর বানিদারের কারকিত। পাঁচু নিজের হাতে ওস্তাদের নকশায় আড়াই শো গ্রাম ওজনের বালুচরী বুনা করেছে। আবার কানো কোনো বানিদারের হাতে পাঁচশো গ্রামেও থই মেলে না। উ কাজটি তোমাকে প্রথম থেকেই নজর রাখা করতে হবেক। ক্যানে? না, রেশম কাবাই করা সিজিয়ে নেওয়া পাখোয়ান করা পুর্ণিকাড়া থেকে তাশন, সব কাজ যদি ঠিক মতো হয়, তবে বুনাটি মনের মতো হবেক।

সেবা মণ্ডল তোমাকে দিবেক পাট আর রঙ। টাকার কোনো কথা নাই। এক কেজি কাঁচা পাট দামের হিসাবে তিনশো টাকা।

হিসাব কেতাব জানো ? খাতায়পত্তরে যখন লিখা হবেক, পাঁচু কীতের
নামে তিন কেজি কাঁচা রেশম, উয়ার পাশে দাম ধরা থাকবেক নশো
টাকা। টিপ ছাপ দিবেক, না দস্তখত মারবেক ? দস্তখত মারতে হলে
পেটে টুকুস বিদ্যা থাকা চাই। আর হিসাবটি যদি না করতে পারো
ওজন যদি না ধরতে পারো, তবে উখানকেই তোমার বাপের নাম হাল
হদিস গায়েব। লিখা হলো তিন কেজি, তুমি বুড়ো আঙুলে ছাপ
মারলে, কিন্তু ওজনে মাল পেলে আড়াই কেজি। উ কারণেই তুমি
অদধপুতা অঁড়কঁক, দেড়শো টাকা উখানেই তোমার বাঁশ হয়ে গেল
পাঁচশো গ্রাম বাজারে পাচার হয়ে গেল। কী করে গেল, কার হাত
দিয়ে গেল, এখন তুমি বুঝগা।

অই, ই ছাড়াও বিত্তান্ত আছে। তোমার নামে তিন কেজি পা
লিখা হলো, ওজনে পেলে সাড়ে তিন কেজি, পাঁচশো গ্রাম ফাউ লয়
বটে, উটি তুমি আমনার আমি আমনার বখরা করে লাও ক্যানে ? ই
ইয়ার জন্য কার সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি থাকবেক, উটি বুঝে লাও
উয়ার জন্য আলাদা লোকজন আছে। উয়াদের দেখলে চিনতে
পারবেক, কিন্তু কিছু বুলতে পারবেক নাই। উ তাঁতী ঘরের লোক
হতে পারে, বামুন ঘরের ছোঁড়া হতে পারে। উ সব কারবারের চাল
চলন আলাদা।

হুঁ, দেখ নাই কি তাঁতী ঘরের বিটা কোনোদিন পারডোবে প
ডুবিয়ে তাঁতে বসে না, ফারসা ফারসা জামা কাপড় পরে, হাতে ঘড়ি
বাঁধে, ইয়ার উয়ার সঙ্গে ফুটানির বাত মারে, ইয়াকে উয়াকে ফুটে
দেয়, চেলা মূলাটি সব সময় পেটে আছে, লয় তো চায়ের দোকানে
বসে লাটবেলাটি করছে, আর রিশকায় চেপে সিনিমা দেখতে যাইছে
আর লয় তো ছাখগা, সাঁজবেলার পরেই বালিধাবড়ার রাস্তা

অন্ধকারে, বা গোপালগঞ্জে বারোভাতারিদিগের ঘরকে ফুর্তি করছে, চোরাই মালের কারবার উয়ারা করে। ইটি হলো একরকমের। আবার ছ্যাখগা বাউন ঘরের মানুষটি পূজাপাট করে, ধমমে কমমে বড় মতি। ইয়াকে পায়ের ধূলা দেয়, উয়াকে স্বস্তি বাখান শুনায়, উদিকে সেবা মণ্ডলের কেজি কেজি মাল উয়ার হাত দিয়েই পাচার হয়ে যাইচে। কে দিচ্ছে, কী করে হচ্ছে, উটি তুমি অদধপুতা বুঝতে লারবেঁক। খালি অঁড়কঁকের মতো তাকা করে দেখবে, উয়াদের কোঠা ঘব উঠছে, জমিজমা বাড়ছে, বিটা বিটিদিগের রমরমা বিয়া হচ্ছে। আর যিয়ারা তোমাকে ভজিয়ে ভোট কাড়াচ্ছে, বুলা করচে তোমাকে রাজা করে দিবেক, উয়াদিগের সঙ্গে ইয়াদের বড় আঁতের মাখামাখি। পলু থেকে সুতা বের করা, আর তার যাবত কাজ করে তাঁতে চাপিয়ে বুনা করার মতো উয়াদেরও সব ঠিকঠাক করা আছে। উয়ারা গরীবের মা বাপ। তুমি ছাড়লেও উয়ারা তোমাকে ছাড়বেক নাই। ক্যানে? না, গরীবের ভাল করতে লাগবে নাই? উয়াদের এত চিকনচাকন চালচলন, গাড়ি বাড়ি লিয়ে কাজকারবার, সব তোমাদের জন্য।

হুঁ, গোড়ায় গোড়ায় পাঁচুও ঠকেছে। হিসাবে মিল করাতে পারে নাই। ইয়ার জন্যে খুশি হবার দরকার নেই। লজরটি ঠিক রাখো। ওজনটি দেখে লাও। খাতাপত্তরের লেখাটি বুঁইতে শিখা কর। না, পাঁচু তো আর মাস্টেরের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখে নাই। কিন্তু এখন লসকাদারের মতোই নিজের নামটা দস্তখত করতে পারে। ওজনের জায়গায় ঠিক ঠিক হিসাবটি পড়তে পারে। হাতে কলমে, ঠেকে শিখা করেছে। আছাড় পিছাড় না খেলে, চলতে শিখা যায় না। চুরিচামারিতে দরকার নাই। কাঁচা মালটি দিয়া কর, পাকা মালটি বুঝে লাও। বালুচরী যদি হয়, শাড়ি পিছু তিনশো টাকা মজুরি।

তবে ইয়া, পাট দিলাম রঙ দিলাম তারপরে মাল যদি আদায় না হয়? উয়ার লেগে টিপ ছাপ দস্তখত তো আছেই। তোমার তাঁত মেসিন সুদ্ধা উঠা করে লিয়া যাবেক। তা বাদে, কেজি পিছু তোমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে কেটে রাখা হবে। উটি সারা জীবনের কারবার। জীবনে যতো কেজি পাট লিয়া করেচ, ততো দফায় পাঁচ টাকা জমা। ক্যানে? না খাতায়পত্তরে উ টাকা জমা পড়বেক তোমার তাঁতী কল্যাণ সংস্থায়। তোমার যখন অভাব হবে, ছাঁয়েদের মামাভাত খাওয়াবে, বিটাবিটির বিয়ার খরচা লাগবেক, তখন তাঁতী কল্যাণ সংস্থা তোমাকে উ টাকার থেকে সাহায্য দিয়া করবেক।

অই অই, আহা, এত পাছুড়া দিয়া পড়লে কী হবেক? সাহায্য কোনোদিন পাও নাই? কী করে পাবেক? তোমার সুতার হিসাবে যে সব সময়েই গোলমাল হয়ে যায়? কী করে? উ তুমি বুঝবে নাই। খাতাপত্তরের হিসাব লিখাগুলান বড় ঘুগি। উয়ারা আমনার আমনার মনে, ই ঘর উ ঘর কবে বদল হয়ে যায়। তুমি ওসবের কী বুঝবেক হে? তুমি অদধপুতা যাও, পারডোবে পা ডুবিয়ে পাষাণলড়িতে পা রেখে বস গা। রেশম খাদি সেবা মণ্ডল তোমার সেবা করছে, তুমি উয়ার সেবা করছো নাই। উয়ারা তোমাকে সুতা রঙ দাদন দিয়া করছে। তাঁত, জেকার্ড যাবতীয় কাজ-খরচ তোমার। পাকা মালটি দিবেক। বাজার উয়াদের হাতে। হুঁ, কলকাতা দিল্লি বোমবাই, উ সব জায়গায় মাল চালাচালি তোমার কমম না। উটি বুঝে, তোমার কমম তুমি কর, উয়াদের কমম উয়ারা করবেক।

হুঁ, তুমি সেবা মণ্ডলের পাট রঙ না নিতে পাবো। বাজারে মড়ার গ্রামের পাট কিনতে পারো। আমনার কাজ আমনি করতে পারো। মড়ার গ্রামের রেশমটি দামেও শস্তা পাবে। দুশো টাকা কেজি।

কিন্তু সেবা মণ্ডলের মাল থেকে মড়ার গ্রামের মালটি নিকষ। লো নিকৃষ্ট। তুমি যদি লসকাদারের মতো লসকাদার হও বুনাটির ্যাপারে মন খুঁতখুঁতানি বানিদার হও, তবে উ নিকষ মালটি তুমি কনা করবেক নাই। সেই ঈশ্বরদাসবাবুর কাছকেই তোমাকে যেত্যে াগবেক। কেবল মালটি নিকষ বলে নয়, বাজারটি কোথায়? শ্বরদাসবাবু যে সারা বছর হিল্লি দিল্লি ঘুরাফিরা করবেন, উটি তো তামার জন্যই। তোমার মাল বিকোতে হবেক নাই?

হুঁ হুঁ, খরচ সবই তোমার। রঙ কিনা করা থেকে কাচাই নিজাই ধালাই সব খরচ তো সেবা মণ্ডলেরও আছে। উটি চালনা করে াড়ারিবাবুর গদী। উয়ার খরচ আয়ের হিসাব তুমি দেখবার কেউ া। তবে ই একটা কথা, সেবা মণ্ডলের যত গুলান দপ্তর আছে, সব-গুলানেই ঈশ্বরদাসের বউ বিটা বিটি বিটার বউ, কর্মচারি হয়ে বসে মাছে। উয়ারাও বেতন পায়। তোমার কী গুণ আছে, উ সব কাজ তুমি বুঝ সুঝ করবেক, বেতন লিবেক? রেশম খাদি সেবা মণ্ডলের ্ল ঘর রয়েচে বোমবাইতে। উখান থেকেই সব কাজ কারবার চলে। মার ডালপালা দপ্তরের কথা যদি বলো, তাও নানা জায়গায় আছে। কিন্তু উসব তোমার দেখবার লয়। যা বুঝাই দিয়া করচি, উটি বুঝে নাও, আমনার আমনার কাজ করগা।

ধরগা ক্যানে, ওস্তাদের একখানি লসকার দাম হাজার টাকা দিয়ে কিনা কবলেক। ওস্তাদ জালিপাটায় লসকা তোলা থেকে খাচান াড়ি, ছুঁচ মৌরি পাড়ের ডাং মেসিনে সব জোড় করে দিলেক। উ লসকাতে আমি ছ খান শাড়ি বুনা করাব, কি ছশো, কি ছ হাজার, উটি তোমার দেখবার লয়। উটির মালিকানা আর তোমায় লয়। উটি সেবা মণ্ডলের গদীতে উঠবেক। তুমি হেজ্যো পচ্যো মরগা, উ

লসকার বুনায় আর তোমার এক পয়সা দাবি নাই।

হঁ, লসকাদার হও আর বানিদার হও, তুমি জন্ম লিয়া করেচ অধ-
পুতা হয়ে। ই বারে ভাব ক্যানে রেশম গুটি আর তসর গুটির পোকা-
গুলানের কথা। উয়ারা আপন গুটিতে আপনাকে বন্ধন করে, গুটি-
গায়ে সুতা গড়ে। কিন্তু গুটির বাইরে আসতে পারে নাই। উটি
উয়ার জীবন, উটি উয়ার বন্ধন, উয়ার ভিতরেই মরণ। আর একবার
যদি গুটি কেটে সে বেরিয়ে আসতে পারে তবে তোমার গুটির সুতাও
ছিঁড়া ছিবড়া হয়্যা যাবেক। গরম জলে ডুবিয়েও উয়ার খি ধরতে
লারবেক। উটি তখন জট পাকানো খেটার ড্যালা ছাড়া আর কিছু
না। উ উয়ার জীবন দিয়ে গুটি জুড়ে সুতা বানাবেক। গুটির মধ্যে উ
থাকতে থাকতে, গরম জলে উয়াকে গুটি সুদ্ধ সিদ্ধ করতে লাগবেক
তারপরে হাত দিয়ে টান দাও খি পাবেক। সুতোর ধরতাই। ইবারে
খুলা করতে থাকো, ফাঁদালিতে জড়াও, লাটাইয়ে প্যাচাও। রেশমের
ঝুঁট থেকে মটকা বের কর। তসরের ঝুঁট থেকে লাথা—কোন কিছু
ফ্যালা যাবেক নাই। নেহাত রেশম পোকাটি বাউরি হাঁড়ি ডোমরা
খায় না। খেল্যে উটিও তোমার হাতে কিছু তুলা দিয়া করতো
তসরের পোকা লাড়োটির তো কথাই নাই।

ইবারে বুঝ হে, সংসারের ধর্ম কর্ম গতি বাগ কেমন কোনদিকে
তুমিও এক গুটির মধ্যে আপনাকে বন্ধন করেচ। উটি পাঁচুর বাপ
জগত কীতের গীত বটে :

ঘর বাঁধা করচি আমি
তুঁত গাছে আর শাল গাছে।
উ-ঘরের ভিতরে মরণ আমার
দ্যাখ ক্যানে, তালাই বেঁন্ধে লিয়া যাঁইচে।

হঁ, পলু ঘর বাঁধে তুঁতে গাছে, তসর গুটি শাল গাছে। ঘরের বন্ধন মানেই মরণ। তখন খেজুর পাতা বুনা তালাইয়ে বেঁধে তোমাকে লিয়া যাবেক শ্মশানে। অর্ধপুতাও আপনাকে বন্ধন করেচে লসকায় আর তাঁতে। উতেই তোমার জীবন, উতেই মরণ। অই, উয়াকেই বুলে, যে কাঁটায় মাপ সেই কাঁটায় শোধ। এখন বল কুথাকে যাবেক হে? তুমি গুটিতে আছো, সুতা বোনা করে যাও।

না, পাঁচু কুথাকেও যাবেক নাই। সে এলো সেবা মণ্ডলের অফিসে। লসকাটি লিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিল তখন পকেটে পয়সা আছে কী না দেখেনি। এখন দেখছে, পকেটে বিড়ি আর ফ্যাঁচকলটি ছাড়া কিছু নেই। ঘরকে গেলে ছোট বউয়ের কাছে হাত পাতলে দু-একটা টাকা পাওয়া যেতে পারে। তবে উ বড় কঠিন ঠাঁই। ক্যানে, এখন তোমার টাকার দরকারটা কী?

অই র‍্যা শালা মাগীর মুখখান মনে পড়লে হাসিও পায়, আবার বুকে মাকুও ফাবড়ায়। উ মাকু ফাবড়ানোটা চোরের। যদি বলো বাজার করবে তা হলে তোমার চোখের দিকে দেখেই বুঝে লিবেক, লসকাদার তুমি ঘুগিগিরি করচ। বাজার করতে যাওয়ার রকম সকম আলাদা। ভেব না, ছোট বউয়ের লসকা নলি মাকু টানা চোখের মীনায় কেবল হাসি বিজলায়। হঁ, উ তোমাকে পেটে ধরে নাই বটে কিন্তু তোমার ভিতর বাগের সব কিছু উয়ার নখদর্পণে। তুমি কখন কোন বাগে চলো, কী মতলবে থাকো সব উয়ার চোখের মীনা তারায় ধরা আছে।

হঁ, উ সব বুঝেই পাঁচু সেবা মণ্ডলের অফিসে এসেছে। সে কারোকে বুঝাতে লারবেক আজকের এই সকালখানি বিশ্বকর্মার

দান। 'হঁ র‍্যা পাঁচু, লসকাখানি বড় সোন্দর আঁকা কবেচু র‍্যা।
ইয়ার পরে জগত কীতের বিট পাঁচু এখন ঘরকে যাবেক? উদিকে
লসকার দান, ইদিকে আঁকুড়া বাঁট ঘরণীর ডাক। না, দুটো দুরকমেব
লসকা, পাঁচু মিলাতে পারচে নাই। কিন্তু ছ্যাখ ক্যানে, রক্তে লাচ
ধর‍্যা গেঁইচে।

অফিস ঘরে টেবুলের সামনে চ্যারে বস্যে রইচে কাতিকবাবু।
কাঁচা পাকা মালেব হিসাব ওজন, টাকা পয়সা সব ইয়ার হাত
দিয়ে। ভিতর বাগের ঘরে দুজন লোক পাট মাপা কবচে। কাতিক-
বাবু পাঁচুর দিকে তাকালো, 'কী হে পাঁচু, চখ মুখ ভারি টসটস করচে
য্যে? কুথাক থেক্যা ঘুবে এল্যে?'

ই ছ্যাখ মুখের কথা খসাবার আগেই, কাতিকবাবুর সন্দেহ।
টসটস করা মানেই বুলা হঁইচে, পাঁচু চেলা মূলা গিলা করে আইচে।
সে একেবারে কাতিকবাবুর কাছখানকে গিয়ে বললো, 'কী যে বলেন
আঁজ্ঞা, সাত সকালে চখ মুখ টসটসাবে কি গ বাবু?'

হুঁ, কাতিকবাবুব নাকের ফাঁদ মোটা হলো, পাঁচুর চোখের দিকে
দেখলো, 'না, যা ভাবচিলম তা লয় বটে। তা বাবা তোমার মুখখানি
যেন কাবাই চমক দিয়া করচে।'

'কী জানি আঁজ্ঞা।' পাঁচু নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করলো,
'ওস্তাদের ঘরকে গেঁইচিলম, উখান থেক্যা আঁইচি। মাধবগঞ্জেব
হাটকে যেইয়ে, পকেটে হাত ঢুকাই দেখি, পয়সা লিয়া বেরাই নাই।
ঘাট নাওয়া সারা কর‍্যা ওস্তাদের ঘর ঘুর‍্যে বাজার কর‍্যে লিয়া যাব
ভেবেছিলাম। ছ্যাখেন ও কী আনখা ভুল আঁজ্ঞা। এখন পাঁচটা টাকা
দিয়া করেন, কিনা কাটা কর‍্যে ঘরকে যাইগা।'

কাতিকবাবুর কালো মুখখানি, তেল মাটি মাখামাখি তালাইয়ের

়তো হয়ে গেল, 'ই তুমাদিগের কী কাণ্ড বুল ত, অঁ? সকালে ঘর ্ল্যে বসত্যে না বসত্যে টাকার লেগ্যে হাত পেত্যে এস্যে দাঁড়াবেক। ইঁথাকে কি টাকা বুনা করা হঁইচে হে?'

পাঁচু খসর খসর মাথা চুলকে হাসলো। আসলে কেঁমড়াইচে ত ্কের মধ্যে। অই, চুলকানি কেঁমড়ানি একই কথা। বললো, 'বিপদে াড়্যে গেঁইচি আঁজ্ঞা। আপনি ত আমাদিগের আসল কত্তা। আপনি া দেখঁলে, কে দেখবেক আঁজ্ঞা। খাতা পত্তরে না লিখেন ত নাই লখা করলেন, উ বেলা শোধ দিয়া করবক।'

কাত্তিকবাবু তখন সিন্দুকের চাবি ঘুরিয়ে পাল্লা খুলেছে, 'হঁ, শোধ া করবে, উ আমার জানা। লাও, খাতায় সই মার, পাঁচ টাকা ়খা কর।' বলে সিন্দুকের ভিতর থেকে গুনে গুনে পাঁচটি এক কার নোট টেবুলে রাখা করলেক।

জয় হে বিশ্বকর্মা! পাঁচু টেবুলের এক পাশে রাখা ছোট খাতাখানি ়নে নিল। উটিই খুচরা হিসাবের খাতা। পাঁচু একা না, আরও ়নেকেই এরকম খুচরার জন্য হাত পাতে। তবে হঁ, হাত পাতা রতে হলে, সেবা মণ্ডলের কাজ থাকা চাই তোমার ঘরে। পাওয়ানা ়ছু থাকা চাই। নইলে খালি হাতে ধার কর্জ্য ইখানকে জুটবেক াই। আর কল্যাণ সংস্থার টাকা? উ কি তোমার ডাক ঘরে রাখা ়কা, চাইলেই পাবে? সব কিছুরই নিয়মকানুন আছে। তা এখন াচুর ঘরে সেবা মণ্ডলের বড় কাজ আছে।

পাঁচু জিভে আঙুল ঠেকিয়ে খাতার পাতা খুলা করলো। াস্টেরের কাছে লিখাপড়া শিখে নাই বটে, তবে চিহ্ন মের‍্যে টাকা াখে, দস্তখতটি করতে শিখেছে। এই খুচরা খাতার হিসাব পরে বড় াকা খাতায় উঠবে। যা কিছু কাটাকাটি উখান থেকেই হবে।

ছোট খাতায় হিসাবটা লেখা থাকে। তবে হুঁ, নাম সই করো তারি
বসাও। যে তাঁতী নিজে লিখতে জানে না, উয়ারটা কার্তিকবাবু নিজে
লিখে দেয়। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় ফটনপেনের লিবটি
লেবড়ে দিয়ে ছাপ তুলা করে লিবেক। পাঁচু হাত বাড়িয়ে বললে,
'দেন আজ্ঞা, আপনার কলমখানি দিয়া করেন।'

কার্তিকবাবুর টেবলের ওপরেই কলম ছিল। হাত দিয়ে সেটি
সরিয়ে দিলেন। পাঁচু নিজের নাম লিখলো। হুঁ, লোটোর হাতে
লেখাও ইয়ার থেকে ছোট। পাঁচুর প্রতিটি অক্ষরই এক একখানি
বুটি লসকার সমান। নাম লিখলো, পঁচানন কিত—পাঁচ টাকা।
তারপরে আবার একখানি দস্তখত, উ লসকার মতোই। টাকার চিহ্ন
খানি টানা করালেক একখানি লম্বা কাস্তের মতো। নিচে তারিখ।
কার্তিকবাবু সবই দেখলো। পাঁচু খাতা কলম রেখে দিয়ে টাকা পাঁচটা
নিল। হুঁ, এখন আবার ঘাম দিচ্ছে। বুকে এখন দগর দাগর নাই
বাজছে খালি লসকা লসকা।...

'তা হলে এখন যাই আঁজ্ঞা, বাজারটা লিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরকে
যেত্যে হবেক।' বলে দরজার বাইরে পা বাড়ালো।

কার্তিকবাবু কোনো জবাব দিল না। দিবে নাই, পাঁচু জানে
উয়ার তো তেল মাটি তালাই মুখখানার ভাব, যেন নিজের ট্যাঁক
খসা করে মাগুনি দিচ্ছে। তবু পাঁচু বাইরে এসে পুব বাগে কয়েক প
এগিয়ে একবার ফিরে তাকালো। বড় ঘুগি লোক কার্তিকবাবুটি
প্রাণ ধরে কারুকে বিশ্বাস করে নাই। হুঁ, পাঁচুও বিশ্বাসের কা
করলো না বটে। উ তোমরা যাই বুলা করগা, বিশ্বাসের কথা এখ
পাঁচু ভাবচে না। আরো খানিক পুব বাগে গিয়ে আঁকুড় বন থেকে
যে-কুলি দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছিল, সেই কুলি দিয়েই নেমে গেল

কার্তিকবাবু দেখলেও ভাববেক, পাঁচু মাধবগঞ্জের হাটেই যাচ্ছে। ক্যানে? না, এই কুলি দিয়ে বৈদ্যপাড়ার রাস্তায় মাধবগঞ্জের বাজারে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। উয়াকে বুলে সটকাট মারা।

অই, আসলে পাঁচু আঁকুড় বনে ঢুকে এগিয়ে গেল হিঞ্চেগোড়ার দিকে। হিঞ্চেগোড়ার উঁচুতে দাঁড়িয়ে একবার যোগেনের বাড়ির দিকে তাকালো। না, দরজা দেখা যায় না, মাথার উপরে দোতলা কোঠা ঘরের ছাঁদ দেখা যায়। হুঁ, ই কি করলেক গ টুকি। আমার লসকা করল্যে ওস্তাদের লজর কাড়া। আর যোগেন বাঁটের বউ তুমি, ঘরকে ডক্যে পিড়ায় বসা কর‍্যে, পেসাদ খাওয়ালে? বুঁইতে লারছি। কিছু বুঁইতে লারছি গ। আজ সকালের মতিগতি কিছু জানি না। কিন্তু হঁয়া, হুঁ, জানি লসকা লসকা। লসকা এখন আমার প্রাণে লাচ করচে।

পাঁচু লাফিয়ে লাফিয়ে হিঞ্চেগোড়া ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে আচি বাগে ছুটলো। হিঞ্চেগোড়ার পরে খানিক ঝোপঝাড় পেরোলেই কয়েক ঘর বাগদি। তারপরে আবার একটা পচা গোড়া। ময়লা সবুজ জল, দুর্গন্ধ বেরাইচে। পাঁচু দু-তিন লাফে পচা গোড়াটা পেরিয়ে বাউরিপাড়ার মধ্যিখানে। বাউরিপাড়ারও ইদিকে উদিকে অনেকগুলান গোড়া, আশেপাশে কারো বা মাটির ঘর, কারো বা ছ্যাঁচাবেড়া। সব ঘরের মাথায় খড়ের চাল। কিন্তু দেখ একটা ঘরও যেন আস্ত নেই। দেয়ালের মাটি খসে পড়ছে, বেড়া ফাঁক হয়ে গেইচে, মাথার খড় হথাকে হোথাকে ফাঁকা, হয় তো বেড়া গাছের ঝাড় দিয়ে ঢেকে রখেছে।

হুঁ, এ সময়ে বাউরিপাড়া টুকুস চুপচাপ। বউ বিটিরা ইদিক উদিক ঘরকন্নার কাজ করছে, কেউ ছাঁ কোলে লিয়ে গাছতলায় বসে রঁইচে,

আর তা লয় তো অই শুন ক্যানে কুনদিকে যেন কয়েকটা মাগী ই উয়াকে গলা ফাটিয়ে গালি বকছে। সে তুমি বাউরিপাড়ায় যখনই আসবে বউবিটিদের ঝগড়া বিবাদ বাখান শুনতে পাবে। তেল সিঁদুর দুধ কলা, যা-ই দিয়া কর উয়াদের থামাতে পারবেক নাই। ক্যানে? না, দেখ যেঁইয়ে চেলামূলাও গিলে রয়েছে। আর যদি তুমি অঁড়কঁক না হও, তাহলে কখনো জানতে যাবেক নাই, কী বিত্তান্ত, কী লিয়ে উয়াদের, ভাতারখাগী বিটামাগুনি গালাগালি ঝগড়া লেগেছে। কাব ছাঁ হয়তো কাব ঘরের সামনে হেগ্যেচে, কাব ভাতার কবে চেলা-মূলা গিলে, কাব নামে কী বুলা করছিল, উ লিয়েই আনতাবাড়ি ঝগড়া লেগে গেইচে।

হুঁ, তবে ই বাউরিপাড়াটি হল গা তোমার সগ্‌গ। উ শহরের দোকানপাটেব কথা ছাড়। বাউবিপাড়ার চেলা-মূলার স্বাদ আলাদা। ঘরে ঘরে চোলাই হয়। সাঁজবেলা থেকে আসর জমজমাট। দিনের বেলাও একেবাবে ফাঁকা যায় না। তুমি ঘরকে যাও, চেলা-মূলাব বোতল পাবেক নাই। চারদিকে তাকা কর। কুথাকেও নাই। আশ-পাশের গোড়াগুলানে নেমে, জলের মধ্যে হাত ঢুকাও। ছিপি আঁটা বোতল উঠ্যে আসবেক পাঁকের ভিতর থেক্যা। হুঁ, ইদিক উদিক দেখে নজর করতে লারছ। দ্যাখগা, উই উখানকার ল্যাপামোছা মাটির তলায় ছিপি আঁটা বোতল। রাতের বেলা দেখবে, নিমগাছ বা আঁশফল গাছের পাতা ছাওয়া ডালে বোতল বাঁধা ঝুলছে ক্যানে? না, আকাশের কুন বাগে মেঘ নাই, আনখা দেখ বিষ্টি নাম করলো। আবগারি দারোগা পুলিশ এক-একদিন হই হই করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্যাখন যে যেদিকে পারে দৌড়। বাউরিরা আর কোথাকে যাবে? উয়ারা তো আর তোমাকে ঘরকে ডেকে বসিয়ে

খাওয়াবে না। কড়ি গুনে দাও, বোতলটি লাও, ইদিক উদিক বসে খাও। তুমি আম্নার, আমি আমনার। পুলিশ ত্যাখন খাওনদারদের পাকড়াই করে। বাউরিদেরও ছাড়ে না। উয়াদের ঘরের ভিতর বাগে, জিনিসপত্তর ওলটপালট করে বোতল খোঁজে। তবে হুঁ, ইয়া, একটা বিত্তান্ত কী, উরকমটি বারো মাসে তেরো পাবনের মতো লেগে আছে। ঝড়ঝাপটা সগ্‌লার উপর দিয়েই যায়। তা সে বানিদার হোক, আর খাওয়ানদার হোক।

অই, তবে বাউরিপাড়ায় যাঁইচ, উটি জানাজানি কর নাই। ক্যানে? না, বাউরিপাড়ায় যে-যায়, সে-ই মাতাল। মাতাল তো কী? পাঁচু আপন মনে হেসে উঠলো। আজ মাতাল হবার দিন বটেক। সে ই ঘর উ ঘরের আশপাশ দিয়ে, পচিবাগে, টুকুস গাছ-পালার আড়ালে, একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ডাকবার দরকার হলো না, ঘরের সামনেই কাঠের উনোন জ্বলছে, উয়ার উপরে হাঁড়ির মুখ ঢাকা। গোগা বাউরির বউ সুবলি সামনে বসে কঁচড়ার ছাল ছাড়াইচে। কঁচড়া বলো, আর মহুয়ার বীজ বলো, এক বস্তু। উটির ছাল ছিলিয়ে লিয়ে, ভেজে খেলে ব্যাতে রোচে। টুকুস গুড়া লাগে, যাকে বুল্যে মিঠা। উয়ার যে তেলটি বেরায়, উটি মাখা কবলে, গায়ের দরদ মরে।

হুঁ, পাঁচুকে আন্‌খা দেখে সুবলি তাড়াতাড়ি খোলা বুকে কাপড় চাপা দিল, 'পাঁচুদাদা যে? এখন আঁইচু?'

'হুঁ। গোগা কোথাকে গেঁইচে?' পাঁচু জিজ্ঞেস করলো। সুবলির হাতের বানাই চেলা পাঁচুর ভাল লাগে। সে সুবলিকে গায়ের কাপড়ে চোপড়ে সাব্যস্ত হবার জন্যে অন্য দিকে চোখ ফেরালো।

সুবলি বললো, 'উ ত সেই আন্ধার থাকতে বেরাই গেঁইচে গ

দাদা। যশোদার পাকা সাঁকোর উদিক্‌কে রাস্তায় কী কাজ হঁইচে
সেখানকে গেঁইচে।'

'কাজে কামে গোগার তালে মতি হঁইচে বল।' পাঁচু হাসলো
'হঁ, সকালেই এলাম। কিছু নাই, নাই কি?'

সুবলি হাসলো। দাঁতে তামুকের দাগ। উ লিশাটি ছোট বড়
সগ্‌গলার আছে। বয়স বাইশ চব্বিশ হবে। কালোর উপবে মুখে
চোখে পাঁচপাচি না, টুকুস নজর কাড়ানি চটক আছে। গতরটি
আঁটসাঁট। মাথার কালো চুল যেন দলা পাকানো কালো কেউটের
মতো কোঁকড়ানো। বললো, 'কুনদিন তোমাকে ফিবাইচি কি? দুদিন
সাঁজে দেখি নাই ক্যানে?'

'একটা কাজ করচিলম।' পাঁচু পকেট থেকে বিড়ি আর ফ্যাচকল
বের করলো।

সুবলি হাতের সামনে রাখা ঘটি একহাতে উপুড় কবে উনোনের
ধারেই জল ঢালা করে, দু হাতে দিয়ে নিল, 'বানির কাজ হঁইচে
বুঝি?'

'না, লসকা।' পাঁচু বিড়ি দাঁতে কামড়ে ধরলো, 'লসকার কাজ
রাতবিরাতে হয় নাই বটে, কিন্তু কাজটা ছাড়া করতে পারচিলম না।
মনটো কাজেই জোড়া ছিল, ইদিকে আসি নাই, কিছু গিলাকুটাও
কবি নাই।'

সুবলি হাসতে হাসতে বললো, 'ই ত ভাল কথা গ পাঁচুদাদা।
ই সব না গিলে, কাজে কামে মন থাকা করলে, শরীর খবচ দুই বাঁচা
হয়।'

'হঁ, উ তুদিগের সগগলার এক কথা বটে।' পাঁচু বললো, 'ঘরকে
বউও উ কথাই বুলা করে। উটি ত হবার লয় র‍্যা ভাই।'

সুবলি হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর বাগে ঢুকে গেল। হুঁ, ছ্যাখ,
টি নিজের হাতে চেলা মূলা বানাই করে, মালপত্তর গোগাই আনা
য়া করে, রোজগারও কিছু কম না। দিনকের হাফ খোরাকি তো
টে যায়। তবু, যে-ঘরকেই যাবে, বউ বিটিদের এক কথা। মদে
ারোর হুঁ নাই। কিন্তু সুবলি ঘরের ভিতর বাগে গেল কেন? বোতল
ঘরকেই রাখা আছে? হুঁ, একখানি ছিপি আঁটা বোতল নিয়েই
বলি বেরিয়ে এলো। খড়ের নিচু চালের কাছে মাথা নুইয়ে আশে-
াশে দেখলো, তারপর এগিয়ে এসে বোতলটি পাঁচুর দিকে বাড়িয়ে
ল। পাঁচু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চোখে ঝিলিক দিয়ে বোতলটি
খলো। পকেট থেকে একটি টাকার নোট বের করে সুবলির হাতে
ল, 'তোর ছাঁ বাচ্চা শাউড়ি সব কোথাকে গেল?'

সুবলি টাকাটি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললো, 'ইদিক উদিকেই
াথাও গেঁইচে। গেলাস দিবক কি?'

'না, উসবের দরকার নাই।' পাঁচু ছিপিটা খুলে নাকের ছ্যাদা বড়
রে বোতলের মুখে রাখলো, 'হুঁ, দবিটি বেশ ভাজা ভাজা, বাসটি
ান্দর। তা ঘরকে রেখ্যা দিয়া করেচু যে?'

সুবলি বললো, 'ই সময়ে আর কুন যমেরা আসবেক? উয়ারা ত
াতের লোক। তার আগেই সব হয়্যা যাবেক। অই, উঠ্যে কোথাকে
াইচ?'

'যাই, উদিকে গাছতলায় গা বসি।' পাঁচু উঠে দাঁড়িয়ে বললো।

সুবলির বুকের আঁচলে ফুরফুরা পটি বাতাসে কাঁপন লাগছে। উ
াচলটি টানা করে হেসে বললো, 'ক্যানে, এই ধারেই বস। ই সময়ে
আসবেক, কে দেখবেক? গটা পাড়া তোমাকে চিনে!'

'হুঁ, ই ঠিক কথা।' পাঁচু আবার উটকো হয়ে বসতে গেল।

সুবলি বললো, 'দাঁড়াও গ দাদা, একটা কিছু বসতে দিয়া কবি।
বলে নিচু পিড়ার এক পাশ থেকে এক খণ্ড বস্তা ধুলা ঝেড়ে পাঁচু
সামনে পেতে দিল।

'জয় বাবা বিশ্বকর্মা।' পাঁচু বোতল তুলে ঢক ঢক করে গলা
ঢাললো, চটের ওপর থেবড়ে বসলো, 'লসকা লসকা। জয় ওস্তাদে
বলেই আবার ঢক ঢক করে গলায় ঢাললো। মুখটা একবার বিকৃ
করে, মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেললো, 'হঁ, মালটা বড় ভাল কঁরেচু গ সুবলি
ইরম ভাজা মাল হল্যে আমার ভাল লাগে।'

ভাজা হলো ঝাঁজালো। অথবা বলো, তেজী। সুবলি আবা
নিজের জায়গায় গিয়ে বসে হাতে কঁচড়া তুলে নিয়ে হাসলো, উয়া
কালো চোখে জিজ্ঞাসা। 'লসকা লসকা করচ ক্যানে গ দাদা? দু
দিনকের লসকার ঘোর এখনতক কাটে নাই, নাই কি?'

'অই অই, ঠিক বলেচু গ সুবলি, ঠিক বলেচু।' পাঁচু বললো, 'লসক
একবার লেগ্যে গেল্যে উয়ার ঘোর কাটতে চায় নাই।'

আবার বোতল উপর ঢালা করে ঢক ঢক গিললো, 'বুঁয়েচু গ
সুবলি, লসকায় বাঁচি লসকায় মরি। হঁ, তোর কি মনে ল্যায় না
মনের মতন কাজটি হল্যে গোগা য্যাখন সোহাগ করে, বোতল বোত
চেলা খেয়্যা ফেলাবি?'

সুবলি খিলখিল করে হেসে উঠলো। কঁচড়ার ছাল ছাড়া করাবে
কি বুকের আঁচল হাসির ঝাপটায় খসে। মাথায় কাপড় দিবা
দরকার নাই। বুকের ঢিবি তো আলগা করে রাখা যায় না। হাতে
পিঠ দিয়ে আঁচল টেনে বললো, 'তোমার কি কথা গ পাঁচুদাদা। চেল
খেতে হবেক ক্যানে? ভাতার সোহাগ করল্যে কি বউবিটিরা চেল
গিল্যে মরে?'

'অই, তু বউ বিটিদিগের কথাই উ রকম।' পাঁচু টুকুস করে খানিকটা মদ ঢেলে দিল মুখে। দেখতে দেখতেই বোতল অদ্ধেক সাফ, 'এমন একটা মেয়্যা বিটি দেখলাম নাই, বিটা মরদদের চেলামূলা গিলা পছন্দ করে।'

সুবলি পাঁচুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো, 'উ গুলান গিলা করে, তোমরা য্যাতক্ষ্যাণ বশে থাকা কর, ভাল। অপছন্দ করব্য ক্যানে? আমরা কি খাই নাই? তোমাদিগের আনতাবাড়ি পাগলামি সয় না।'

'অই, ছোট বউও তোর মতন বুলে বটে।' পাঁচু হাসলো, কিন্তু ইয়ার মধ্যেই দেখ, চোখ মুখের লসকা বদল হয়ে যাঁইচে। বললো, 'ফুর্তির জন্যে গিলা করি, পাগলামির কী আছে?'

সুবলি চোখের তারা ঘুরিয়ে হাসলো, 'তা, তোমাকে কে সোহাগ করলেক গ পাঁচুদাদা, অঁ? ই সকালকে এস্যে বোতল লিয়া বস্যা গেলে? বউদিদি নাকি?'

পাঁচু জবাব দেবার আগে বোতল তুলে চেলা ঢালা করলো। গোঁফ জোড়া, ঠোঁট ভিজে গেল, টুকুস বা কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। গড়গড়িয়ে হাসলো, কোলের কাপড় তুলে মুখ মুছলো, 'না গ সুবলি, আজ্ঞ আমাকে লসকায় সোহাগ কর্যেছে।'

সুবলির ভুরু জোড়া কালি বিছার মতো কিলবিল করলো, অবুঝ চোখে তাকালো। হুঁ, পাঁচু জানে, সুবলি তার মনের কথা বুঝতে পারছে না। না, উয়াকে ওস্তাদের লসকা পছন্দের কথা বুলা করার দরকার নাই। সুবলি জিজ্ঞেস করলো, 'লসকার আবার সোহাগটি কেমন গ পাঁচুদাদা? উটি বুঁইতে লারছি।'

'উ তু বুঁইতে লারবি গ সুবলি।' বোতল তুলা করে ঢক ঢক

গলায় ঢাললো, 'অই, বড় ভাল ভাজা মাল। বুঁইলি সুবলি, বউদিদির সোহাগ আর লসকার সোহাগে অনেক ফারাক। উ তুই বুঁইতে লারবি। আমাকে টুকুস নুন, আর ঘরকে থাকলে, একটা প্যাজ আর কাঁচা নংকা দিয়া কর।'

সুবলি হাত ঝাড়া দিয়ে কঁচড়া রেখে অবাক অসোয়াস্তি চোখে পাঁচুর দিকে তাকালো, 'সকালে কিছু খাও নাই, নাই কি?'

'খাঁইচি, খাঁইচি।' পাঁচু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ওস্তাদের ঘরকে মুড়ি চা খাঁইচি। মুখের রস কাটাতে হবেক, টুকুস নংকা নুন মুখে দিয়া করলে, মালটি জমবেক।'

সুবলি ঢুকলো ঘরের ভিতর বাগে। হঁ, পাঁচুর গায়ে মাথায় টুকুস আঁশফল গাছের ছায়া পড়েছে। পচি বাতাসটা এখনো সর-সর বইছে। সে বোতলটা তুলে গলায় ঢালতে লাগলো, সুবলি ঘরের বাইরে এসে, হাঁপুস্তে বললো, 'উ কি করচ্য গ পাঁচুদাদা, এ্যাতটুকুস সময়ে একটা বোতল খালি করল্যে?'

হঁ, পাঁচু বোতলটা একেবারে খালি করে, মাটির ওপর বসিয়ে দিল, 'তু কি ভাবচু আমি মাতাল হয়ে গেঁইচি?' বলে হাসলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি টাকা বের করে বাড়িয়ে দিল, 'দে, আর এক বোতল দিয়া কর সুবলি, ঝটকা ঘর যেত্যে হবেক।'

সুবলি খড়ের চালের বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতের মাটির শানকিতে একটু নুন, একটি কাঁচা লংকা, আধখানা পেঁয়াজ। শানকিটি পাঁচুর সামনে রেখে বললো, 'ই বেলাতেই এত্য মেত্যে যাঁইচ য্যে? আবার এক বোতল লিবে?'

'লুব গ সুবলি।' পাঁচু রঙ লাগা চোখে হাসলো, 'আজ আমার মাতবার দিন বটে। কিন্তু মাতাল হব নাই, দেখ্যা লিয়া করিস।'

সুবলি হেসে, পাঁচুর হাত থেকে টাকাটি নিয়ে আবার ঘরের ভিতর বাগে গেল। পাঁচু কাটা পেঁয়াজ তুলে টুকুস নুন ঘষে কামড় দিল। তারপরেই লংকাটি তুলে ডগাটা দাঁতে কাটলো। সুবলি আর একটি ভরা বোতল এনে বসিয়ে দিল তার সামনে। খালি বোতলটি তুলে নিল হাতে। পাঁচু নতুন বোতল হাতে নিয়ে বললো, 'তু টুকুস লিবি নাকি গ সুবলি?'

সুবলি যেন লাফ দিয়ে নিচু পিড়ায়, খড়ের চালের নিচে ঢুকে গেল। 'অই গ, না না, আমি লুব নাই গ পাঁচুদাদা।' কিন্তু চোখে ভারি খুশির ঝলক। বুকের ঢিবিতে আঁচল টেনে দিয়ে বললো, 'চুলায় ভাত বসাইচি। কঁড়চা ভাজা করতে লাগবেক। বিটা-বিটিদের লিয়ে শাউড়ি এখনি এস্যে পড়বেক। আমার কি এখন উসব গিলা চলে?'

হুঁ, ইটি ঠিক কথা। পাঁচু ছিপি খুলে, নতুন বোতল থেকে গলায় টুকুস ঢাললো, 'গোগাটা থাকলেও হত্য, এ সব একা একা ভাল লাগে নাই।'

'ক্যান, লসকায় সোহাগ করেচে যে?' সুবলি চুলার ধারে বসে হাসলো, 'তা লসকাটি কোথাকে থাকা করে, দেখতে কেমন?'

হুঁ, পাঁচুর চোখের পাতা মোটা হয় নাই বটে, এক বোতলের রঙ লাগা হঁইচে। তার মোটা ভুরু জোড়া, লোম খাড়া শুঁয়া-পোকার মতো ঢেউ দিয়ে উঠলো, তাকালো সুবলির কালো চিকচিকে চোখের বাগে! 'কী বলচু গ তু সুবলি, বুঁইতে লারছি।'

'বউদিদির সোহাগ যে লয়, উটি বুঁইতে পারচ্যি।' সুবলি ঘাড় বাঁকা করলো, 'যে লসকাটির কথা বুলেচ, উটি কুন পাড়ায়, কাদের ঘরকে থাকা করে?'

অই, পাঁচুর বুকে মাকু দাবড়াচ্ছে। সে সুবলির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো, ব্যাতে কথা ফুটছে নাই। কিন্তু চোখের সামনে সোনার পিতিমে ভাসছে। ক্যানে, সুবলি হেসে ঢলে এ রকম কথা জিজ্ঞেস করে ক্যানে? উ তো টুকির কথা জানে না। লসকা আবার কোন পাড়ায় থাকবেক, কাদের ঘরকে থাকবেক? হুঁ, গোগার বউ ঠমক দিয়া করচে। উ ঘুগি বটে, লসকার সোহাগ শুনে আনতাবাড়ি আনজাদি কেঁচা বিঁধা করছে। লেগে যায় তো একখান মাছ গেঁথে যাবে। ভাবছে, লসকার সোহাগ আর কিছু না, কারো সঙ্গে পীরিত হুইচে। 'হুঁ, তু কি বলচু গ সুবলি?' পাঁচু হাসতে লাগলো, যেন ভরা কলসীর জল উপছে উপছে পড়তে লাগলো।

সুবলিও হাসতে লাগলো, তার ভাতের হাঁড়িতে কাঠের হাতা লাড়ি করতে গিয়ে, বুকের ঢিবি আঁচল খোয়াল। না, উয়ার নজর নাই। হাতা লাড়ি করে, হি হি হাসে, ঢিবি কাঁপে। ইদিকে দেখ, পাঁচুর গা মাথা থেকে ছায়া সরে গিয়েছে, রোদে ছায়া ছোট হয়ে আসছে। উয়াদের হাসির সঙ্গে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। নতুন বোতলটিও আধাআধি হয়ে এসেছে। পাঁচুর খেয়াল হলো না কখন গোগার মা, বিটাবিটি ছুটো এসে পড়েছে। তার চোখের সামনে তখনো, বীট ঘরে উঁচু পিড়ার উপরে লাল পাড় শাড়ির আধ মাথা ঢাকা ঘোমটা, ঘাড়ের পাশ দিয়ে খোলা চুলের গোছা, বুকের বেল তনে ছড়ানো, সোনার পিতিমেখানি ভাসছে। হুঁ, চোখে উয়ার কাজল নাই বটে, কানটানা লসকাখানি দেখ, যেন পদ্দার কাঁচা সোনায় টানা করেছে। তারা ছুটি মীনা করলেক কী দিয়া হে? যেন কেঁচায় বিঁধে আবার দক্তি টেনে প্রাণটা খাপি করে। অই, ইয়া, আজ কি লসকার দিন গ বটে। এতকাল আওয়াজ দিয়া করালেক, অংখারি

[ু]লে জিগির বাখান শুনা করালেক, আর আজ ছোটঠাউরদাকে দিয়ে [দ]রকে ডাকা করালেক? কী লসকা কী লসকা!···হুঁ, অই ছোট বউ, তু আমার চখ বাগে তাকাস নাই গ।

'তা উই গ বাবা রোদে ঝাঁন খাইচ যে?' গোগার মা বুড়ি [ব]ললো, 'পুড়্যে যাইচ। গাছতলায় বসগা।'

[পাঁ]চু বুড়ির দিকে তাকালো, 'ই রোদ আমার লাগচে নাই গ [ম]াসী।''

'হুঁ, পাঁচুদাদার উসব কিছু লাগে নাই।' সুবলি হেসে বললো, [ত]ারপরেই পুব বাগে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠলো, চোখের নজর [খ]াড়া। বুকের ঢিবিতে আঁচল তুলে দিল, 'উটি আবার ছাতা মাথায় [কে] আঁইচে?'

পাঁচু চোখ ফেরাবার আগেই দেখলো তার গায়ে ছায়া, সামনে [ছো]াট ঠাউরদা দাঁড়িয়ে। এখন আর ওসব মটকার কাপড় উড়নি নেই, [ক]পালের ফোঁটাটি আছে। গায়ে ধুতি জামা, পায়ে চামড়ার জুতো। [র]াগা ফরসা মুখখানি শক্ত, 'শালা ভেবেচু, তু হেথাকে আঁইচু, আমি [ব]ুঝি নাই?' বলেই জুতো সুদ্ধ একটি পা তুললো।

পাঁচু মাথা বাঁচাবার জন্যে এক হাত তুলে অন্য বাগে ঝুঁকে [ব]ললো, 'মের নাই গ ছোট ঠাউরদা। ত্যাখন একটা পাইসাও পকেটে ছিল নাই। সেবা মণ্ডলে গা, কাত্তিকবাবুর কাছ থেক্যা টাকা চেয়্যা লিয়া আইচি। মা মোনসার দিব্যি, মিথ্যা বুলি নাই। তা ই ঝাঁ দুপুরে তুমি টুকুস চেলা খাবেক কি?'

'লয় ত কি শালা তু অদধপুতার মুখ দেখতে আঁইচি?' ছোট [ঠ]াউনঠাউর পা নামিয়ে নিল।

সুবলি কেবল না, উয়ার শাউড়ি আর ছাঁ বিটাবিটি দু'টাও কেমন

ঠেক খেয়ে গিয়েছিল। কুঞ্জ ঠাউর অচেনা লোক না। পাঁচু তাঁর
সঙ্গে ঠাউরের আঁতে ব্যাঁতে মাখামাখি, তাও সুবলি জানে। সাঁঝ
বেলার আঁধারে, ছুটিতে রোজ সুবলির ঘরের খরিদদার। কিন্তু কু
ঠাউর জুতা তুলে মারতে গেল দেখেই, সকলে ভ্যাবাচাকা খে
গিয়েছে। পাঁচু বললো, 'অই সুবলি, আর একটা বোতল দিয়া কর
আর ছোট ঠাউরদার জন্য একখান গেলাস।' সে পকেট থেকে অ
একটি টাকা বের করলো।

সুবলি এখন তামুক শুকনো দাঁত বের করে হাসছে, 'অই
আমার কি ডর লেগ্যে গৈইচে গ দাদা ঠাউর। ভাবলাম কি, পাঁ
দাদাকে তুমি পিটাই করবে।'

'পিটাই ত করবক বটে।' ছোটঠাউরদা পাঁচুর দিকে যেন আং
চোখে তাকালো, 'তা শালা ই রোদে বসে ক্যানে? চল উবা
গাছের ছায়ায়গা বসি, টুকুস আড়াল হবেক।'

পাঁচু নিজের বোতলটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চল। বে
ছিল নাই, খেত্যে খেত্যে সুবলির সঙ্গে টুকুস কথাত্তা বুলা করছিলাম

'হঁ শালা, বউবিটি দেখলেই তোর কথাত্তা।' ছোট ঠাউর ছা
মাথায় পা বাড়ালো পচি বাগে। তার সঙ্গে চলতে গিয়ে পাঁ
মাথায় যেন বাতাসের ঝাপটা লাগলো, এগিয়ে চলে গেল দু প
'বিশ্বকমমার নাম করি গ ছোটঠাউরদা, কাকে লিয়া কী বুলচ
তুমি?'

ছোট বাউনঠাউর কোনো জবাব না দিয়ে একটা ঝাড়ালো নি
গাছের ছায়ায়, গোড় ঘেঁষে বসলো। ছাতা গুটালো, জুতো খুললে
ইদিক উদিকে ঘর রয়েছে, কারো কোনো নজর বিকার নেই।
জনকেই সবাই চিনে। ছোট ঠাউর বললো, 'বুলব শালা, যা খু

তাই বুলা করবক। ইখানে বস আগে।'

হঁ, পাঁচুর টুকুস লিশা হইচে বটে। সে একেবারে ছোটঠাউরের পায়ের ওপর বোতলসুদ্ধ দু হাত ঠেকিয়ে বসলো। মাথাটা যেন বাতাসের ঝাপটায় দুলে দুলে উঠছে। পিছন থেকে সুবলি হাসতে হাসতে বোতল আর কাঁচের একটা গেলাস হাতে এগিয়ে এলো, 'ই গো পাঁচুদাদা, দাদাঠাউরকে দেখেই মাতাল হয়্যা গেল্যে?'

অঁ? পাঁচু মুখ ফিরিয়ে সুবলির দিকে তাকালো, 'না গ সুবলি, মাতাল হই নাই। লে, তোর টাকাটা লে।' আবার ছোট ঠাউরের দিকে মুখ ফিরিরে বললো, 'কিছু খাবেক কি ছোটঠাউরদা?'

'না।' ছোটঠাউর বললো।

সুবলি বোতল গেলাস রেখে, পাঁচুর হাত থেকে টাকাটা নিল। দু-জনের দিকে দেখে, ঠোঁট টিপে হেসে চলে গেল।

ছোট ঠাউর গেলাসটা হাতে নিয়ে ঘুরা ফিরা করে দেখলো। তারপরে বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে ঢেলে চুমুক দিল।

'হুঁ ইয়া, শালা সত্যি কথা বুলা কর, উ মাগীর সঙ্গে তোর বিত্তান্ত কী?'

'কুন বিত্তান্ত নাই, ই তোমার পা ছুঁয়া করে বুলচি।' পাঁচু দু হাতে, ছোটঠাউরের দু পা চেপে ধরলো, 'উ ঘরের সামনে দিয়া গেল্যে যোগেনের বউ জিগির বাখান দিয়া করতো, হাসি মসকরা করতো, হুঁ, আর কুন বিত্তান্ত নাই।'

ছোটঠাউর গেলাসে চুমুক দিল, 'আর ও ঘরকে গিয়া পেসাদ খাওয়া?'

'আজ পেথথম, মা কালীর দিব্য ছোটঠাউরদা।' পাঁচু পা না ছেড়ে বললো, 'মিছা বুলল্যে আমার কুষ্ঠ হবেক। ত্যাখন তোমাকে একটা

কথাও মিছা বুলা করি নাই।'

ছোটঠাউর গেলাস শেষ কবে, বোতল থেকে আবার ঢাললো, 'গ্যাখ তু আমার ভিক্ষাভাই, বাউনেব পা ছুঁয়া করে মিছা বুললে, মহাপাতকী হবি।'

'তোমার ভিক্ষাভাইয়ের বউ আমার মরা মুখ দেখবে ছোট-ঠাউরদা।' পাঁচু আগের মতোই বললো।

ছোটঠাউর বললো, 'শালা।' তারপরে গেলাসে চুমুক দিল।

পাঁচুর মুখখানা যেন চৌতারে আটকে যাওয়া থামের মতো কুঁচকে গিয়েছে। ই হলো ছোটঠাউরের অবিশ্বাসের যন্ত্রণা। সেও বোতল তুলা করে গলায় ঢাললো, তাকালো ছোটঠাউরের মুখের দিকে।

ছোটঠাউরেব ভাবখানি দেখ, যেন ভর হয়েছে। দু-তিনবাব গেলাসে চুমুক দিল। না, এখন মুখ শক্ত নেই, তেমন রাগ নেই, বললো, 'দে, বিড়ি দে।'

পাঁচু তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বিড়ি বের করে দিল। ফ্যাচকলটি ফ্যাচ ফ্যাচ করে ধরিয়ে দিল। ছোটঠাউর বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো, 'শোন পাঁচু, তু শাস্তর পড়েছু?'

'শাস্তর?' পাঁচুর হা করা মুখটা এখন উয়ার বাপ জগত কীতেব মতো দেখাইচে, 'তাঁতী ঘরের বিটা আমি শাস্তর পড়বক কী গ? যেমন কর্যে লসকা আঁকা শিখা করচি উ বাগে দস্তখতটা আঁকা করত্যে শিখা করেচি।'

ছোটঠাউর যেন পাঁচুর কথা শুনছে না, ভরের ঘোরে বোতল থেকে গেলাসে ঢালা খাওয়া করলো, 'শুন তবে পাঁচু। হঁ, ইয়া কী উয়ার নাম? যোগেনের বউ—।'

'টুকি', পাঁচু বললো।

ছোটঠাউরের ফারসা মুখে আর বিড়াল চোখে রঙ ধরে গিয়েছে, ই হল্য যোগেনের বউ। তু উ বউটার কাছকে সাঁজবেলায় যাবি।'

'অই কী বুলচ গ ছোটঠাউরদা?' পাঁচু নিজের বোতলটা বুকের ছে চেপে ধরলো।

ছোটঠাউর তার সরু সরু আঙুল মাটিতে ঠুকে বললো, 'হুঁ ইটি া শাস্তরের কথা। কুন যোবতী ইস্তিরিলোক যদি কুন পুরুষের সঙ্গ াত্যে চায়, ত উটি করত্যে হবেক।'

'ইস্তিরিলোক!'

'হুঁ র‍্যা শালা, ইস্তিরিলোক, বউ মেয়্যা যাদিগে বুলে।' ছোট-উর ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'কুন ইস্তিরিলোক যদি কুন পুরুষকে চায়, উয়ার ঋতু রক্ষা করতে হবেক। ইটি শাস্তরের কথা।'

'ঋতু?' পাঁচু দু হাতে বোতল মোচড়াতে লাগলো।

ছোটঠাউর গেলাসে চুমুক দিয়ে, ঠক করে সেটা মাটিতে রেখে লো, 'হুঁ র‍্যা শালা, ঋতু। ঋতু জানিস নাই? ঋতু ঋতু। কুন বউ ইল্যে উটি রক্ষা করতে হবেক, ই হল্য শাস্তরের কথা। তু সাঁজ-লাতে যোগেনের বউয়ের কাছকে যাবি। লইলে পাপ লাগবেক।'

'পাপ লাগবেক?' পাঁচু বোতল তুলা করে গলায় ঢাললো, াটঠাউরের মুখের দিকে তাকালো, 'কী বুলচ গ ছোটঠাউরদা, পের কালে শুনি নাই। যাবতকাল শুনা করচি, পরের বউয়ের াছকে গেল্যে, পাপ লাগে।'

ছোটঠাউর মাটিতে চাপড় মেরে বললো, 'শাস্তরের কথা তু শালা ামার থেক্যা বেশি জানচু কী র‍্যা, অঁ?'

'না ছোটঠাউরদা।' পাঁচু মাথাটা টুকুস সরিয়ে নিল। 'লোকে ল্য, পরের বউয়ের কাছকে গেলে, উয়াকে ইয়া—তোমার অই ইয়া

করা বুল্যে।'

ছোটঠাউর বললো, 'হুঁ বল না ক্যানে, উয়াকে নাঙিন করা বুলো উয়াতে আব ইয়াতে অনেক তফাত আছে বুঁইলি অঁড়কঁক? তু পরের ঘরের বউকে পট্যো লিয়্যে পীরিত কর‍্যে, টাকা কড়ি দিয়া কে উয়ার সঙ্গ করচিস না। ই হল্য আলাদা কথা। যোগেনের বউ তো সঙ্গ চ্যায়া করেচে, তু যাবি। ইটি শাস্তরের কথা, বুঁইলি। লইে পাপ লাগবেক, হুঁ, উয়ার মনের দুঃখে, তোর সব ছারখার হয় যাবেকগা।'

'অই অই ছোটঠাউরদা।' পাঁচু ঘোর দুপুরের বাউরিপা চমকিয়ে ডরে ভরে চিৎকার করলো। বুকে বিসর্জনের দগর বাজে 'বুল নাই গ বুল নাই।'

ছোটঠাউর গেলাসে ঢেলা ঢালা খাওয়া করলো। ভরের ঘো গুডিয়ে বললো, 'হুঁ, ইটি শাস্তরের কথা।'

পাঁচুর চোখে এখন লসকা ভাসছে। অই, আজ দিনটাব কি বুঁইতে লারছি হে।…হুঁ সোনার পিতিমেখানিও চোখে ভাসছে উয়ার সঙ্গে দেখ, ঘর বউ বিটা-বিটি সব ভাসছে। সে আতুর চো তাকালো ছোটঠাউরের মুখের দিকে।

'ছোটঠাউরদা, উ যদি তোমাকে ডাকা করত, তুমি ক করত্যে গ?'

'কে? যোগেনের বউ?' ছোটঠাউরের ফরসা মুখ তোড়ে রক্ত ভাসা হলো, নজর সেই কোন দূর বাগে, 'যেত্যম বটে হুঁ। উ শাস্তরে বিধেন। কিন্তু উ আমাকে ডাকা করে নাই, অই র‍্যা পাঁচু, উ আমাে ডাকা করে নাই। আমার বাপ উয়াকে বিয়া দিয়া লিয়া আইচি আমি এত বছর সকালে পূজা সাঁজে শীতল দিয়া আইচি উ ঘরকে,

খালি আমার পায়ে হাত দিয়া গড় করেচে। আর আজ উ আমার
ামনে তোকে ডাকা করলেক, হঁ তু ত্যাখন বুলা করলি নাই. কুন বউ
য়্যার এত বড় বুকের পাটা দেখিস নাই? উ তোকে ডাকা করেচে,
ামাকে করে নাই।' সে গেলাস উপুড় করে গলায় ঢাললো।

হঁ, ছোটঠাউরকে পাঁচু অনেকবার মাতাল দেখেছে, কিন্তু এমনটি
েখে নাই। ছোটঠাউর রাগারাগি করে খিস্তিখেউর করে, বাখান দেয়,
গির করে হাসে, উয়াকে বুঝা যায়। ই যেন আর এক ছোটঠাউর।
াও আবার দিনের বেলা ছোটঠাউর কালেভদ্রে খায়। রথ দোলের
থা আলাদা। উলটারথের দিনকে বিষ্টুপুরের বাপ বিটায় চেলা মূলা
নে মুখ ঘষাঘষি করে। কিন্তু ছোটঠাউরের আজ ই কি ঘোর। যেন
নসাতলায় ভর হঁইচে। পাঁচু বোতলে চুমুক দিতে ভুলে গেল, 'হঁ
াটঠাউরদা, য্যাখন সব জানাজানি হবেক?'

'শালা সনসারে কুন জিনিসটা জানাজানি হয় নাই র‍্যা?' ছোট-
াউর আবার নজর ফিরিয়ে আনল, 'কুন ঘরে কুন কথাটি জানাজানি
য় নাই র‍্যা? কেউ বুল্যে, কেউ বুল্যে নাই, কিন্তু সব ফুট্যে যায়।'

'হঁ, ই কথা ঠিক বটে। লসকার মতো সব ফুটে ওঠে। হঁ, কিন্তু উ
াগেন বীট যখন হাঁকোড় মেরা্যা আসবেক?'

'আসবেক ত আসবেক।' ছোটঠাউর হাত মুঠো করে মাথার
পরে তুললো, 'যা হবার হবেক। ক্যানে? না, যম বিষ সাপ
াগুন মরণ উয়ারা ধরল্যে ছাড়ে নাই। যোগেনের সঙ্গে লড়বি কি
রবি জানি নাই, কিন্তু উয়ার কাছকে তোকে যেতে হবেক, ই
াস্তরের কথা। উ তোকে ডাকা করেচে।'

অই, ই কি শাস্তর হে? শাস্তর না লসকা বটে? পাঁচুর চোখের
ামনে লসকা ভাসে, সোনার পিতিমে ভাসে, ঘর বউ বিটা-বিটি

বেবাক ভাসে। বোতলটা তুলে মস্ত হা করে গলায় ঢালা করে।

'অই পুনি, এখনো তোর বাপ আসে নাই?' তাঁত ঘরের দরজায় মোতি উঁকি দিল।

পুনি চরকা ঘুরিয়ে ছোট নলিতে মীনা গোটাচ্ছে। তাঁতে এখন অজ্গা, গলানি মিনিকে নিয়ে বুনা করে চলেছে। ঘরের একপাশে তালাইয়ের ওপর জগত, নেংটি পরা, গুটিশুটি শুয়ে আছে। মোতি ছাড়া খেতে কারো বাকি নেই। পুনি মালতি আর বুদার সঙ্গে যমুনায় ঘাট নাওয়া সেরে এসে, ভাত খেয়ে নিয়েছে, সোনা আর নোটোর সঙ্গেই। সকালে চা মুড়ি খেয়ে উয়ারা ইস্কুলকে গেঁইচিল, আবার দুপুর বাগে এসে ভাত খেয়ে গেঁইচে। ভাইদের সঙ্গেই পুনি খেয়ে নিয়েছে। তার আগে কত্তাদাদাকে পচা গোড়ায় ঘাট করিয়ে এনে, ইঁদারার জলে নাইয়ে দিয়েছে, বাড়ির ভিতর ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এনেছে।

অজ্গা আর মিনির কথা আলাদা। উয়ারা সকালে ঘরের ভাত খেয়ে আসে। দুপুরে মজুরির সঙ্গে পাওয়ানা মুড়ি তেলেভাজাও খাওয়া হয়ে গিয়েছে। পটি ভিতর বাগের রকে ঘুমোচ্ছে। আর মোতি একবার বাইরে আসছে, আবার ঘরে যাচ্ছে। মাকুর মতো ছুটাছুটি করছে। আতুর পাতুর চোখ, মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। ঘর বার করে করে, ঘোমটা টানতে ভুলে যাচ্ছে। হুঁ, মোতির ঘাট নাওয়া সেরে ফিরে আসবার তর সইলো না, লসকা নিয়ে বের হয়্যা গেলো, এখনো ফিরবার নামটি নেই? সকাল থেকে চা মুড়ি পেটে পড়েছে কী না, কে জানে। এত বেলায় কি কেউ ওস্তাদের ঘরে বসে থাকে?

মা বিটিতে তাকাতাকি করে। একজনের মীনা মাকু টানা চোখে নানা ধন্দ ভয়। আর একজনের লসকা বুটি চোখের তারায় অবুঝ দুশ্চিন্তা। বললো, 'আসে নাই।'

'হঁ, কোথাকে যেত্যে পারে, বুঁইতে লারছি।' মোতি বললো রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

পুনির সঙ্গে অজার চোখাচোখি হলো। মিনি ছোট মীনা মাকু গলাচ্ছে, আর ফাঁকে ফাঁকে, সকলের মুখের দিকে দেখছে। অজা বললো, 'হঁ, পাঁচুকাকা এখনো কি ওস্তাদের ঘরকে রঁইচে?'

পুনি চোখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকালো। মোতির ভয়ভাবনা ধন্দ লাগা মুখ মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে উঠছে, 'হঁ, ওস্তাদের খাওয়া নাওয়া নাই? বুড়া মানুষ, উয়ার ঘুম নাই? ওস্তাদের ঘরকে এখন কী কাজ?'

হঁ, নিজের মানুষটিকে জানতে তো মোতির বাকি নেই? কিন্তু, ই অসময়ে কি বাউরিপাড়ায় যাবেক? কোথাকেও গিয়ে কি চেলামূলা নিয়ে বসবেক? ক্যানে? একটা কিছু বৃত্তান্ত তো থাকা চাই? উ লোক তো যখন তখন যার তার সঙ্গেই বসে আড্ডা দেবার পাত্র না। কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হলে আলাদা কথা। মাথা ঠাণ্ডা করতে গিয়ে, চেলামূলা গিলে মাথাটি আরও গরম করে ফিরে আসে। উয়ার জন্য পকেটে পয়সা না থাকলেও চলে।

বাউরিদের ধারে কারবার চলে। সিবামণ্ডল থেকে টাকা নিতে পারে। কিন্তু কদিন ধরে তো লসকা ছাড়া লোকটার মাথায় কিছু নাই। দিনে লসকা, রাতে লসকা। লসকা লসকা লসকা। তারই ফাঁকে ফাঁকে বানিদারের কাজে লেগে যায়। অজা যখন ফাঁক-বাগে ঘুরাফিরা করতে যায়, তখন নিজেই বিটি-বিটা, নয় তো

মোতিকেই গল্সানির কাজে নিয়ে বুনা করতে বসে যায়। সোনাকে ছাড় দিবার লেগে, নিজেই সময়ে অসময়ে ভুজনির জোড় বুনা করতে বসে। তাঁত ভাত বলে কথা। উ লোক তো তাঁত বসিয়ে রেখে, কোথাকেও বিনা কাজে ঘুরবেক নাই। এই ভুজনির জোড়ের থান বুনা হয়ে গেলে, আবার নতুন কিছু শুরু করবে। উ লোক নিজের মুখে বলে, 'মরা মানুষও যা, তাঁত বসা করে রাখাও তাই।'…উ লোক তো তাঁত বসিয়ে রাখবে না! যতোটুকু সময় পাবে, ততোটুকু কাজ করবে!

হঁ, সাঁজবেলার কথা আলাদা। উয়াদের রক্তে চেলামূলা। তাও দুদিন ঘরের বার হয়নি। অজাকে দিয়ে ঘরকে আনা করাইচে, ঘরকে বসে খাইচে, আর কেরোসিনের বড় বাতি জ্বালিয়ে লসকা আঁকা করেচে। হঁ, সকালেই যমুনায় আঁটকুড়ি মাগী যা কাণ্ড করেছে দেখলে পাপ। কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে নাই তো?

মোতি কান খাড়া করে একবার বাড়ির ভিতর বাগে ফিরে তাকালো। পটিটা কাঁদে নাকি? ঘরের দরজায় শিকল টানা আছে। ভাত তরকারি সব ঢাকা দেওয়া রয়েছে। হঁ, ভাত কেড়ালির ডাল আর কুড়কুড়ি ছাতু রান্না করেছে সর্ষে বাটা দিয়ে। যার জন্য রান্না, পথ চেয়ে বসে থাকা, তার কোনো পাত্তা নেই।

'আমি একবার ওস্তাদের ঘরকে যাবক কি?' পুনি জিজ্ঞেস করলো।

মোতি রাস্তার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললো, 'বেলা গড়াই গেঁইচে, উখানকে কি সে বস্তে রয়েচে?'

'খবর কিছু যদি মিলে', পুনি আড়চোখে একবার অজার দিকে দেখে বললো।

হুঁ, প্রাণটা বড় হাঁসফাঁস করছে। মোতি বললো, 'যাবি? উথানকে গেল্যে খবর একটা— ।' কথা শেষ হলো না, রাস্তার ওপর পাঁচুকে দেখা গেল। চেহারা দেখলে আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। লাল চোখ, কপালের উপর খামচে টানা চুল, আর যেন কতোই সহজভাবে, সোজা হয়ে হাঁটবার চেষ্টা। যতো চেষ্টা ততোই পা একবার ই বাগে আবার উ বাগে। মোতির নাকের ছ্যাঁদা বড় হলো, নাকচাবিতে বিজলি হানলো। মীনা মাকুটানা চোখে আংরার ঝলক। মুখটা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বললো, 'হুঁ, পুনি যা, একবার দেখ্যে আয়গা, তোর বাপ কুন পচাগোড়ায় মুখ ডুবা কর্যে পড়্যে রইচে।' বলেই, মুখ ফিরিয়ে, বাড়ির ভিতর বাগে হনহনিয়ে চলে গেল।

অজা তাকিয়েছিল পুনির দিকে। হুঁ, নাওয়ার পরে এখন পুনির গায়ে নীল ফুল ছিটের জামা। ও একবার অজার দিকে দেখেই, লাফ দিয়ে উঠে, দরজার কাছে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখলো, রাস্তার ধার থেকে বাপ লাফ দিয়ে নর্দমা পার হলো। রাঙা চোখে আর টান টান চামড়া মুখে হাসি। হাত তুলে ডাকছে, 'অই, ছোট বউ, শুন শুন, কোথাকে যাইচু?'

পুনির ভুরু কুঁচকে উঠলো। উয়ারও নাকচাবিখানিতে চমক দিল। লসকা বুটি চোখে মায়ের মতো আংরা ঝলক নেই বটে, অভিমান করে তাকালো। পাঁচু কাছে এসে পুনির দিকে তাকালো, হেসে বললে, 'অই, তোর মা বড় রাগ করেচে র‍্যা? আমার কথা শুনল নাই।' দু হাতে দরজার চৌকাঠ ধরলো, 'লসকা লসকা। অই পুনি, আমার বাপ কুথা র‍্যা?'

জগত এতক্ষণ গুটিশুটি শুয়েছিল, চোখ বোজেনি, ঘুমায়নি। পাঁচুর গলা শুনে ঘড়-ঘড়ে গলায় বললো, 'হুঁ, পাঁচু এঁয়েচু? কোথাকে

গেইচিলি ?’

‘অই বাপ, তুমি ই ঘরকে রঁইচ ?’ পাঁচু ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো, পড়তে গিয়ে টাল সামলিয়ে, জগতের পায়ে হাত দিয়ে বললো, ‘একবারটি মাথা তুলা করগ বাপ, তোমাকে গড় করি।’

জগত হা করে মাথা তোলবার চেষ্টা করলো, ‘গড় করবি ? ক্যানে রে বিটা ? কী হঁয়েচে ?’

‘ওস্তাদ আমার লসকা পছন্দ করেচে।’ পাঁচু জগতের দু পায়ে দু হাত ঠেকিয়ে কাপালে ছোঁয়ালো, ‘অনেকদিন পরে গ বাপ, অনেক লসকার পরে, ইটি তিন নম্বর।’

জগতের জিভটা কষের বাইরে বেরিয়ে এলো, মাড়ি দেখা গেল। হঁ, পাঁচুর মুখটা ছায়ার মত দেখাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে। দু’ হাতে উয়ার মাথাটা অশক্ত হাতে চেপে ধরলো, ‘অই, বাপ আমার, লম্বর লম্বর লসকা হক র‍্যা তোর! হঁ, তু মনের ফুতিতে চেলা গিলা এয়েচু ? বেশ করেচু র‍্যা, বেশ করেচু। ত আমার লেগ্যে টুকুস লিয়া আসিস নাই ক্যানে ?’

হঁ, এখন দেখ, পুনির লসকা বুটি চোখে হাসি বিজলায়। তাকাবে না ভেবেও, অজার দিকে তাকায়, আর ঠোঁটে হাসির লসকা ফোটে। অজাও হাসছে, মিনি গলানিও হাসছে। পাঁচু দু হাত নেড়ে বললো, ‘লিয়ে আসবক, তোমার লেগ্যেও লিয়ে আসবক, উলটা রথের দিন।’ মুখ ফিরিয়ে পুনির দিকে তাকালো, ‘অই পুনি, তোর মা খুব রাগ করেচে কি ?’

‘করবেক নাই ?’ পুনি ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, ‘মা সেই কখন থেক্যা ঘর বার করচে যে ?’

পাঁচু হাসলো, ‘হঁ, কিন্তু আজ বড় সোখের দিন বটে গ বিটি,

।স্তাদ আমার লসকা পছন্দ করেচ্যে। আজ লসকার দিন।' বলতে লতে দরজা টপকে ঘরের বাইরে গেল। কোনদিকে না তাকিয়ে ।কেবারে বাড়ির ভিতর বাগে।

সরু এক ফালি উঠোন, গায়ে গায়ে ঘর। খড়ের চাল, একতলা, দাতলা। পাঁচু নিজের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা খালা। এক পাশে ছোট একটা তালাইয়ের ওপর পটি ল্যাংটা হয়ে মাচ্ছে। মোতিকে দেখা যায় না। গজানন আর জ্ঞাতিদের বউ ।টিরা উঁকিঝুঁকি মারছে।

হঁ, এখন রগড় দেখবার সময় নেই। ভাত ব্যঞ্জন রেঁধে, ঘর গোষ্ঠীর বাইকে নাইয়ে, ঘরের বউ উপিস করে, সোয়ামীর পথ চেয়ে আন-ান ইবাগে উবাগে দৌড়োচ্চে, সোয়ামী এলো চেলা গিলে টং হয়্যা। টি রগড় দেখবার সময় বটে।

পাঁচু ঘরের দরজার চৌকাঠ ধবে ডাক দিল, 'ছোট বউ। কাথাকে গেলি গ?'

হঁ, জবাব কে দিবে? ঘরের কোণে খরিশ ফুঁসছে। মোতি এক কাণে বসে, মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছে, দরজার বিপরীত দিকে। মাথার ল খোলা, নেয়ে এসে চিরুনি লাগাবার সময় পায়নি। কে-ই বা ।ায়? ঘাট নাওয়া বাজার সেরে, ঘরে ফিরে সবাইকে চা মুড়ি খেতে দিয়েছে। চুলায় আগুন দিয়ে, আগে ডাল বসিয়ে, কোনোরকমে মাঙুলের ডগায় সিঁদুর নিয়ে একবার কপালে আর সিঁথেয় ছুঁইয়েছে। লের গোছা ঘাড়ে পিঠে ছড়ানো, আলগা করে বাঁধাও নেই। তারপরে দেখ, ঘরের মাঝখানেই পড়ে রয়েছে, লাটাই আর ফাঁদালি। ।টি সেই তাঁত ঘর ছেড়ে এসেছিল, আর মাকে ছেড়ে যায়নি। তারপর থেকে, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে লাটাইয়ে তসরের সুতো

গুটিয়েছে। ভাত তরকারি করে, সবাইকে খাইয়েছে। পটিকে চা করে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরে আবার লাটাই ফাঁদালি। তখন কি আর উয়াতে মন থাকে। এতগুলান ঘরের, যে-কোনো লোকই এসেছে, পায়ের শব্দে ভেবেছে, অই, উ আঁইচে।

হঁ, উ আঁইচে, রোদ পচিতে ঢুলিয়ে, বিকল করে। ক্যানে: দেখেই মালুম হয়েছে, চেলা গিলা করে আঁইচে।

তোমার জান, জান, আর কারো জান নেই? ক্ষুধা তেষ্টা নেই? সময় অসময় নেই? মোতি ফুঁসবে না তো কী করবে?

এখন চোপা করলে, বউ বড় বজ্জাত।

পাঁচু পায়ের জুতো জোড়া খুলে ঘরে ঢুকলো। বাইরের আলো থেকে ঘরে ঢুকলে, হঠাৎ কিছু চোখে পড়ে না। একটি দরজা ছাড়া, পুব বাগের মাটির দেয়ালে একখানি কাঠের জানালা ফোটানো, গোটা কয়েক পেটা পৌতা। খুলে রাখা ছুটো পাল্লাও আছে। বাইরের আলো থেকে আনখা ঘরে ঢুকলে, অন্ধকার লাগে। তাছাড়া, পাঁচুর নজর এখন খাড়া না। সে আবার ডাকলো, 'ছোট বউ, অই ছোট বউ।'

ঘরের কোণ থেকে ফোঁস ফোঁস জবাব এল্যো, 'মর‍্যো গেঁইচে, হঁ, কালিন্দীতে গেঁইচে।'

'অই অই, কড়ে বউ।' পাঁচু ঘরের কোণে মোতির দিকে ছু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

মোতি ফিরে তাকালো। আরো ধকধক চোখে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, 'রঙদারি কর নাই। দরজা খোলা রইচে।'

'থাকুক গা, আমি পাঁচু লসকাদার।' পাঁচু আগের মতোই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল মোতিকে ধরবার জন্য।

মোতি সাপিনীর মতোই, শরীর বাঁকিয়ে, পিছলে, অন্য বাগে ...রে গেল, 'লাজলজ্জার মাথা খাইচ কি অঁ? অ্যাতখানি বেলায় ...চলা গিলো এস্যে, এখন লসকাদারি করচ?'

'হঁ, হঁ র‍্যা ছোট বউ, আগে শুন ক্যানে আমার কথা।' পাঁচু ...তজোড় করলো, 'ঢেলা-গিলা করচি, ক্ষ্যামা দে। কিন্তু ছোট বউ, ...স্তাদ আমার লসকখানি পছন্দ করেচে র‍্যা। কতদিন বাদে, অঁ? ...ছাট বউ, কতদিন বাদে বল। ওস্তাদের লজর কাড়তে পারি নাই, ...ই, কত লসকা ছিঁড়াকুটা করেচ্যে। আজ কি বুল্যে জানচু র‍্যা ...ছাট বউ? ওস্তাদ বুললো, হঁ, পাঁচু, লসকাখান বড় সোন্দর আঁকা ...রেচু র‍্যা। ইটি দিয়া ভাল কাজ হবেক।'

মোতি অন্য বাগে সরে গিয়েও থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভুরু ...চকে কুঁচকে উঠছে, পাঁচুর মাতাল ডগডগে মুখের দিকে দেখছে, কিন্তু ...চাখের আংরায় যেন মীনার ঝিলিক ফুটছে। মোতিকে অড়কঁক ...নাইচে কি? না, ই লোক তো লসকা লিয়ে আনতাবাড়ি মিছা ...লবেক নাই। হঁ, মোতির উপোসী ধড়াসি প্রাণে যেন টুকুস সুখের ...তাস লাগছে।

'অই, ছোট বউ, তু বলচু নাই ক্যানে রে?' পাঁচু মোতির দিকে ...র এক পা এগোল, 'তু কি ভাবচু, আমি মিছা বলা করচি, অঁ?'

মোতি একবার খোলা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, আবার ...াঁচুর দিকে। হঁ, উয়ার গলার ঝাঁজ ভাজ নরম হয়ে যাচ্ছে। বললো, ...মিছা বুলবে ক্যানে?'

'ত, ছোট বউ, তু রাগ করচু ক্যানে?' পাঁচু হাত বাড়িয়ে, পা ...াড়িয়ে মোতিকে ছুঁই ছুঁই করলো।

মোতি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে সয়ে গিয়ে, গলার স্বর নামিয়ে

বললো, 'অই, উ কি করচ গ ? ই বাগে উ বাগে লোকজন রইচে। ত
ইয়া, ওস্তাদের ঘর থেক্যা একবার নিজের ঘরকে আসবে ত ? আ
গুন মন্তর জানি কি, তুমি কোথাকে গৈইচ, কোথাকে রঁইচ, বিত্তা
কী ? মনের ভিতর কত আনতাবারি ভাবনা হয়।'

'হুঁ, ই তু বুলতে পারিস গ ছোট বউ।' পাঁচু দরজার দিকে
মোতির কাছে এগিয়ে গেল, 'কিন্তু ওস্তাদের ঘর থেক্যা বেরায়ে
মনটা বড় লাচ করছিল। মনে হইচিল, ত্যাখন ত্যাখনই টুকুস ন
গিলা করলে লয়।'

মোতি আড়চোখে একবার বাইরের দিকে দেখে, দরজাটা ব
করে দিল, 'হুঁ, পকেটেও তোমার টাকা থাকবার কথা লয়, কোথাকে
পেল্যে ?'

'অই অই।' পাঁচু হাসতে হাসতে লাফিয়ে উঠলো, 'তো
ভাতারের অভাব কী গ ছোট বউ ? তাঁতে কাজ হঁইচে, সেবামগুলে
ঘরকে আমার টাকা নাই, নাই কি ? হঁ, আমি কি আর লসকার কথ
বুলা করেচি ? কারোকে বুলি নাই। কাত্তিকবাবুকেও না। উয়া
কাছ থেক্যা পাঁচটি টাকা লিয়া দৌড় দিইচি।' সে মোতির ঘাড়ে
ওপর তার বড় থ্যাবড়া হাত দিয়ে চেপে ধরল।

মোতি দরজার কাছ থেকে সরে এলো, 'তা ঘরকে আইতে ক
হইচিল ? আমি কি টাকা দিতম নাই ?'

'হুঁ, দিয়া করতিস গ, জানি ছোট বউ, কিন্তু ভাবলাম, কী জানি
তু বউদিগের কথা কিছু বুলা যায় নাই।' পাঁচু হাসতে হাসতে
মোতিকে দু হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে নিল।

মোতির কাঁচা রেশম রঙ মুখে হাসি, কিন্তু দেখ, চোখের মীন
তারা দুখানি ভিজা ভিজা। পাঁচুর গা থেকে ছাড়াবার ইচ্ছা নাই, ত

গা লাড়ি দিয়া করে। হঁ, ই লোকটার চোখে যে মোতি অনেকদিন জল দেখেছে। লসকা নিয়ে ওস্তাদের ঘরকে গেঁইচে, আর শুকনো খানাখন্দ মুখখানি নিয়ে ফিরে এসেছে। চেলামূলা গিলা আসে নাই, বোবা হয়ে ঘরকে এসেছে। মুখে ভাত মুড়ি ল্যায় নাই। মোতিকে যখন একলা পেয়েছে, তখন চোখ মুছে বলেছে, 'ওস্তাদ লসকাটা ছিঁড়া টুকরা কর‍্যা ফ্যালাইচে। আমাদ্বারা কিছু হবেক নাই র‍্যা ছোট বউ, কিছু হবেক নাই।'

হঁ, শুনে মোতির বুকটা ফেটে যেতো। চোখ ছাপিয়ে জল আসতো। জীবনে দুখানি লসকার কাজ হয়েছে। আজ দেখ, মোতির বুক ভরে উঠছে। কিন্তু মীনা চিকচিক চোখ দুটি ভিজে যাঁইচে। আর একখানি লসকা ওস্তাদের পছন্দ হয়েছে। এতক্ষণ না জেনে, ভয় ভিতে, তারপরে মাতাল দেখে খুব রাগ হয়েছিল। আর এখন লোকটার সোহাগ, এত সুখ যে, চোখে জল ভরে যায়। মোতি হেসে বললো, 'অই, ই কী করচ গ তুমি ? নোকে কী বুলবে ?'

'কী আবার বুলবে র‍্যা ?' পাঁচু মোতিকে এমন করে বুকের মধ্যে মিশিয়ে নিল, উয়ার লজ্জা ঢাকা রাখা দায়। বললো, 'লোকে বুলবে মাগভাতারে নাঙিন করে। হরে দরে একই পড়ে।'

মোতি ফিসফাস বললো, 'চুপ চুপ।' কিন্তু হাসি থামাতে পারে না, লোকটার হাত মুখ কিছু মানে না। বললো, 'হাতে মুখে জল দিয়ে এস্য, খাবেক নাই ?'

'আগে লসকা, পরে খাওয়া।' পাঁচু মোতিকে শরীরে তুলা করে, মাটিতে বসলো।

মোতি তাড়াতাড়ি বললো, 'ই ছাখ, লাটাই ফাঁদালি দুটা রইচে, কিছু দেখতে পাইচ নাই, নাই কি ? কী মানুষ গ বাবা,

দিনক্ষ্যাণ মানে নাই— ।' কথা শেষ করতে পারলো না। মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, মোতির এখন সব লজ্জা গা থেকে খুলে পড়েছে মাটির মেঝেয়।

হঁ, লজ্জা কি লসকাদারের অঙ্গেও আছে? মোতি হাসবে, না কাঁদবে গ? লোকটা পাগল হয়ে গেইচে কি? চার বিটা-বিটির মা, বউটাকে কি নতুন পেলে আজ? নতুন মরদ নাকি, যেন হাতা মাথা নাই? হঁ, মোতি নিজেও কি পাগল হচ্ছে না? শরীব জুড়ে যে বিঁড়াইয়ের বান ডাকা করচে।

অই, লসকা লসকা হে! মাকু ফাবড়িয়ে দক্তি টেনে জমিন খাপি হয়, আর লসকা ফোটে। লসকা! পচি বাতাসে কি ঝড় উঠেছে? নাকি ঘরে ঝড়ের দাপাদাপি?···

তিন দিন কেটে গেল। পাঁচুর মন ভালো নেই। ওস্তাদের ঘরকে দু' বেলা যাতায়াত করছে। লসকাখানি উয়ার ঘরকে, বিছানার একপাশে পড়ে রয়েছে। পাঁচু সকালে ওস্তাদের শোষ ঘা ধোয়া মোছা করে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। বিকালে আর একবার ওস্তাদের ঘরকে যায়, খবর নিতে, ওস্তাদ কেমন আছে? শরীর গতিক ভালো তো।

হঁ, ওস্তাদ ভালো আছে। তবে উয়ারও মন ভালো নয়। ক্যানে? ঈশ্বরদাস আসছে না। কেবল তো পাঁচুর লসকার কথা নেই। অভয় খান সত্তর পার করে, আশি ছুঁই ছুঁই, কিন্তু এখনো কারোর খায় পরে না। তিন সাল আগে, চন্দরদাসবাবু বেঁচে থাকতে, ছেলে মহাদেবদাস, নাতী ঈশ্বরদাসকে বলে গিয়েছে, ওস্তাদ যতোকাল বেঁচে থাকবে, উয়াকে মাসে একশো টাকা করে দিতে হবে। না, উ

টাকা, মাড়ারিবাবুদিগের ঘরের টাকা না। ওস্তাদের লসকায়, রেশম খাদি সেবা মণ্ডল কেবল লাখ লাখ টাকা রোজগার করেনি। বিষ্ণুপুরের বালুচরীর জগৎজোড়া নাম হয়েছে। সাহেবদিগের দেশেও ওস্তাদের লসকার বড় কদর। বোমবাই সেবামণ্ডল থেকে, মাসে একশো টাকা ওস্তাদের যাবজ্জীবন পেনসন দিয়েছে। ওস্তাদ নিজে তো এখন আর লাঠি ঠুকে ঠুকে ঈশ্বরদাসের গদীতে যেতে পারে না। মাসে মাসে টাকাটা ঈশ্বরদাস নিজেই দিয়ে যায়।

'হঁ, জানচু র‍্যা পাঁচু, ঈশ্বরদাসের ভাবসাব এদানি ভাল বুঝি না।' ওস্তাদ গত তিন দিন ধরেই কথাটি বুলা করচে। আজকাল প্রায়ই ওস্তাদ কথাটি বলে, 'ঈশ্বরদাসের ভাবসাব ভাল লাগে নাই। উ কি উয়ার ঘরের টাকা দিয়া করে, না আমাকে ভিক্ষা দেই? আবার লোকের কাছে বুলা করে, আমাকে উ নিজের ট্যাঁক থেক্যা নাকি চারশো টাকা দিয়া করে। ত, উয়ার যা মনে আসে, বুলা করুকগা। কিন্তু এদানি সময় মতন টাকা দেই না। উয়ার বাপ পিতাম এরকম ছিল না, কিন্তু উয়ার ভাবসাব আলাদা।'...

হঁ, গতকালও ওস্তাদ বলেছে, 'গত মাসে ঈশ্বরদাস আমাকে সত্তর টাকা দিয়া করেচে, ক্যানে? না সেবা মণ্ডলের টাকার টানাটানি যাইচে। ই মাসের টাকার সঙ্গে বাকি তিরিশ টাকা দিবেক। কিন্তু ইংরাজি মাসকাবার হয়্যা গেল সাতদিন, উয়ার দেখা নাই। উ না এল্যো, তোর লসকাখানির কথাও বুলতে লারছি। যে হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, ও একটা ভাত টিপলে বুঁইতে পারে, ফুটা হইচে কি না হইচে। তোর লসকাখানি একবার দেখ্যেই আমি বুঁইতে পেরেচি, জবর লজর-কাড়ানি লসকা হইচে। কিন্তু বুলব কাকে?'

অই, ওস্তাদের কথাই, বুকের টানায় সুখ বুনা করে। উয়ার নাম

অভয় খান ওস্তাদ। কিন্তু লসকাদার কেবল লসকা আঁকা করে বসে থাকতে পারে না। উ ত তোমার পেটে ছাঁ ধরার প্রথম লক্ষণ। ইয়ার পরে বিস্তর কাজ। সেই কাজে হাত দেবার আগে, ঈশ্বরদাসের হুকুম চাই। হঁ, ওস্তাদের নজর যখন কাড়তে পেরেছে, ঈশ্বরদাসের জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু ঈশ্বরদাসই যে ওস্তাদের ঘরকে আসছে নাই। পাঁচু ওস্তাদকে বলেছিল, 'আপনি যদি বলেন আঁজ্ঞা, ঈশ্বরবাবুকে আমি বুলতে পাবি।'

না, উটি হবেক নাই। ক্যানে, ঈশ্বরদাসের মনে নাই? বুলতে হবেক ক্যানে? ডাক করাতে হবেক ক্যানে?

ওস্তাদের ঘরকে আসা, টাকা দেওয়া কি তোমার কাজ না? তোমার আর দশটা কাজ কি বন্ধ হয়ে আছে? শাড়ি ছাপাবার কাবখানা, সুতা পাখোয়ানের কারখানা, গদীর বেচাকেনা, সব কি অচল হয়ে গিয়েছে? হঁ, তুমি বিষ্টুপুরে না থাকতে, কলকাতা বোম্বাই যেতে, সেটা আলাদা কথা। তাও, ঈশ্ববদাস যখন বাইরে যায়, কার্তিকবাবু বা গদীর লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে অনেকবার। অল্পস্বল্প জ্বরজ্বালা নিয়েও তুমি ওস্তাদের ঘরকে এসেছো। আব এদানি কয়েক মাস তোমার দিন তারিখের ঠিক থাকে না। কথায় কথায় টাকার টানাটানির কথা বলো। তোমার মতলব কী? অভয় খান সেই লোক না, তোমাকে খবর দিয়ে ডাকা করাবে। তোমার বড় গদী আছে, টাকা আছে, ওস্তাদের মান নাই?

ইদিকে দেখ, ওস্তাদের ঘর থেকে ফেরার সময়, পাঁচু সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত ভুলে গিয়েছে। এখন তার যাতায়াতের পথ আঁকুড় বনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু আঁকুড়্যা বীটদের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে যাতায়াত করে না। বনের আড়াল আবডাল দিয়ে, হিঞ্চেগোড়ার

দূর থেকে, বাঁটদের দরজার বাগে লুকিয়ে তাকায়। সকালে যাবার সময়, ছোটঠাউরদাকে পূজা সেরে ফিরতে দেখে। বিকালে যাবার সময়, ছোটঠাউরদা শীতল দিয়ে ফেরে। পাঁচু দূর থেকে দেখে চলে যায়। হঁ, পরশু টুকিকেও সকালের দিকে দেখেছিল। ছোটঠাউরদার পিছন পিছন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কী যেন বলা-কওয়া করেছিল, পাঁচু শুনতে পায়নি।

হঁ, বাঁটের ঘরণী তুমি, সোনার পিতিমে। কোন পদ্দারে গড়েছে তোমাকে! কে সেই বিশ্বকর্মা ঠাকুর, পাঁচু জানে নাই। কোন আগুনে গলিয়ে, কোন যন্ত্রে পিটিয়ে কুঁদে পিতিমেখানি বানাইচে, পাঁচু বুঁইতে লারে। কিন্তু ই কি খাচান দড়ি খাটালে তুমি, পাঁচুর পেট লরাজের টানায়, বুকের ঘরে বুনা হয়ে যায়। জমিন বাঁধন কর, এখন ইদিক উদিক করতে পারি না। গরীব লসকাদার আমি, আমাকে কেন ডাকো। তোমাকে দর্শন করবার জন্যে গোটা বিষ্টুপুর চোখ মেলে আছে। আর ব্যায়রামে ধরলেক পাঁচু কীতকে?

হঁ, অসুখ বটে। পাঁচুর জীবনে নতুন অসুখ। ক্যানে? না, সুখের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, এ বড় অসুখ। তবে অই হে, লুকিয়ে ফেবো, দূব থেকে দেখ, সাঁজবেলার পরে বাউরিপাড়ায় গোগার দরজায় ছোটঠাউরদার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। তখন বুলিগুলান শোনো, 'শালা, তু আমাকে কী ভেবেচু? আমি মেয়্যাছেল্যার দালাল হইচি? আমাকে রোজকে রোজ এক টাকা দু টাকা ঘুষ দিয়া করবেক, আর পায়ে গড় কর্যে বুলবে, উয়ার সঙ্গে কি দেখা হয় নাই ঠাউরকত্তা। আপনার ভিক্ষাভাইটিকে আর দেখি নাই, নাই যে? উকি দেশছাড়া হয়্যা গেলে গা? অঁ কেনে র‍্যা শালা, আমি উসব শুনবক ক্যানে? তোকে শালা এত কর‍্যা বুঝাই দিলম, তোর বিশ্বাস নাই, আমি

বুলচি, শালা তোর পাপ লাগবেক, পাপ লাগবেক। তু আমাকে কী বুঝাতে চাইচু? ঘরের বউ ছাড়া, আন মাগীর চিন্তা নাই তোর? শালা কেঁচা বিঁধা করো্যে তোর মদন কাটা করবক আমি। তু আমাকে পাপী করচু, অঁ?'

পাঁচু চেলার নেশা করবে কি, ছোটঠাউরদার কথা শুনে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না। হাত জোড় করে বলে, 'অই ছোটঠাউরদা, মনটা কদিন ভাল নাই গ।'

'উদিন শালা তোর মনটা ভাল ছিল, অঁ? ছোটঠাউরদার এক কথা, তু শালা অদধপুতা। কী বুঝবি? উয়ার ঘর খালি, বুক খালি, তোর জন্যে সকালে বিকলে ইবাগে উবাগে ছুট্যে বেড়াইচে, আর তু শালার মন ভাল নাই? উদিন তোর মন ভাল ছিল, তারপর থেক্যা তোর মন ভাল নাই ক্যানে আমাকে বল।'

না, উ কথাটা পাঁচু বলতে পারে না। উয়ার মধ্যে একটা কী আছে, পাঁচুর ধারণা উ সব কথা পাঁচ কান করতে নাই। করলে কাজ বিফলে যায়। সে বলে, 'মন ক্যানে খারাপ, সে কথা কী বুলব গ ছোটঠাউরদা। গরীবের ঘর, বুঁইতে পার নাই?'

'শালা, আমার সঙ্গে ঘুগিগিরি করচু?' ছোটঠাউরদার সেই এক কথা, 'তোর ঘরকে এখন ভাল কাজ চলচে, আমি জানি নাই? তু শালা আমাকে বুলতে চাইচু, তোর ঘরে একাদশী চলচে? সত্যি কথা বুলা কর, তু ভয় পেয়েচু। ভয়ে শালা তু উ বাগে যাতাত বন্ধ করেচু। বুলা কর, সত্যি কী না?'

ছোটঠাউরদার রোজ এক কথা, পাঁচুরও রোজ এক জবাব। ভয়ের কথাটা ছোটঠাউরদা রোজ একবার বলে। পাঁচু রোজই কেমন থমকিয়ে যায়। ভয়? ডর? টুকুস কি লাগে নাই? যোগেনের বুকের

ছাতি, কোঁদা মাংস দশাশয়ী চেহারাটা কি চোখের সামনে ভেসে ওঠে না ? হঁ ওঠে, কিন্তু পাঁচুর প্রাণে ডর নাই। ক্যানে ? না, টুকির জোড়া ফল বুকের পাটাখানি আবও শক্ত মনে হয়। তা ছাড়া, যোগেনের যতো বড় চেহারাই হোক, উয়াকে ডর লাগে না। পাঁচুর গায়ে মানুষের রক্ত, সেই রক্তে বড় জ্বালা আর ঘৃণা ধরিয়ে বেখেছে যোগেন বীট। পাঁচুকে দেখলেই সে বুকে উরতে চাপড় মেরে হাঁকোড় দেয়। দাঁতে দাঁত পিষে, নাম না নিয়ে গালিগালাজ করে। উয়ার কারণ আলাদা। হঁ, ই সত্যি বটে, যোগেনের বউকে নিয়ে উয়ার সঙ্গে মারা-মারির কথা ভাবা যায় না। অভয় খান ওস্তাদের চেলা, পাঁচু লস্কা-দারের একটা মান ইজ্জৎ আছে। সে ছোটঠাউরের পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'ই তোমার পা ছুঁয়া কব্যে বলচি, আমি ডর করি নাই।'

'মিছা কথা কইচ ত।' ছোটঠাউরদা পা ছাড়িয়ে নেয়।

'না, মিছা কথা কই নাই। পাঁচু কীত কারোক্কে ডরায় নাই।'

'আরে শালা, তু আমার কথাটা শুনচু নাই, নাই কি র‍্যা ? বুলচি উয়ার ঘর খালি। উয়ার ভাতার অখন চাষবাস দেখতে গেঁইচে। সেখানকেই রইচে। বিষ্টি লেম্যেচে, দেখচু নাই কি ?'

হঁ, দেখছে বই কি। কদিন ধরেই থেকে থেকে বর্ষার ঝারি নামছে। পাষাণ লড়িতে বাতি রেখে, তাঁত গরম রাখতে হচ্ছে। মাকু নড়তে চায় না, লরাজে স্যাঁতস্যাঁতে চিটা চিটা ভাব। একই অবস্থা খাচান দড়ি আর দক্তির। পাঁচুকে বৃষ্টির কথা বলার কী আছে ? বেশি বৃষ্টি হলেই রেশম সুতো মোটা হয়ে যায়। হঁ, উয়াদের তখন ঠাণ্ডা লাগে। বাতি জ্বেলে পাষাণ লড়িতে রেখে গরম রাখতে হয়। যোগেন বীট কোতুলপুরে গিয়েছে, সে-কথাও ছোটঠাউরদা কদিন ধরে শোনাচ্ছে। বৃষ্টি নেমেছে। চাষের এই মরসুমে যোগেন এখন প্রায়ই কোতুলপুরে

যায়, সেখানে কয়েকদিন থাকে, আবার আসে, আবার যায়।

হঁ, টুকির ঘর খালি। কিন্তু পাঁচুর মনের কথাটা কে বুঝবে? টুকির ঘরের পিড়ায় গিয়ে বসতে কি ইচ্ছে করে না? তিন দিন ধরে যে খালি মনে মনে বলছে, কাটরা মেমায়, না ছাগল মেমায়? একজন কেউ আর একজনকে নিশ্চয়ই ডাকছে। কিন্তু পাঁচু যে লসকাদার। তার চাষের মাঠখানি আকাশ বাগে মুখ করে আছে। মেঘ ডাকে না, বৃষ্টি নামে না। তার মন খারাপের কথা তোমরা বুঝ নাই গ, বুঝ নাই।

চারদিনের দিন বিকালে বুঝাবুঝি হলো। পাঁচু ওস্তাদের ঘরের দরজায়, কালো চকচকে জুতো জোড়া দেখেই চিনতে পারলো, ঈশ্বর-দাস এসেছে। সে দরজা থেকে ঘরের ভিতর বাগে উঁকি মেরে দেখলো, ওস্তাদ লসকাখানি ঈশ্বরদাসকে দেখাচ্ছে, 'হঁ, আমি বুলচি, ই একে-বারে লতুন রকমের, হ্যাঁ এরকম লসকা আমি দেখি নাই। বেশ লসকা। বালুচরের নাম রাখবে।'

ঈশ্বরদাসের বাংলা কথায় পুবা ধরন, 'আপনি যখন বলছেন, পাঁচুকে কাজ করতে বলুন।'

অই, অই দেখ, আরতির বাজনা বাজছে। পাঁচুর বুকের মধ্যে নাচ লেগেছে। নিজের পায়ের ময়লা জুতা জোড়াটি বাইরে খুলে রেখে, ঘরের ভিতরে ঢুকলো। ওস্তাদ চোখ তুলে তাকালো। ঈশ্বরদাসও পিছন ফিরে দেখলো। বললো, 'এই তো, পাঁচু এসেছে।'

'তু এয়েচু র‍্যা?' ওস্তাদের মাড়ি বেরিয়ে পড়লো, নতুন তামা রং মুখে অনেকগুলো ভাঁজ খেলে গেল, 'আয় আয়। ঈশ্বরকে আমি বুল্যেচি। তু এখন কাজ শুরু কর।'

পাঁচু কোমর ভেঙে নীচু হয়ে, ঈশ্বরদাসের উদ্দেশ্যে দু হাত কপালে ঠেকালো তারপরে তালাইয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, হাত বাড়িয়ে ওস্তাদের পায়ে হাত দিয়ে কপালে ছোঁয়ালো। ওস্তাদ উয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, লসকাখানি সরিয়ে রেখে বললো, 'আমার ঘরকেই ত কাজ করবি, ইটা ইখানকেই থাকুক।'

প্াঁচু লসকার কাজ নিজের ঘরে করে না। ওস্তাদের ঘরের বাইবে পাকা পিড়ায় বসে, ঘর কাটা কাগজে লসকাখানি বড় করে আকে। ইটি বড় হিসাবের কাজ। জায়গা বেশি দরকার, আলো বেশি দরকার। পাঞ্চিং বাকসায় পাটা আর জালিপাটার কাজও এখানেই করে। তারপরে সব বয়ে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। সেখানে তখন তাঁতের সঙ্গে আর মেসিনে জোড়ার কাজ হয়।

ঈশ্বরদাসের গায়ে সাদা খাদির পাতলা পাঞ্জাবি, খাদির ধুতি। মাথায় টাক, ফরসা রঙ, ছোট ছোট চোখের তারা বড় ঘুরপাক খায়। বয়স চল্লিশের কম। বললো, 'হ্যাঁ, নকশাটা নতুন বকমের বটে। বাজারে যদি ধরে তা হলেই ভাল।'

'ধরবেক গ ঈশ্বর, ধরবেক, আমি বুলচি।' ওস্তাদ হাত তুলে বললো, 'লসকায় আমার নজর ফাঁক যায় নাই। পাঁচুর কত লসকা আমি ছিঁড়া ফ্যালাই দিইচি। কিন্তু ইটি হাতে করেই আমার চখ জুড়াই গেল, উয়ার আগের দুটা লসকার থেক্যাও, ই লসকাটি ভাল হইচে।'

ঈশ্বরদাস বললো, 'বলছেন? আমার কিন্তু পাঁচুর তাজমহলের নকশাটাই বেশি ভাল লেগেছিল। ওটার এখনো চাহিদা আছে। তবে, এটাও দেখা যাক কেমন হয়। কিন্তু আসলে কী হয়েছে জানেন অভয়বাবু, আজকালকার লোক এত টাকা দামের শাড়ি কাপড় আর

কিনতে চায় না। শাড়ির দাম শুনলেই সব ভেগে পড়ে। সবাই সস্ত
জিনিস চায়।'

'কিন্তু সস্তাও চাইবেক আবার নজর কাড়ানিও চাইবেক।
ওস্তাদ মাড়ি দেখিয়ে হাসলো, 'উ দুটি ত এক সঙ্গে হয় না ঈশ্বর।'

ঈশ্বরদাস বললো, 'হ্যাঁ, তাও হচ্ছে। এই বিষ্টুপুরেই হচ্ছে
আজকাল অল্প দামের রেশমের ছাপা শাড়ির খুব কদর। নাইলন
টেরিলিনে নকশা তোলা কাপড়েরও চাহিদা কিছু কম না। তবে হ্যাঁ
বালুচরীর কথা আলাদা। এখনো তার কদর আছে বড় বড় শহরে
বিশেষ বোমবের মার্কেটে। বালুচরীর দিল্লির মার্কেটও খারাপ না
ওসব জায়গায় লোকের শখও আছে, শখ মেটাবার পয়সাও আছে।
বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি তা হলে এখন চলি অভয়বাবু
আপনার টাকাটা ঠিক করে রেখেছেন তো?'

'রেখেছি ভাই।' ওস্তাদ মুখ তুলে বললো, 'তুমি আসচ নাই
দেখ্যে কদিন বড় চিন্তা হইচিল।'

ঈশ্বরদাস বললো, 'না না, চিন্তা করবেন না। কাজে কর্মে আটকে
পড়ি, সময় মত আসা হয় না।'

'মহাদেববাবু ভাল আচেন ত?' ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলো।

ঈশ্বরদাস বললো, 'আছেন, তবে বেশি ঘরের বাইরে যান না
নদীতে চান করতে যেতে চান, যেতে দিই না। বয়স হয়েছে, কখন
কোথায় পড়ে-টড়ে যাবেন। চলি এখন।'

'হুঁ, আসগা ভাই।'

ওস্তাদ ঈশ্বরদাসকে ভাই বলে লাতী হিসাবে। চন্দরদাসবাবুর
লাতী, সেই হিসাবে। ক্যানে? না, মহাদেব দাস ওস্তাদের থেকে
সামান্য দু-চার বছরের ছোট হলেও তাকে কাকা বলে ডাকা করে

সে-সুবাদেও, ঈশ্বরদাস ওস্তাদের নাতি। ঈশ্বরদাস ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে পাঁচুর দিকে ফিরে বললো, 'কিন্তু পাঁচু, টাকা পয়সার জন্য বেশি তাগাদা দেবে না। তোমার খাঁই বড় বেশি।'

'আঁজ্ঞা কী যে বুলেন।' পাঁচুর বুকের কাছে দু-হাত জোড়া, গোঁফের ফাঁকে সলজ্জ হাসি, চোখের নজর একবার ওস্তাদের দিকে ঘুরে আবার ঈশ্বরদাসের দিকে, 'আমি আঁজ্ঞা গরীব মানুষ, আমার খাঁই বেশি হবেক ক্যান?'

ঈশ্বরদাসও হাসলো, 'কাজের আগেই তোমার সব টাকা আগাম নেওয়া হয়ে যায়। নিজের হাতখরচটাও বাড়িয়ে ফেলেছ।'

'হুঁ। টুকুস সমজে চল্‌ বাবা।' ওস্তাদ বললো, 'যা, ঈশ্বরকে রাস্তায় আগাই দিয়া আয়। আর বুঁইলে ঈশ্বর, পেথম খরচা বাবদ পাঁচুকে কাল পরশু কিছু টাকা দিয়া করবেক।'

ঈশ্বরদাস দরজার দিকে এগিয়ে গেল, 'দেব।'

অই, লাচের তালে কাটি পড়ছে বুকের ঢাকে। হঁ, তিন সাল পার হয়ে গিয়েছে, তারপরে আবার একখানি লসকা। পাঁচু ঈশ্বরদাসের পিছনে যেতে যেতে, একবার পাকা কোঠা ঘরের দিকে তাকালো। বউদিদিরা কোথাকে গেল। টুকুস চা খেতে হবেক।···চা? এখন চা খাবে কী হে পাঁচু? বাউরিপাড়ায় সুবলির দরজায় যাবেক নাই?

ঈশ্বরদাস রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো। একটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়েছিল। বোঝা গেল, উটিতে চেপেই ঈশ্বরদাস এসেছে। সে রিকশায় উঠে বললো, 'তোমার ওস্তাদের সামনে আর বললাম না, কিন্তু তুমি বুঝতে পেরেছ, আমি কী বলতে চাই। সবাই বলে, দিন পাঁচ টাকার মদ খাও তুমি।'

'আঁজ্ঞা, না আঁজ্ঞা।' পাঁচু যেন আনখা খানায় পড়ে গেল।

ঈশ্বরদাস হাত তুলা করে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব জানি। ও বিষগুলো খাও কেন? ওই টাকায় দুধ ছানা খেতে পার না? চল রে।' রিকশাওয়ালাকে হুকুম দিল।

পাঁচু কিছু বলবার আগেই রিকশা চলতে আরম্ভ করলো। কুন শালারা ইসব কথা ঈশ্বরদাসের কানে গুঁজা করে? দিন পাঁচ টাকার চেলা গিলা করলে, আমার অত বড় সংসারটা খেয়ে পরে চলতো? হুঁ, এক আধ দিন হয়ে যায়। তাও একা না। যেমন চারদিন আগে, লসকাখানি ওস্তাদের নজর কাড়া করেছিল, সেইদিন ছোটঠাউরদা আর সে চার টাকার চেলা গিলা করেছিল। আজও কি গিলা হবে না? বুকে নাচের তাল বাজছে, বাউরিপাড়া এখনই টানছে। ঈশ্বর-দাসের হুকুম মিলেছে, লসকা উয়ারও পছন্দ হয়েছে। কুথাক গ ছোটঠাউরদা, আজ তোমার ভিক্ষাভাইয়ের প্রাণখানি তাঁতের মতো গোছগাছ সাজানো। ফাঁক ফাটল নাই। খালি বুনা কর, আর বুনা কর।

পাঁচু ছুটে গিয়ে ঢুকলো ওস্তাদের ঘরকে। ওস্তাদ তখন ছিগরেট ধরিয়ে সামনের জানালার আতা গাছের দিকে তাকিয়েছিল। পাঁচুর পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো। বললো, 'পাঁচু বটে? আমি ভাবলম তু ঈশ্বরের সঙ্গে চল্যে গেঁইছু।'

'তা ক্যানে যাব আঁজ্ঞা। আমি ঈশ্বরবাবুকে রিকশায় উঠাই দিয়া এল্যাম।'

'বেশ করেছু। শুন, কাল পরশু টাকা লিয়া গ্রাপ কাগজ কিনা কর্যে, কাজটা শুরু কর্যা দে।' ওস্তাদ হা করে ছিগরেটের ধোঁয়া ছাড়লো, আর উয়ার কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে এল। ওস্তাদ জিভ দিয়ে নাল চেটে নিয়ে বললো, 'হুঁ, ঈশ্বরদাসদের এখন হঁইচে কি, সাবেকি

লসকাবানির কাজ উয়ারা আর চায় না। লোকেও উসব চায় নাই। লোকের মন রাখা করে, উয়ারা এখন শস্তা আর লজরকাড়ানি মাল বাজারে বিচা করত্যে চায়। ঈশ্বর আমাকে বুল্যে গেলেক কি, তোর ঘরকেই খালি বালুচরী বুনা হইচে, আর কোথাকেও লয়। উটি হয়্যা গেল্যে, তোর লসকায় শাড়ি বুনা করবেক, তারপরে আর করবেক নাই। নেহাত নতুন অর্ডার পেল্যে, আবার বুনা করাইতে পারে, লইলে বালুচরীগুলান সব মিউজামে রাখা করবেক।'

হুঁ, পাঁচু উ মিউজামের কথা ওস্তাদের কাছেই শুনেছে। কলকাতা আর বোমবাই মিউজামে, বাদশাহী আমলের বালুচরীর সঙ্গে, ওস্তাদের বালুচরীও রাখা আছে। বানিদার পাঁচু বটে। কিন্তু লসকা যার, পাটা আর জালিপাটায় যে লসকা তোলে, খাড়ির ঘর হিসাব করে, সে-ই আসল। পাঁচুর বুকের বাজনায় টুকুস বেতাল বাজে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কী মনে লয় আঁজ্ঞা, আমার লসকার শাড়ি চলবেক নাই, নাই কি?'

'হুঁ, চলবেক র‍্যা পাঁচু, আমার মনে ল্যায় তোর এই লসকাটা ভাল চলবেক।' ওস্তাদ বললো, 'তু আমনার মনে কাজ করে যা, উ সব ঈশ্বরদের কথা ভাবিস নাই। উয়ারা বাজারের চালে চলে, টাকা চিনে, লসকা বুঝে নাই বালুচরও বুঝে নাই। তু আমনার মনে কাজ করে যা।'

অই, পাঁচু আর কিছু শুনতে চায় না। ওস্তাদের ভরসা পেয়ে বেতাল প্রাণে আবার তাল লাগে। ওস্তাদের বিছানার ওপরে রাখা লসকাটির দিকে একবার দেখে বললো, 'আমি তা'লে এখন যাই আঁজ্ঞা?'

'হুঁ, আয়গা।' ওস্তাদের মুখখানা যেন ছিগরেটের ধোঁয়ায় ঢাকা

পড়ে গিয়েছে।

পাঁচু বাইরে এলো। না, এখন আর কোনোদিকে নজর নাই। এখন চায়ের তৃষ্ণা নাই।

পাঁচু আঁকুড় বনের পথ ধরলো। টুকুস আগেও বৃষ্টি ছিল না। এখন নুনগুড়ি ঝরছে। সাঁজবেলা ঘনিয়ে আসবার আগেই আকাশে জমাট মেঘ। আঁকুড় বন যেন আন্ধার। ছোটঠাউরদার শীতল দেওয়া সারা হয়ে গিয়েছে কী? আঁকুড়্যা বীটদের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে? হঁ, ই দ্যাখ, আঁকুড়্যাদের ইদিককার দরজাটি খোলা। পাঁচুর বুকে এখন দগর দিচ্ছে। কাটরা মেমায়, না ছাগল মেমায় হে? পাঁচু দরজার কাছ থেকে নড়তে পারছে না। উঁকি দিবেক কি? আনখা কেউ দেখে ফেলবে নাই তো?

পাঁচু জানে, ই উত্তর বাগে উঠোন, উঠানের এক পাশে গোয়াল আর এক পাশে ইদারা, দক্ষিণ ঘেঁষে দোতলা কোঠা ঘর। আরও দক্ষিণে আঁকুড়্যাদের তাঁত ঘর। জমিও আছে খানিকটা। খান কয়েক আম জাম পেয়ারা গাছ আছে। উখানকে উয়াদের সীসাবন তাশন হয়। উদিকটা সদর, ইদিকটা ঘরের মফস্বল। ভিতর বাড়ি বলতে পারো। হঁ, বুকে ঢাকেব দগর বাজছে গ। পাঁচু আনখা চিৎকার দিল, ছোটঠাউরদা, অ ছোটঠাউরদা।

চিৎকারের পরেই যেন গোটা আঁকুড় বন ঝোপ-ঝাড় পাথর বনে গেল। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। নুনগুড়ি বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দও যেন পাতায় শব্দ করছে না। পাঁচুর নিজের চিৎকার, নিজেরই কানে বাজছে, ছোটঠাউরদা ছোটঠাউরদা!...আর বুকে যেন একশো ঢাকের দগর দিচ্ছে। দেখতে দেখতে গা ঘামতে শুরু করলো। খোলা

দরজাটার দিকে তাকিয়ে, পাঁচুর চোখ ছুটো হাঁড়িকাঠ দেখতে পেল, আর নিজের মনেই বললো, অই শালা তু করেচু কী ? সে তাড়াতাড়ি উত্তর বাগে পা বাড়ালো। আর তখনই খোলা দরজার কাছ থেকে টুকির স্বর শোনা গেল, 'অই গ লসকাদার, চল্যে যাইচ যে ?'

অ ? পাঁচু ফিরে তাকালো। ই গ্যাখ ছায়া আন্ধারে সোনার অঙ্গ জ্বলজ্বল করে। বাঁটের ঘরনীর পা চৌকাঠের বাইরে। পাঁচু আবার আওয়াজ করলো, অ ?

টুকির আর এক পা চৌকাঠের বাইরে। কে মেমায় ? কে মেমায় ? টুকি বললো, 'দাঁড়িয়ে রইল্যে যে ? ভিতর বাগে আস।'

পাঁচুর গলায় রা নেই, নড়তে পারছে না। কী করবে ? আসবেক কি যাবেক ? টুকি আবার বললো, 'অই গ, হাত ধর্যে লিয়ে আসতে হবেক কি ?'

পাঁচু কথা বলতে গেল, যেন স্বর ভেঙেচুরে গেল, 'হঁ ইয়া, অই ছোটঠাউরদাকে ডাকচিলম।'

'ঠাউরকত্তা ত কখন শীতল দিয়া চল্যে গেঁইচে, এখন কি সে থাকে ?' টুকির স্বরে জিগির নাই, তবু যেন টুকুস ঠিনঠিনিয়ে বেজে উঠলো, 'তুমি কি ঠাউরকত্তার খোজে আইচিলে ? আর কারোকেও চাও নাই, নাই কি ?'

পাঁচুর গলায় আবার আওয়াজ হলো, অ ?

'অই কী বুলচ গ লসকাদার ?' টুকি যেন আরও এক পা আগে বাড়লো, 'ই সাঁজবেলায় হিঞ্চেগোড়ায় কে ঘাটকে আসবেক কি না আসবেক, কিছু ঠিক নাই। ভিতর বাগে আস।'

কে মেমায়, কে মেমায় ? পাঁচু দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অই, বুকে বড় দগর দিচ্ছে হে। একশো ঢাকের দগর। সারা গা জামা

ঘামে ভিজা যাইচে। টুকি ভিতর বাগে গেল। পাঁচু দরজার চৌকাঠে পা রেখে একবার দাঁড়ালো। টুকি কয়েক পা দূরে আবার পিছন ফিরে তাকালো। হুঁ, উঠানের ছায়া আন্ধারেও টুকির সোনার অঙ্গ বিজলায়। গলা নামিয়ে ডাকলো, 'আস।'

পাঁচু এগিয়ে গেল। কোথাও মানুষজন দেখা যায় না। বাইরে কোথাও আলো নেই। উঁচু পিড়ার ওপরে, খোলা দরজার ভিতর বাগে টিমটিম আলোর ইশারা। পাঁচু টুকির পিছন পিছন কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পিড়ার ওপরে উঠলো। টুকি ঘরের ভিতর ঢুকে ডাইনে বাঁয়ে তাকা করলো। হাত তুলে, চুড়ি বাজিয়ে, হাতছানি দিয়া করলো। হুঁ, কে মেমায়, কে মেমায়? পাঁচু ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘর না, সাবেকি দালান। দালানের এক কোণে একখানি টেমি জ্বলছে। যাকে বলে চৌকো লণ্ঠন। উটি বিষ্টুপুরের ঘর ঘরকে মিলে, এখান থেকে দেশে দেশে চালান যায়।

দালানের দুদিকে দুখানি ঘর, দরজা খোলা। লোক নাই একটাও। পাঁচু দেখলো, টুকি দালানের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ির দরজায় পা বাড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালো। সিঁড়ির দরজার ভিতর অন্ধকার, সুড়ংয়ের মতো। সিঁড়ির দরজা ছাড়িয়ে উঠেছে টুকির মাথা। হুঁ, উয়ার মাথায় এখন ঘোমটা নাই। মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে যেতে ইশারা করলো। পাঁচুর অচেনা ঘর না। এককালে এসেছে, অনেক কাল আগে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে, নীচের মতোই দালান আর দুটো ঘর। সে অন্ধকার সিঁড়িতে টুকির কাছে এগিয়ে গেল।

টুকির শাড়ির খসখস শব্দ, হাতের চুড়িতে ঝনৎকার, অন্ধকারে উয়ার ছায়ার মতো শরীরটি সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে বারে বারে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। পাঁচুর চোখে

অন্ধকারে জোনাকির মতো টুকির মুখ ভেসে উঠছে। কে মেমায়? কে মেমায়?…পাঁচু টুকির পিছন পিছন সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলো। হঁ, উপরের দালানে তাঁতঘরের মতো গোল চিমনির হ্যারিকেন জ্বলছে। গোটা দালানখানি যেন দিনের আলোর মতো উজলাইচে।

টুকি সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে, দরজায় পিঠ দিয়ে, পাঁচুর দিকে তাকালো। অই, কান টানা কালো চোখের তারায় কী ঘোর না মন্তর। উয়ার তেল চকচকে খোঁপা মাথার পিছন ছাড়িয়ে ফুলের মতো ফুটে আছে। গায়ে এখন জামা নাই। শাদা জমিতে লাল ডোরা শাড়ি। কপালে টকটকে লাল টিপ, সিঁথেয় যেন আগুনের শিখা, পায়ে আলতা, দু পায়ের দুই মাঝের আঙুলে রূপোর আঙোট চিকচিক করছে। হঁ, হাতে শাঁখা, নোয়া চুড়ি, ডানায় অনন্ত। টুকি কি মুখে কিছু লাগা করেচে, নাকি মাথার চুলে গন্ধ তেল মাখা করেচে? বড় সোন্দর এক গন্ধ দালানে ছড়াই যাইচে।

'হঁ, ঘেম্যে জল হয়্যা গেঁইচ যে?' টুকি বলতে বলতে দরজার কাছ থেকে সরে, হ্যারিকেনটি হাতে তুলে নিল, 'ভিতর বাগে আস।'

পাঁচু দেখলো, টুকির শাদা জমিন লাল ডোরা, শাদা মাটা তাঁতের শাড়ির আঁচল দালানের মেঝেয় লুটায়। হ্যারিকেন হাতে সে ডান দিকের ঘরের ভিতরে ঢোকে। ভিতর থেকে পিছন ফিরে আবার পাঁচুর দিকে তাকায়। কে মেমায়, কে মেমায়? পাঁচু পায়ের জুতো জোড়া খুললো। হঁ, ই ঘরকে উপরতলায় কেউ কখনো জুতা পায়ে ঢোকে না। বাঁ দিকের ঘরে, কয়েক ধাপ সিঁড়ির উপরে, পুব বাগে আর একখানি ছোট কুঠরি আছে। সেই কুঠরিতে নারায়ণ আছেন। ছোটঠাউরদা রোজ উ কুঠরিতে সকালে নারায়ণের পূজা করে, বিকালে শীতল দিয়া করে।

পাঁচু ঘরের ভিতর ঢুকলো। টুকি সরে গিয়ে দক্ষিণের একমাত্র জানালাটি খুলে দিল। হঁ, ই সেই পুরনো খাট, বংশীলাল বাঁট থাকতো। যোগেনের কত্তাদাদা। বিষ্টুপুরের বালুচরের প্রথম লসকা-দার। খাটের ওপর চাটাই তোষকের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। উয়াব উপরে একখান সবুজ রঙের চাদর পাতা। উত্তরের শিয়রে জোড়া বালিশ। যেমনটি বিশ পঁচিশ বছর আগে দেখেছিল, ঠিক তেমনটিই যেন আছে। ই ঘরকে এখন কে থাকে ? যোগেন আর টুকি ?

'বসবেক নাই, নাই কি গ ?' টুকি জানালার কাছ থেকে সরে এসে বললো।

পাঁচু তাকালো টুকির দিকে। অই, সোনার পিতিমেখানি যেন শাড়ির ভিতর বাগে পষ্ট বিজলাইছে। পাঁচু চোখ ফিরাতে চায়, পারে না। টুকি পায়ে পায়ে সামনে এলো, 'ঠাউরকত্তাকে ডাক দিয়া চল্যে যাইচিলে যে ? আর কারোক্কে ডাকতে মন চায় নাই ? আমি যে এত্ত ডাকা করি, সাড়া দেই নাই ক্যানে গ ?'

হঁ, টুকি ক্যানে ডাকা করে ? ছোটঠাউরদার কথা মনে পড়ে যায়। শাস্তরের কথা, পাপ লাগবেক, তোর পাপ লাগবেক। অই, ই কি জীবনের বিচার ধর্ম হে ? একশো ঢাকের দগর যেন দূরে নদীর ধারকে চলে যায়, এখন কেবল মাটি কাঁপে। ই ছ্যাখ, টুকি গায়ের কাছকে এসে দাঁড়ায়, উয়ার শাড়ি শরীর না নিশ্বাস থেকে, কে জানে কী এক সুবাস যেন ছড়াই যাইচে। টুকি লুটিয়ে পড়া আঁচল তুলে নিল হাতে, 'হঁ, এত ঘেম্যে যাইচ কানে ?' পাঁচুর গালে আচল চেপে ধরলো।

কে মেমায়, কে মেমায় ? টুকির আঁচল গালে চাপা হাতখানি পাঁচু ধরলো। হঁ, পিতিমের হাতখানি ঠাণ্ডা। পিতিমে ঘামে না, উয়ার

গায়ে ঘামতেল মাখা। তবু স্থাখ, হাতখানি ভিজা ভিজা। কপালে চোখের কোলে নাকের ডগায় ঘাম চিকচিক করে। পাঁচু একা ঘামে না। হঁ, ই স্থাখ পিতিমের বুকের ঘামে শাড়ি ভিজে লেপটে গেইচে। তন দুখানি বর্ষার জলে ভিজা পাকা রঙ ধরা বেলের মতো দেখাইচে। কিন্তু উয়ার নিশ্বাসে যেন পাঁচুর আঁতখানি আতুর-পাতুর করে, পুড়ে যায়।

টুকি পাঁচুর হাতসুদ্ধ আঁচল চেপে ধরে উয়ার ঘামে ভেজা কপালে, 'বসবেক নাই কি? কথা বুলবেক নাই?'

পাঁচু টুকির পায়ের কাছে, পাকা মেঝেয় বসে পড়লো। 'অই, ই স্থাখ, টুকির হাত থেকে আনখা আঁচল খসে পড়ে, ঝটস্থে পা সরিয়ে নিয়ে, সামনে বসে 'ই কি গ লসকাদার, মাটিতে বসলে ক্যানে? খাটে বসবেক নাই?'

মাটিতে ভাল। পাঁচু মুখ ফিরিয়ে একবার খাটের দিকে দেখলো, 'হঁ, উ খাটে তোমার কত্তাদাদাশউড় থাকা করত। ই ঘরকে কত আইচি, উসব অনেক বছর আগের কথা।'

টুকির শাদা জমি লাল ডোরা তাঁতের শাড়িখানি ছড়িয়ে পড়ে যেন জলের মতো ঢেউ দিচ্ছে, তার মাঝখানে উয়াকে দেখাইচে রাজহাঁসটি। সোনার সরু হারখানি গায়ের রঙে মিশে, ঘামে আঁকা-বাঁকা, বুকের লাল পাড়ের আড়ালে নেমেছে। হঁ, উয়ার কানটানা চোখের তারায় ভোমরা-কালো ঝিলিক। সুখ সাধ আহ্লাদ, কী যে উয়ার মুখে উজলায়, বুঝা যায় না। ঝকঝকে শাদা দাঁতের হাসিতে হীরা জ্বলে, না মাণিক জ্বলে? বললো, 'জানি গ, উ কথা অনেক শুনা হইচে।'

'কে বুললো?' পাঁচুর ঘোর লাগা চোখ। আনমনা কথা।

টুকি বললো, 'ক্যান, ই ঘরের লোকের মুখেই শুনেচি।'

ই ঘরের লোক, যোগেন বীট। টুকি আবার বললো, 'শুনি বটে, বিশ্বাস হয় না তুমি ই ঘরকে আইত্যে খেলত্যে, উঠা-বসা করত্যে। ই চখে কুনদিন দেখা হয় নাই। ক্যানে গ লসকাদার। ই ঘরকে তোমার যাতাত নাই ক্যানে? কি আমার কপালের দোষ?'

হঁ, টুকির ঝিলিক হানা চোখে কেমন ছায়া পড়ে। পাঁচু বললো, 'তোমার কপালের দোষ ক্যানে হবেক? আমার উপর যোগেনের বড় রাগ, উ আমাকে দেখত্যে লারে।'

'আর ই ঘরের লোক বুল্যে, তুমি উয়াকে দু চখে দেখতে পার নাই।' টুকি হাসে, চোখের ভোমরা জোড়ার পাখায় আবার রোদ ঝলকায়, 'বুল্যে বোষ্টমপাড়ার লসকাদারের বড় অংখার।'

পাঁচুও হাসে, 'আমার কুন অংখার নাই গ! যোগেন আমাকে দেখতে লারে, উটি আমার কপালের দোষ বটে।'

হঁ, ই ছ্যাখ, টুকি যেন হাঁসের মতো গলা নামিয়ে, পাঁচুর কাছে আরও এগিয়ে আসে। চোখে উয়ার ঘোর লাগে। গলার স্বর যেন জলের ঝাপটায় ঝাপটায় ভিজে উঠতে থাকে, 'হঁ, অই গ লসকাদার, তোমার কি আমার ই কপালের দোষ কি কুনদিন খণ্ডন হবেক নাই? সেই কুনকালে ই ঘরকে যাতাত করত্যে, উরমটি কি আর হবেক নাই?'

হঁ, পাঁচুর বুকে বড় টাঁটায় কিন্তু বিশ্বাসের মাকুতে মরিচা লাগে, উ লাড়ি খায় না। বলে, 'উ কথা আমি বুলতে লারছি গ বীটের বউ—।'

অই, চুড়ির ঝনাৎকারে, টুকির ডান হাতখানি পাঁচুর মুখের উপর চাপা পড়লো। আর ছ্যাখ ক্যানে, বৃষ্টি ভেজা পাকা রঙ বেলজোড়ার

ডান তনখানি কেমন আঁচল খুলা হয়্যা যায়। বলে, 'বাঁটের বউ ক্যানে গ লসকাদার, নাম ধর্যে ডাকা করতে পার নাই, নাই 'ক?'

হঁ, টুকির হাতেও সেই সুবাস, পাঁচুর ভিতর বাগে কোথায় যেন চারিয়ে যায়। উয়ার বুকের দিকে তাকাতে নিজের বুকের জালি-পাটায় মুগুরের ঘা পড়ে অলক্ষ্যে কী সব লসকা ফুটে যায়। সে মুখের উপব চাপা দেওয়া টুকির হাতটি মুঠোয় ধরে। এখন আর হাতখানি তেমন ঠাণ্ডা না। কে মেমায়, কে মেমায়, হঁ? পাঁচু টুকির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'উ ত তোমার বাপের নাম।'

হঁ, ঠিক কথা বটে। পাঁচু বাপের ঘরের লোক না, দাদা দিদি খুড়া খুড়ি কেউ না। শউর ঘরে কেউ বউকে উয়ার বাপের ঘরের নাম লিয়ে ডাকা করে না। টুকি বলে, 'তালে আর কুন নামে ডাকা কর লসকাদার।'

পাঁচু টুকির মুঠোয় ধরা হাতখানি মাটিতে নামিয়ে চেপে ধরে। না, উয়ার বুকের দিকে পাঁচু তাকাবে না। বলে, 'হঁ, ইয়া, তুমি আমাকে লসকাদার বুলা কর ক্যানে?'

'তুমি যে লসকাদার।' পাঁচুর হাতের উপর টুকি উয়ার নিজের হাত রাখে।

পাঁচু আবার টুকির হাতখানি নিজের মুঠোয় চাপে, 'ক্যানে? তুমিও লসকাদারের বউ বটে!'

টুকি গোলচালি খোঁপা মাথাখানি নাড়ে। পাঁচুর মুঠো ছাড়া করিয়ে, নিজের মুঠোতে উয়ার বড় মুঠো ধরে, 'শুন গ লসকাদার, আমি কিষ্টগঞ্জের বিটি, বিয়া হয়্যা এগারপাড়ায় শউর ঘরকে আঁইচি। তাঁতী ঘরের বিটি আমি তাঁতী ঘরকে থাকি। বালুচরের লসকাদার-দিগে আমি চিনি।'

পাঁচু অবাক চোখে টুকির কানটানা গাঢ় চোখের দিকে তাকায়। তবু হঁ, তাকাবে না ভেবেও নজর উয়ার ডান বুকে টেনে নিয়ে যায়। টুকির তো উসবে কোনো খেয়াল নেই। পাঁচুর চোখে চোখ পড়তে, লাজে হাসে, মুখে রাঙা ছোপ লাগে। বাঁ হাতে আঁচল টানা করে ঢাকা দেয়। কিন্তু যে ঘরের বার হয়েচে উয়াকে তুমি কত ঢাকাঢুকি দিবেক গ? উ শাসন মানে না। টুকি আবার বলে, 'বালুচরের লসকাদার ছিল আমার দাদা শউর, এখন অভয় খান আর উয়ার চ্যালা তুমি। তোমার ওস্তাদের আর তোমার বালুচর ই ঘরকে আনা হইচিল। উয়ার লসকা দেখবার লেগো। আমিও দেখ্যেচি, তোমার তাজমোল লসকার বালুচর। হঁ, ই ঘরকে আর কেউ উ লসকার কাজ করতো পারবেক নাই। ত তোমাকে আমি লসকাদার বুলা করবক নাই ত কী করবক গ?' হঁ, দুজনের হাতের আঙুলের ফাঁকে আঙুল. খাড়ির ঘরের সুতোর মত চালাচালি করে। পাঁচু বলে, 'বিষ্টুপুরে আরো কত লসকাদার রইচে।'

'উয়ারা বালুচরের লসকাদার লয়। বালুচরের লসকাদার মন্তর জানে।' টুকি বলে, আর উয়ার চোখেও যেন বশীকরণের মন্ত্র। পাঁচুর বড় মুঠোখানি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চেপে ধরে নিজের কোলের কাছে টানা করে।

পাঁচু মনে মনে বলে, মন্তর কিছু জানি নাই। সে জানে আমার ওস্তাদ। উয়ার কিছু যদি পেতাম, তবে লসকাদারের মতো লসকাদার হতে পারতাম। তবু, ই কি দ্যাখ, টুকির কথায় প্রাণে লসকা ফুটে ওঠে। না, উয়াকে পাঁচু বুলতে পারবেক নাই, লতুন একখানি লসকার কাজ সে শুরু করতে যাচ্ছে। কিন্তু টুকির চোখের দিকে তাকিয়ে তার প্রাণে বালুচরের ঢেউ লাগে, নাকি পাখীর ডানায় ঝাপটা লাগে,

বাতাসে বনেব ঝুঁটি মুচড়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'তা একটা কথা জির্গেসা করি গ সোনার পিতিমে।'

'অই সোনার পিতিমে কী গ?' টুকি বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে দেয় পাঁচুর হাঁটুর উপরে।

পাঁচু বলে, 'হঁ গ, তুমি জান নাই কি তোমাকে সব্বাই সোনার পিতিমে বলে, পদ্দারের হাতে গড়া।'

টুকি খিলখিল করে হাসে। পাঁচুর হাঁটুর ওপর রাখা নিজের হাতের ওপর মুখ নামিয়ে চাপে, 'উয়াদের কথা ছাড়, তোমার কথা বুলা কর লসকাদার। আমাকে লিয়ে অনেকের অনেক বাখান শুন্যেচি, উসব পাপের কথা শুনতে চাই না। তোমার কথা বুলা কর।'

পাঁচু টুকির খোঁপার দিকে তাকায়। খোঁপার মাঝখানে শাদা কাঁকুই গাঁথা, উয়াতে লাল বড় বড় পুঁতি। উয়ার ঘাড় পিঠ অনেক-খানি খোলা। হঁ, উযার গরম নিশ্বাস লাগে পাঁচুর হাঁটুতে। সে বলে, 'তোমাকে আমি পিতিমে বুল্যে ডাকা করবক।'

'ক্যানে গ লসকাদার?' টুকি মুখ তুলে পাঁচুর দিকে তাকায়, 'সেই কি বুল্যে হাতের সঙ্গ করলম। পায়ের সুখ ভাঙলাম। সে রকম নাকি গ?'

পাঁচুর চোখে অবুঝ নজর। সে আবার কী?

'উটো আলাদা কথা।' টুকি হীরার ঝিলিকে হাসে, 'কথার কথা। পায়ের সুখে ভাঙা করে নাই বটে। পিতিমেকে বাঁধের জলে ডুবাই দেই যে।'

পাঁচুর নজর তরাস্যে ওঠে, ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না গ না, উ কথা বুলি নাই। তোমাকে যে পিতিমের মতন চখে লাগে। তোমাকে আমি পিতিমে বুল্যে ডাকা করবক।'

হঁ, পিতিমের কানটানা চোখের কালো তারার ঝিলিক পাঁচুব চোখে হানে, 'বেশ কথা গ লসকাদার, আমাকে যে নামে ডাকা কব্যে তোমার সুখ, উয়াতেই আমার সুখ।'

পাঁচু বলে, 'একটা কথা পিতিমে, তুমি আমাকে ডাকা কর ক্যানে?'

টুকির গলায় যেন আনখা আগর আটকায়, কথা বলতে পাবে না। এতক্ষণে এই প্রথম সে মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকায়। আবার চোখ ফেরায় পাঁচুর দিকে। হঁ, মুখ ফেরাবার এক পলকে দেখ, ই মুখ সে মুখ না। এ মুখে যেন এখন দেবীর থানের ভর লেগেছে। পাঁচুর চোখে চোখ রেখে যেন অনেক দূর থেকে বলে, 'উ আমি জানি নাই গ লসকাদার। তুমি কি জান লসকাদার? গুটির ভিতর বাগে থেক্যা পোকা ক্যানে সুতা ছাড়ে?'

'উ ত উয়াদের ধমম', পাঁচু বলে।

টুকি যেন ভরের ঘোবে বলে, 'ত উ আমার ধমম বটে। আমি দেখাইতে লারছি গ, আমার ভিতর থেক্যা কে তোমাকে রাত দিন ডাকা করচ্যে। কবে তোমাকে দেখলাম, কবে এমন হল্য, জানি নাই গ লসকাদার। আমি তুকতাক জানি নাই। তুমি ঘরের দুয়ার দিয়া গেল্যে, আন্‌খা আমার মন লাড়ি খেয়্যা যায়, আমার আগর খুল্যে যায়গা, তুমি যে-বাগে যাও, উ বাগে ছুটি। মনে ল্যায় কি, আমার ঘর বর কিছু নাই, সব তোমার সঙ্গে চল্যে যাইচে।'

পাঁচুরও ঘোর লাগে, স্বপ্নের ঘোর, 'তোমার ডর লাগে নাই কি?'

'না গ লসকাদার, আমার ডর লাগে নাই।' টুকি সেই একরকম ভর লাগা চোখে তাকায়, দু হাত তুলে বলে, 'ই দ্যাখ, আমার কী আছে? আমার ক্যানে ডর লাগবেক?'

পাঁচু বলে, 'তোমার এই ভরা ঘর সনসার—।'

কিছু নাই কিছু নাই। টুকি দু হাত বাড়িয়ে পাঁচুর কোলের ওপর রেখে, নুয়ে পড়ে, 'বুললাম, আমার ঘর নাই, বর নাই, তুমি ছাড়া জানি নাই। আমাকে পিটাই কর, জলে ডুবাই দাও, তুমি লসকাদার আমার ধনপরাণ।'

হঁ, জীবনে ই কি লসকা বটে? লসকা থাকে কোথায়? ই লসকার লসকাদার কে বটে, পাঁচুর জানা নাই। সে দু হাতে টুকির মুখ তুলা করে। হঁ, ই ছাখ, পিতিমের চোখে জল গড়ায়। পাঁচুর বুকে বিঁড়াইয়ের বান ডাকা করে। সে হাত তুলে টুকির চোখ মুছতে যায়। টুকি দু হাতে উয়াব গলা জড়িয়ে, বুকে মুখ ডুবাই দেয়। পাঁচু টুকির খোঁপার সাপ-কুণ্ডলীতে মুখ রাখে। হঁ, সেই এক সুবাস, পাঁচুর ভিতর বাগে, রক্তে রক্তে চারিয়ে যায়।

টুকি মুখ সরিয়ে আনে পাঁচুর বুক থেকে, আঁচল টেনে তোলে বুকে, কান খাড়া করে শোনে। পাঁচুও আনখা চমকে কান খাড়া করে। কিছু শুনতে পায় না। টুকি বলে, বস লসকাদার, আমি নীচে যাঁইচি, আমাকে ডাকা করচে। তুমি বস, আমি ঝটস্তে এস্তে পড়ব। আজ তোমাকে যেত্যে দুব নাই। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়। সরে গিয়ে হ্যারিকেন হাতে, দালানে গিয়ে, দরজা খুলে সিঁড়িতে যায়। আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

পাঁচু অন্ধকারে একলা বসে থাকে। হঁ, ছোটঠাউরকত্তা, তুমি এখন বাউরিপাড়ায় গোগার দরজায় বসে চেলা খাঁইচ। আমি ইখানকে বসে, চেলার কথা ভুলে গেঁইচি। কী তোমার শাস্তরের কথা, বুঝি নাই হে, কিন্তু টুকিকে ছেড়ে যেতে লারছি। ক্যানে? না, পাপ লাগবেক! পাপ লাগবেক! এখন ই কথাটা আমার মনও বুলচ্যে ক্যানে? ই কি লসকা? ই লসকার লসকাদার কে, আমি জানি নাই।

পাঁচু দক্ষিণের জানালার দিকে তাকায়। অন্ধকারে সেই একমাত্র ফাঁক, সেখানে টুকুস আলোব আভাস। সে উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়। গাছপালাব ফাঁকে ফাঁকে এক আধ খানি সুতোর মতো আলোর রেখা। ঘর দেখা যায় না। দক্ষিণবাগে, তাঁত ঘরে লোক-জনের গলাব শব্দ শোনা যায়। পাষাণলড়িব ঝাপ, আর মেসিনের ঢেঁকিতে পায়ের চাপে শব্দ উঠছে, ক্যারেং···ঝট্। হঁ, ব্যাঙ্গালোর হোক, আলপাকা হোক, নাইলন টেরেলিনের লসকার কাজ হোক, উয়াতেও জেকাড মেসিনে, খাচান দড়ি, জালিপাটা জুড়তে লাগে।

পাঁচু আকাশের দিকে তাকায়। কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। বাজ বিজলি নাই, কেবল ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যে জোনাকি-গুলানেব ঝিকিমিকি ওড়ার নিবৃত্তি নাই। আন্‌খা ছোঁয়ায় সে জানালার কাছ থেকে এক পা সরে যায়। তারপরেই গন্ধে টের পায়। তার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে, টুকি এসে দাঁড়িয়েছে। উয়ার গলায় এখনো সেই দেবীর থানের ভব, 'যম লয়, সাপ লয়, আমি গ!'

পাঁচু মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ঘরের দরজা খোলা। দালানের সিঁড়ির কাছে হ্যারিকেনের সল্‌তে নামানো। টের পায়নি, টুকি কখন এসেছে, দরজা বন্ধ করেছে, কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলো, উয়ার তেমনি মাথার ঘোমটা খোলা, আঁচল লুটানো। আবছায়া কোল আঁধারে, পিতিমের অঙ্গ পষ্ট যেন উজ্জ্বলাইচে।

হঁ, ই গ্যাখ, শিয়ড়চাঁদা সাপিনী দু হাত বাড়িয়ে চন্দ্রবোড়াকে জড়াই ধরে। না, এখন আর পাঁচুব বুকে আতুরপাতুর ডাক ছাড়ে না, কে মেমায়, কে মেমায়? এখন শিয়ড়চাঁদার জোড়া অঙ্গে, চন্দ্রবোড়া যেন আপন শরীরে বিশাল হয়ে ওঠে। নিশ্বাসে ফোঁস ফোঁস করে। শিয়ড়চাঁদার সঙ্গে মেঝেতে লুটায়, জড়ায়. গড়ায়। বলে, 'অই পিতিমে,

তোমাকে আমি লসকা আঁকা করবক গ, তোমাকে বানিদার হয়্যা বুনা করবক।'

শিয়ড়চাঁদার গলায় এখন রক্তের ঝাপটা, স্বর ফুটতে চায় না, তবু বলে, 'হঁ গ লসকাদার, আমার খালি জমিনে লসকা দিয়া কর, লসকায় লসকায় ভর্য়ো দিয়া কর!...'

না, ই বৃষ্টি থামবার নয়। পাঁচু রাতের দণ্ড প্রহর বুঝতে পারে না। সময়ের হিসাব করতে পারে না। ই শহরে এখন আর শিয়াল ডাকে না। কালিন্দী বাঁধের কাছ থেকে ডাকলেও, শহরের ঘেরাওয়ে ডাক এসে ঢুকতে পারে না। রাস্তায় লোকজন নেই। পাড়া থমথম্। কেবল কুকুরগুলান ঘেউ ঘেউ করে।

পাঁচু রাস্তা থেকে নর্দমা ডিঙিয়ে, তাঁত ঘরের দিকে তাকিয়েই থমকিয়ে যায়। ঘরের দরজা খোলা, ভিতরে আলো জ্বলছে। সে কাদা মাটিতে রবারের জুতো পচপচিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এক কোণে আলো। আলোর পাশে তালাইয়ের ওপর পটি শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মোতি ঘরের মাঝখানে বসে, দরজার দিকে তাকিয়েছিল। পাঁচুকে দেখা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিল।

গুনগুড়ি বৃষ্টিতে পাঁচুর সারা গা মাথা জামা কাপড় ভিজা। সে ঘরের ভিতর ঢুকলো। তার ছায়াটা, তারই পিছনে, যেন মস্ত এক দৈত্যির মতো আগলে ধরলো। সে ঘরের ভিতর পা দিয়ে দেখলো, দুই দিকের দুই তাঁত ঢাকা। উত্তর বাগের জানালা বন্ধ। ই ঘরে আর কেউ নেই। কিন্তু পাঁচুর মনে হলো, তার গলায় শুকনো কাঠ গোঁজা, কথা বেরায় নাই।

মোতি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। হঁ, উয়ার মাথায় ঘোমটা নেই,

গায়ে জামা নেই, আঁচল বুকেব ওপর দিয়ে, কাঁধের পাশে মাটিব মেঝেয় লুটাইচে। নাকের পাটা কাঁপচে, নাকছাবির পাথব বিজলাইচে, কিন্তু চোখের আংরা জ্বলচে ধকধক! শুন এখন প্রথম বাখান, 'ক্যানে, বাউরিপাড়ায় বাকি রাতটুকুস কাটাই আসতে পার নাই? গোগা বাউরির মাগীব কাছকে থাকতে দিলেক নাই?' বলে, পা ছড়িয়ে, বাঁ পা মাটিতে ঠুকে বললো, 'নাতি, নাতি, নাতি অমন চেলা খাওয়ার মুখ্যে।'

'খাই নাই র‍্যা ছোট বউ।' পাঁচু যেন তড়কঁকের মতো বললো, উয়ার গলার স্বরে উ নাই। ঘরের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজ পড়লো, পাঁচু বুঝতে পারলো না। মোতি উঠে দাঁড়ালো। এখন উয়ার ছায়া, পাঁচুর পিছনের দত্যি ছায়াটার গায়ে পড়েছে। মনসার বাতাসী বাহনের মতো পাঁচুর বুকেব কাছে এসে, উয়ার জামা টেনে ধরলো। মীনা মাকু টানা চোখে খাড়া নজরে তাকালো মুখের দিকে। তারপরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে, আনখা গোটা পাড়া চমকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'অই গ, তু মদ্দা চেলামূলা গিলেচু নাই র‍্যা, তবে রাতভর কোথাকে রইচিলি? অই গ, কী সব্বনাশের কথা, তু মরণ, চেলামূলা গিলেচু নাই, ত কোথাকে কী করচিলি?'

পাঁচু তার জীবনে এমন করে চমকায়নি। মোতির অনেক রাগ ঝাল দেখেছে, কিন্তু কোনো দিন এমন রাত-বিরেতে পাঁচুকে তু-তুকারি করেনি। সে নিরুপায় হয়ে, মোতিকে দু হাতে বুকের কাছে চেপে ধরে বললো, 'অই, ছোট বউ, চুপ যা গ, চুপ—।'

'না না না, চুপ যাব নাই।' মোতি পাঁচুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে, উয়ার জামাটা টেনে খানিক ছিঁড়ে দিল, 'অই র‍্যা ঢ্যামন, তোর গা থেক্যা ই কিসের গন্ধ বেরাইচে? অই র‍্যা মড়া,

তাব গালে কপালে কার সিঁদুর মেখ্যা এয়েচু? বুলতে হবেক, তোকে বুলতে হবেক।' সে দু হাত দিয়ে পাঁচুর বুকে ঠাস ঠাস মারতে লাগলো।

'অই মা, মা গ!' দরজার কাছ থেকে পুনির ভয়ের কাতরানি ভেসে এলো।

পাঁচু পিছন ফিরে দেখলো। হঁ, পুনি, আর উয়ার পিছনে সোনার ভয়কাতর মুখ দেখা যাচ্ছে। পাঁচু ছিটকে দরজাব কাছে গেল, 'যা যা, তোরা ঘুম করগা যা।' সে দরজাটা বন্ধ করে, আগর তুলে দিল।

ইয়ার মধ্যে দেখ, পটিটা উঠে বসে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আর মোতি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ঠক ঠক কপাল ঠুকছে, 'অই র‍্যা যম। তু ক্যানে চেলামূলা গিলা করো আমাব কাছকে আঁইচু নাই! তু ক্যানে মাতাল হয়্যা আমার কাছকে আঁইচু নাই, আমি তোর পায়ের তলায় পাষাণলড়ি হয়্যা থাকি র‍্যা, অই মা-আঁ আঁ আঁ…'

মোতি মাটি থেকে মুখ তুলে বুকফাটা কান্নায় চিৎকার করে উঠলো।

পাঁচু মোতির কাছে হাঁটু মুড়ে বসে, উয়াকে বুকের কাছে টেনে নল। তার মধ্যে পটিটা গড়াতে গড়াতে মোতির পিঠের ওপর উঠে, গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কান্নায় ডাকতে লাগলো, অই মা মা…।

পাঁচু পটিকে সুদ্ধ মোতিকে দু হাতে জড়িয়ে উয়ার মুখটা বুকের কাছে চেপে ধরলো, 'অই শুন গ ছোট বউ, তোর পায়ে ধরা করচি—।'

'না না না, আর ছোট বউ বুল্যো ডেক্য নাই গ, ডেক্য নাই।' মোতি কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'বুঁইচি, আমি বুঁইচি কার গন্ধ তোমাব গায়ে, কুন বাঁজা আঁটকুড়ির সিঁদুর তোমার সারা মুখে। ছেড়্যা দাও, ছেড়্যা দাও গ আমার যম, রাত পোয়ালে তোমাকে যেন আমার

মরা মুখ দেখত্যে হয়।' সে পাঁচুর বুকে পড়ে গোঙাতে লাগলো।

পটি মায়ের পিঠ থেকে নেমে, এক পাশে শুয়ে চেষ্টা করলো মোতির বুকের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিতে। পাঁচু তাঁতের খাচান দড়ির দিকে তাকালো। না, সে তাঁত দড়ি কিছুই দেখছে না। এমন কি, তার চোখের সামনে টুকির মুখও ভাসছে না। জীবনের সব কিছুই কী আশ্চর্য আন্‌খা চালে চলে, তার কিছুই বোঝা যায় না। এও কি লসকা? জীবনের এ লসকাদার কে? পাঁচুর আলোছায়া খানাখন্দ মুখে বিড়ম্বিতের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে, বড় অসহায় চোখে মোতির দিকে চোখ নামিয়ে তাকায়।

মাসাধিককাল কেটেছে। না, পাঁচুকে মোতির মরা মুখ দেখতে হয়নি। কিন্তু সেই নুনগুড়ি বর্ষারাত্রের পর থেকে, সে আর কখনো যমুনা বাঁধে নাইতে যায়নি। পাটরাপাড়ার ভিতর দিয়ে, সে এখন বামুনপুকুরে ঘাট করতে, নাইতে যায়। পাটরাপাড়ার কার্তিকের বউ —যার সঙ্গে যমুনা বাঁধে টুকির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, সে মাঝে মাঝে মোতির সঙ্গে বামুনপুকুরে যায়। উয়ার মুখেই মোতি শুনেছে, এদানি টুকিও আর যমুনা বাঁধে নাইতে আসে না। ক্যানে, কে জানে।

আর সব যেমন তেমনি চলছে। এখন প্রায় দিন বর্ষা, আকাশে মেঘের ঘটা। বৃষ্টির দিনে বাড়ির ভিতর বাগে, ঘরের নীচু পিড়ায়, শুকনো দিনে তাঁত ঘরের খড়ের চালের নীচে, আগের মতোই জগত বুড়া তার 'কড়ে বউয়ের' হাত থেকে বুটকলাই ভিজা নিয়ে খেতে খেতে, আপন মনে বকে, আর যতক্ষণ মোতি ফিরে না আসে, চা আর মুড়ির জন্য, কারোকে দেখলেই ডাকে, কে, ক'ড়ে বউ এল্যে?...

সোনার হাতের ভুজনির জোড় বুনা করা হয়ে গিয়েছে। তাঁতটি

এখন খালি। পাঁচুর ইচ্ছা না, তাঁত খালি পড়ে থাকুক। তাঁত ভাত এক কথা। তাঁতীর ঘরে তাঁত বসিয়ে রাখা, তাঁতীর একাদশী। যাকে বলে উপোস। কথায় বলে, জমি হলো তাঁতীর গতর, আবাদ হলো তাঁত, উয়াতেই ভাত। কিন্তু পাঁচুর একটা তাঁতে কাজ চলছে। সব থেকে বড় আশা, নতুন লসকার কাজ শেষ হলেই, বাকি তাঁতটিতে নতুন শাড়ি বুনা হবে। নিজের লসকার কাজটি সে নিজের হাতে বুনা করবেক। আগের দুই খান লসকার কাজেও, সে নিজে বানিদার ছিল।

সোনা আর নোটো এখন সকালেই তাঁত ঘরে এসে বসে না। দুজনে ভিতর বাড়ির ঘরে বসে পড়ে। পড়তে পড়তে ঝগড়া মারামারি করে, আবার ভাবসাবও হয়। দুজনে দাঁতে তামুক ঘষা করে। আসলে উটি লিশা। কিন্তু সোনার সব থেকে বড় নেশা বিড়ি। বাপের পকেট থেকে চুরি করে রাখা বিড়ি, নোটোর সামনেই খায়। নোটোকেও এক আধ টান খেতে দেয়। বিড়ির নেশাটা সোনার অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে এসেছে। ইস্কুলেও একটা দল আছে, এক সঙ্গে সবাই বিড়ি টানে। নোটোর এখনো সয় না। মাত্র আট বছর বয়স তো। আস্তে আস্তে সয়ে যাবে।

হুঁ, মোতি যতক্ষণ বামুনপুকুর থেকে ঘাট নাওয়া সেরে না ফেরে, গলানি মেয়ে মিনি যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ পুনি আর অজা ছাড়া তাঁত ঘরে কেউ নেই। পটিটা থাকে, উ কুন ব্যাপার লয়। পটি আপন মনে মুড়ি চিবায়, বকবক করে, হাসে, থেকে থেকে পুনির ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। পুনি ধমক দিলে সরে যায়। পুনি চরকায় নলি ঘুরায় না, লাটাই ফাঁদালি নিয়ে বসে না। বানিদার অজার ডাকে ওকেই অজার পাশে বসে লসকার মাকু গলাতে হয়। হুঁ, বাপ তো

এখন বুটকলাই ভিজা খেয়েই, বেরিয়ে যায়। লসকার কাজ চলছে ওস্তাদের ঘরে।

বানিদার অজার এদানি কাজে বড় মন বসেছে। যবে থেকে পাঁচুর লসকার কাজ শুরু হয়েছে, তবে থেকেই সে আগের থেকে অনেক সকাল সকাল এসে কাজে বসে। তাঁত ঢাকা দেওয়া কাপড় সরিয়ে, পাযাগলড়িতে পা রেখে বসে পড়ে। হুঁ, পুনি তখনো চরকা নিয়ে থাকে, নয় তো লাটাই ফাঁদালি। কিন্তু অই ছ্যাখ ক্যানে, বানিদারটি এলেই, উয়ার লসকাবুটি চোখের তারা আড়ে আড়ে তাঁতের দিকে ফেরে। বুকের ধুকধুকি ফাবড়াচ্ছিল এক তালে। অজা ঘরে এসে ঢুকলেই ধুকধুকির তাল বদলে যায়, কান খাড়া হয়ে ওঠে। ক্যানে? কী শুনবার লেগো কান খাড়া হয়ে ওঠে। ক্যানে বা ঘামে বুক ভিজে উঠতে থাকে।

'কোথাক গ গলানি, কাজ করবেক নাই, নাই কি?' অজা পুনির দিকে ফিরে ডাকে, উয়ার কচি গোঁফ জোড়া বহয়ে বেড়ে যায়।

পুনিরও এদানি ভাবসাব বাখান আলাদা রকমের। এক ডাকেই ওঠে না, বলে, 'ক্যানে, আমি কি গলানি?'

'না, আমার ওস্তাদের বিটি বটে।' অজারও আজকাল বাখান অন্যরকমের। পাঁচুকে ও আজকাল সকলের কাছে ওস্তাদ বলতে আরম্ভ করেছে। বলে, 'ঘাট নাওয়া সেরে, পান্তা গিল্যে ঝাপট্যে এলম, কাজটা পড়ে থাকবেক?'

পুনি তখন চোখ তুলে তাকায়। হুঁ, অজার চোখে চোখ পড়তেই লসকা বুটি চোখের তারায় আর ঠোঁটের কোণে হাসি বিজলায়। বলে, 'ক্যানে, এত ছুট করাইচে কে? মিনি ত এখনই এস্যে পড়বেক।'

'উয়ার লেগো কাজটা পড়ে থাকবেক?' অজা যেন বড় ব্যস্ত।

হঁ, মজুরিখাটা বানিদারের এত কাজের আঠা কেউ দেখেছে ? পুনি মুখ ফিরিয়ে, ঠোঁট টিপে হাসে, তারপরে যেন বড় অনিচ্ছায়, বানিদারের বাঁয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে। কে বুঝবে হে চতুর্দশীর মনের কথা ? বানিদারের ডাকে যে চুম্বক আছে, উয়ার শরীরের তাত যে গায়ে লাগাতে ইচ্ছা করে, চৌদ্দ বছরের সেই মনের কথাটি বুঝবার ক্ষমতা অজার মতো বানিদাবেব নেই। উয়ার টান, উয়ার তাত কতোখানি, উ নিজে জানে নাই, পুনি জানে। কিন্তু কাছে গিয়ে বসলেই কি আর গলানির কাজ শুরু হয়, না বুনা চলতে থাকে ? তখন শুন, য্যাতো আন কথা ঝাঁন খায়।

ফুড়কির সঙ্গে ক্যাদারের ভারি আঁতেবাসা। অজা যেন আপন মনেই বলতে থাকে, আর লসকার মীনা মাকুগুলান সাজায়, ফুড়কির কুন ডর নাই। উয়ারা একদিন চল্যে যাবেকগা।

পুনি যেন শুনতেই পায় না, ও ওর নিজের ছোট ছোট গলানো মাকুগুলান নিয়ে নাড়াচাড়া করে। অজা চুপ করে থাকতে পারে না, পাড়ার সব্বাই জানে, ফুড়কিকে উয়ার বাপ পিটাই করেচ্যে।

অই, পুনিকে কী নতুন কথা শুনাইচ হে ? জ্যাঠা উয়ার বিটিকে কবে গালমন্দ কবে, ঘরের দরজা বন্ধ করে পিটায়, উ কথা তুমি বলবে, তবে পুনি জানবে ? তবে হঁ, পুনি মনে মনে ভাবে, ফুড়কির এত বড় বুকের পাটা কেমন করে হয় ? এত গালমন্দ, এই বয়সে মা-বাপের এত মারপিট, এত চোখে চোখে রাখা, তবু দ্যাখ, ও কেদারের সঙ্গে, ইদিকে উদিকে চটার মতো ফুড়ুত ফুড়ুত উড়ে গিয়ে দেখা করে ! হঁ, চড়াইয়ের মতোই। উয়াকে কি আঁতেবাসা বুল্যে বটে ?

ক্যানে, তোমার সই মালতি কিছু বুলে নাই, নাই কি ? অজা যেন নিজের মনেই জিজ্ঞেস করে, খগেন চঁদের বিটা কিষ্টা উয়াদের

ঘরকে যায়। কিষ্টা আমার বন্ধু, সব কথাই বুলা করে। উয়ারা দুপুর বাগে সিনিমায় যায়। উয়ারা বাসে চেপ্যে ষাঁড়েশ্বরে গেঁইচে দুই দিন।

পুনি জানে, অজার কোনো কথাই মিথ্যা না। মাল্‌তি নিজের মুখেই পুনিকে কিষ্টার কথা বলেছে। কিন্তু অজাকে ও অনেকবার বলেছে, কিষ্টার সঙ্গে মাল্‌তির বিয়ে হবে। খগেন চঁদের পয়সা আছে। চকে পান বিড়ির দোকান, উয়ার সঙ্গে ছোট খাটো মনোহারি। উয়ারা তাঁতী বটে, কিন্তু ঘরকে তাঁত নাই, তাঁতে ভাতেও নাই। হরিকাকা সবই জানে, তার বিটির সঙ্গে কিষ্টার ইয়া-উয়া আছে। কাকিও জানে। জেনে শুনে না জানার ভান করে। নইলে কবে পাড়ায় হুজ্জোত হাঙামা হয়ে যেত। পঞ্চায়েত বসে যেত। কিন্তু সে-কথা অজাকে কে বোঝাবে? ও আমনার মনে বলতেই থাকে, হঁ, বিয়া হবেক ত হবেক। বিয়ার আগেই ত উয়ারা ঘরে বস্তে, বাইরে ফাঁক বাগে ঘুরাফিরা করচ্যে।

হঁ, অজার মনের কথা পুনি বুঝতে পারে। মাল্‌তিও ওকে অনেক কথা বুলা করে। মাল্‌তির মুখে উয়ার কথা শুনতে শুনতে, পুনির কেবল অজার কথাই মনে হতে থাকে। ক্যানে, উ জানে নাই। অজা আমনার মনে বলে, আমি মজুরি খাটা বানিদার, আমার সঙ্গে ত আর ওস্তাদ বিটির বিয়া দিবেক নাই।

অই, ই কথাটা শুনলে, পুনির মনটা খারাপ হয়ে যায়। এদানি ওর মনেও ইচ্ছা জাগে অজার সঙ্গে কোথাও ফাঁকা নিরালায় ঘুরে আসবে। ইচ্ছা করে, সারাদিন উয়ার গায়ের সঙ্গে গা লাগা করে বসে, লসকার মাকু গলাবে। হঁ, অজা যখন ইচ্ছা করেই, যেন কাজের মধ্যেই, পুনির গায়ে কনুই ঠেকিয়ে দেয়, জামার বাইরে হাটুতে হাত রাখে, ও চোখ তুলতে পারে না, কিন্তু উয়ার ছোঁয়াটি গায়ের মধ্যে কী

এক সুখ বুনা করে। অজা যখন আন্‌খা আন্‌খা নিশ্বাস ফেলে, কাজের হাত গুটিয়ে নিয়ে বলে, ধূস শালা, আমার আর ইখানকে থাকতে মন করে নাই তখন পুনির মনটা আতুরপাতুর করে ওঠে। আগে জিজ্ঞেস করতো না, এদানি জিজ্ঞেস করে, 'কোথাকে তোমার যেতো মন ল্যায় ?'

অজা পুনির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, জবাব দিতে পারে না। হঁ, আতুরপাতুর মন পুনির, তবু অজার দিকে তাকিয়ে চোখের লসকা তারায় ঝিলিক দেয়। অজা বলে, 'হঁ, কোথাকেও যাবকগা, আমনার মনে কাজ করবক। ইখানকে আর থাকত্যে লারছি। ই বিষ্টুপুরে আমার কে আছে বটে ?'

'ক্যানে ? মা ভাই বুন, উয়াদের কে দেখবে ?' পুনির কালো ভুরু কুঁচকে ওঠে।

অজা পুনির দিকে তাকিয়ে জবাব দিতে পারে না। পুনি হাসে। অজা বলে, 'ই শালার সন্‌সারে আঁতেবাসা নাই।'

'কোথাকে আছে ?' পুনির ঘাড় বেঁকে যায়, চোখের লসকা বুটি ঘুরপাক খায়।

অজাকে তখন কে তুক্‌ করে, না মন্তর ঝাড়ে, ওর ঝকঝকে চোখ দুটো পুনির মুখের দিকে যেন নিশি ডাকা ঘোরে অপলক চেয়ে থাকে। মরদের গোঁফ কাঁপে না ঠোঁট কাঁপে, বোঝা যায় না। আস্তে আস্তে উয়ার বাঁ হাতটি পুনির বুকের কাছে এলিয়ে পড়া বেণীর ওপর উঠে আসে। পুনি আন্‌খা কেঁপে যায়, ঝটস্যে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি বেণীটি ছাড়া করে অজার হাত সরিয়ে দেয়, 'অই, কী কর তুমি ? মা আসবেক কি, ভাইরা আসবেক, কাজে বস।...'

হঁ, এদানি পুনির মন কেমন হয়েছে। সেই যে রাত্রে বাপ এলো, চেলা মূলা না গিলে, প্রায় রাতখানি পুইয়ে, মা চিৎকার করে বুক

চাপড়ে কাঁদলো, সেই থেকে পুনির বুকে খটখটি মাকুর মতো বাজতে থাকে, চল্যে যাবকগা, ইয়ার সঙ্গে চল্যে যাবকগা।··· ক্যানে? না, পুনি বুঝতে পারে না, এদানি জগতে কার ওপরে ওর এত অভিমান হয়।

পাঁচুব কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। সকালে মোতির দেওয়া এক ঘটি জল গিলে, আব বুটকলাই ভিজা চিবিয়ে, জামা কাপড লিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যমুনায় ঘাট নাওয়া সেরে, একেবারে সোজা ওস্তাদের ঘরকে যায়। না, উটি এখন ওস্তাদেব নিজের কাজ লয় বটে, চা মুড়ি বোজ বড় বউদি খেত্যে দিয়া করে। ওস্তাদের কথায় না, উটি অবি-দাদার ধর্ম। ওস্তাদের বড় বিটা, অবিনাশের বলা আছে। ওস্তাদের কোনো বিটা, বিটার বউ, ওস্তাদেব শোয ঘায়ের সেবা করে না। অবিদাদা পাঁচুকে সেইজন্য নিজের ভাইয়ের বেশি মনে করে। ই হল্যাগা সন্সারের ধর্ম। পাঁচু ঘাট নাওয়া সেরে, আগে এসে ওস্তাদের ঘা ধোয়া মোছা করে মলম লাগায়। তারপরে মুড়ি চা খেয়ে কাজে লেগে যায়।

হঁ, পাঁচুর এখন সময় নাই। মাঝে মাঝে ওস্তাদ নিজে পাঁচুকে ডাকা করে, উয়ার কাঁধে ভর দিয়ে, বাইরের পিড়ায় এসে তালাইয়ের ওপর বসে, পাঁচুর কাজ ছ্যাখে। ওস্তাদ প্রথম যেদিনে কাজ দেখতে পিড়ায় এসে বসেছিল, উয়ার চোখের চশমাখানের কাঁচের আড়ালে তারা দুইখান ঝকঝকিয়ে উঠেছিল। 'হঁ, অই র‍্যা পাঁচু, তোর রুলকাটির ঘর কাটা কাগজের বহর এত বড় ক্যানে?'

পাঁচু চমকে উঠেছিল, ভয়ে বুকে মাকু ফাবড়িয়েছিল। ওস্তাদকে না বলেই সে মনে মনে ঠিক করেছিল, আটচল্লিশ ইঞ্চির আঁজলা করবেক।

ওস্তাদের চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? এক নজরে লসকার মাপজোক ধরা পড়ে। পাঁচু দাঁত দিয়ে গোঁফ চিবিয়ে, হাত কচলে বলেছিল, 'আঁজ্ঞা, আপনাকে বুলা হয় নাই। ভেব্যেচি ই লসাকার আঁজলাটা আটচল্লিশ ইঞ্চি বুনা করবক।'

হঁ, পাঁচু ভেবেছিল, ওস্তাদ গোঁসা করে তখন বুঝি লসকার ছ হাত-জোড়া কাগজ টেনে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করবেক, বুলা করবেক, শালা বড় ওস্তাদ হয়েচু ভু? কিন্তু না, ওস্তাদ চোখ থেকে চশমাখানি খুলে, উঠানের দক্ষিণে ইদারার বাগে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভেবেছিল, তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে মাড়ি বের করে হেসেছিল। নতুন তামা রঙ মুখের ভাঁজে ভাঁজে সেই হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল, 'হঁ, ইয়া পাঁচু, হিসাবে যদি আনা করতে পারিস, ই একটা লতুন বালুচরের আঁজলা হবেক বট্যে! ভাল র‍্যা, খুব ভাল। ইয়াতে আমি খুশি হইচি। আমার আঁজলার লসকা পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চিতক বুনা করাইচি। তু আরো তিন ইঞ্চি বেড়েচু। বাউবা! বাউবা! সাবাস র‍্যা বিটা।' পাচুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'হঁ, ই হল্য লতুন লসকাদারের ধেয়ান। তু আমার চ্যালা বটে।'

অই, তবু ওস্তাদের মন খুঁতখুতানি যায় নাই। মাঝে একদিন ঘর ·.টা কাগজে বেদেনীর মুখখানা নিচু হয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'পাঁচু, পিনসিলটা দিয়া কর ত বিটা।' পাঁচুর হাত থেকে পেনিসল নিয়ে, বেদেনীর চোখের কোণ আরো খানিক বাঁকিয়ে টানা করে দিয়েছিল। হঁ, পাঁচুর বুকে বিজলাইচিল। উ যে সেই পিতিমের চোখের মতো হয়েছিল। ওস্তাদ বলেছিল, 'ইয়াতে বেদেনীর চখের ঠসকটি ভাল খুলবেক, বুঁইলি ত?'

আষাঢ়ে শুরু হয়েছিল, শ্রাবণ শেষ। কাগজে কলমে কাজ শেষ।

এবার পাঞ্চিং বাকসা পাটা, জালিপাটায় মগুর দিয়ে টবনায় বিঁধ বিঁধিয়ে লসকা তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পাটা আর জালিপাটার কাজও সময় নেবে দু মাসের মতন। তার পরেও বিস্তর কাজ বাকি। এখন সকাল থেকে সারাদিন কাজ। পাঁচু দুপুরের বাগে একবার বাড়িতে খেতে যায়। সেই সময়ে মোতির সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা হয়। কিন্তু হঁ, ওস্তাদের ঘরে দিনের শেষে সাঁজবেলায় একবার ফাঁকবাগে যখন সে বেরোয় তখন কোথাকে তাকে টেনে লিয়ে যায়? আঁকুড়ের বনে। ক্যানে, না, উখানে আঁকুড়্যা বীটদের ঘর, দরজাটি খোলা থাকে। দু মাস আগে, সেই যে নুনগুড়ি বর্ষা রাত্রে লসকা বুনা শুরু হয়েছিল, সেই তাঁতের পেটলরাজে থেকে পাঁচু আর ছাড়া পায়নি। অর্ধপুতা এখন সেই তাঁতের পারডোবেতেই পা ডুবিয়ে বসে আছে।

হঁ, মোতি কি কিছু টের পায় না? আনজাদ অনুমান করতে পারে না? তবে ক্যানে পাঁচু, মোতির মীনা মাকুটানা চোখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না? না, মোতি রাগ ঝাল কিছু দেখায় না, কান্না-কাটি চিৎকার করে না। বীট ঘর থেকে বেরিয়ে, বাউরিপাড়া ঘুরে সে যখন ঘরকে যায়, তখন বুকের কাছে টেনে নিলে প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভয় পাতুর পায়রার মতো ছটফট করতো। এদানি করে না। পাঁচুর বুকে ধরা দেয়, পাঁচুর কাছে শোয়। পাঁচুর কোনো খেদ রাখে না, যাবত আকিঞ্চে মিটায়।

অই, এতকালের ঘর করা বউ, উয়াকে যেন পাঁচু আজকাল বুঝতে পারে না। মোতি হাসে, হঁ উয়ার লসকা মাকুর টানা চোখে বিজলায়, ঠোঁটের হাসিতে লসকাও ফোটে। তবু মনে হয়, ছোট বউটির ভিতর বাগে, কোথাকে কী ঘটে গিয়েছে। কী ঘটেছে?

মোতি আর যমুনা বাঁধে যায় না। পাঁচু জিজ্ঞেস করেছিল, 'যমুনা বাঁধে ক্যানে যাইচ নাই গ ছোট বউ?'

'ভাল লাগে নাই।'

'ক্যানে? বামুনপুকুরে ত আমাদের পাড়ার বউ বিটিরা কেউ ঘাট যাওয়া নাওয়া করে নাই।'

হুঁ, মনে আছে, মোতি একদিনই হেসে জবাব দিয়া করেছিল, 'শুন গ পুনির বাপ, একটা কথা বুলা করি।' বলে ছড়া কেটে বলেছিল :

যমুনা বাঁধে নাইতে গেলম,
ই বাগ উ বাগ ঘুর‍্যা এলম
কাঁধের গামছা কাঁধকে রইল
নিংড়াতে গ পেলাম নাই।
মনে বড় আশা ছিল
আশা মিটল নাই।...

ছড়াখানি বুলা করো খুব হেসেছিল। আর পাঁচু অঁড়কঁকের মতো মোতির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হুঁ, তাকে দেখাইচিল অঁড়কঁকের মতো, আসলে মনের ভিতরটা যেন চৌতারের জট পাকিয়ে গিয়েছিল। মোতির কথার মধ্যে কি কেবল হাসি রঙ্গ ছিল? কাঁধের গামছা কাঁধেই রইল নিংড়াতে পেল না। ক্যানে? কে উয়ারে চাওয়া করেছিল! পাঁচু জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছোট বউ, বুঁইতে লারছি গ তোর কথা, টুকুস সিজিয়ে বল।'

মোতি হেসে বলেছিল, 'আমি কী বলবক গ? একটা কথা মনে এল্যা বুল্যো দিলম।' আর একদিন পাঁচু বলেছিল, 'ছোট বউ, তু এক বাগে কথা বুলা করিস আর এক বাগে হাসিস। ক্যানে গ?' মোতি আর একটা ছড়া কেটেছিল :

আম গাছকে আম নাই
য্যাতই ফাবড় মার হে
তোমার দেশের আমি লই
য্যাতই চখ ঠাব হে।

উ ছড়াটি বুলা করেও মোতি খুব হেসেছিল। পাঁচুর বুকের ভিতর যেন বড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, 'ক্যানে গ ছোট বউ, তু কি আমার লয় বটে?'

মোতি বলেছিল, 'উ ত আমার কপালের লিখন গ পুনির বাপ, আমি তোমার ছোট বউ বটো।'

'তবে উ কথা ক্যানে বলচু?' পাঁচু মোতির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

মোতি হেসে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'ক্যানে ম্যানে জানি নাই। মনে এল্য, বুলো দিলম।' বলে কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

পাঁচু মনে মনে মোতির কথাই আউড়েছিল, আম গাছকে আম নাই / য্যাতই ফাবড় মার হে / তোমার দেশের আমি লই / য্যাতই চখ ঠার হে। ক্যানে গ ছোট বউ, তোর গাছকে ফলের অভাব কী? তু আমার ছোট বউ বটে, তোকে কি চখ ঠেরো্য ধরে রাখতে লাগবেক? পাঁচুর ত ভিতর বাগে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়, মোতির মনের হাল হদিস হাতড়ে পায় না। বুকের ঠায়ে থেকেও ছোট বউ যেন কতো দূরে থাকে। উয়ার হাসি দেখে মনে হয়, দূর আকাশের মেঘে বিজলায়।

হঁ, অই হে লদকাদার, মনের ভিতর বাগের অন্ধকারে ছোট বউয়ের মনের হদিস খোঁজ কর, তবু সাঁজবেলাতে আঁকুড়্যা-বৌটদের খোলা দরজা তোমাকে রোজ, ভরনার মাকুর মতো ফাবড়িয়ে নিয়ে

যায়। ক্যানে? না, সোনাব পিতিমেখানি শিয়ড়চাঁদার রূপ ধরে, চন্দ্রবোড়াটির গায়ে জড়াজড়ি করে শঙ্খ লাগা করে। ওস্তাদের ঘরকে সারাদিন লসকার কাজ কর, আর শিয়ড়চাঁদার সঙ্গে লসকায় লসকায় ভরে দাও। টুকি নিজেই বলেছিল, 'আমাকে লসকায় ভবা দিয়া কর।'

'কিসের লসকা উটি? নাম কী উয়ার? হঁ, এদানি টুকিও যমুনার বাঁধকে ঘাট নাওয়া করতে যায় না। ক্যানে? শ্রাবণ মাসের শেষে টুকি পাঁচুব একখানি হাত টেনে নিজের তলপেটে রেখে বলেছিল, 'কিছু বুঁইতে পারছ কী গ লসকাদার?'

পাঁচু অবাক হয়ে পিতিমের পায়রার গায়েব মতো গরম তলপেটে হাত বেখে বলেছিল, 'না. কিছু বুঁইতে লারছি। কী হইচে উখানকে?'

টুকি হাসতে হাসতে পাঁচুর হাতখানি বুকে তুলে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফাস করে বলেছিল, 'উ আইচে গ লসকাদার, তোমার লসকা আমার পেটে। মা মনসার পূজা দিয়া করচি আমি, এখন তুমি পায়ে রাখো।' বলে, উপুড় হয়ে পাঁচুর পায়ে মুখ রেখেছিল।

পাঁচু তাড়াতাড়ি টুকির মুখখানি তুলে, উয়ার কানটানা চোখের দিকে তাকিয়েছিল। অই, কী কর গ। তারপরে দেখেছিল উয়ার সারা গায়ের দিকে। নতুন কিছু তার চোখে পড়েনি। মোতির বেলায়ও কখনো সে ধরতে পারতো না, কিন্তু মাস না যেতেই মোতি বলতো, অই, পেটের ভিতর আর একটা জ্বালাইতে আইচে গ। ...মোতির বাখান টুকুস আলাদা। পাঁচু জিজ্ঞেস করতো, কী করে বুঁইলি? মোতি হেসে বলতো, মাসকাবারি বন্ধ হয়্যা গেইচে।

হঁ, উয়াকে বলে, মাসে মাসে অমবস্যা, তারপরে শুক্লপক্ষের

প্রথমাতে চাঁদের উদয়। উ চাঁদখানি শুক্লপক্ষে দিনে দিনে বাড়ে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না।

টুকি আরও বলেছিল, 'আমি আর বাঁধকে যাব নাই, ঘাট নাওয়া সব কিছুই আঁকুড় বনে আর ঘরে। অই গ লসকাদার, তুমি আমার ধম্ম রক্ষা কর্যেচ, এখন সগলে জানবেক, আমি বিটিছেল্যা বটে।' বলতে বলতে উয়ার চোখের তারায় বিজলি ঝিলিক, কিন্তু দ্যাখ, চোখের কোণে মেঘের কোলে টুপ টুপ বৃষ্টির ফোঁটা টুপায়।

হুঁ, পাঁচুর বুকের ঢেউয়ে রাজহাঁসটির মতো পাখা মেলে, মুখ ডুবিয়ে টুকি আরও বলেছিল, 'অই লসকাদার, তাঁতীঘরের বউ কুনকালে বালুচরী গায়ে লিতে পারে নাই। তোমার মুখ্যে শুন্যেচি, তোমার ওস্তাদের বউ বিটি বিটার বউরা ইস্তক কেউ বালুচরী গায়ে ল্যায় নাই। ও, শুন লসকাদার, আমি যখন বাপের ঘরকে সাধ খাবক, তখন তোমার তাজমল লসকার বালুচরী গায়ে লিয়ে খাবক। দিবেক কি গ?'

এমন জগত ছাড়া কথা পাঁচু কখনো শোনেনি। তাঁতী ঘরের বউ বালুচরী পরতে চায়? হুঁ, লসকাদারে লসকা করে, বানিদারে বুনা করে, তারপরে তা কোথাকে যায়, কাদের অঙ্গে শোভে, উয়ারা বুলত্যে পারে নাই। তবে, আগে যেমন বাদশা ছিল, এখনো আছে, ওয়াদের বেগমরা আছে। বাদশাদের হাতের মুঠোয় নাকি বিস্তর টাকা। বেগমদের চোখের ইশারায় বাদশাদের মুঠো খুলে যায়। উ বেগমদের অঙ্গে নাকি বালুচর শোভে। কিন্তু বিষ্টুপুরের তাঁতী ঘরের বউকে কেউ কোনোদিন বালুচরী পরতে দেখেনি। ওস্তাদ দু দুখানি কোঠা ঘর তুলেছে, কিন্তু ঘরকে একখানিও বালুচর তুলতে পারেনি। বালুচরী বালুচরে আছে, উয়ার ঠিকানা তাঁতী লসকাদার জানে না।

'ক্যানে গ লসকাদার, তোমার পিতিমের গায়ে কি বালুচরী মানাইবেক নাই ?' টুকি পাঁচুর বুক থেকে সরে এসে, পাখা মেলে দিয়ে বলেছিল।

চন্দ্রবোড়ার দুই চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠেছিল। 'হুঁ, ই অঙ্গে বালুচরী মানাইবেক নাই ত কোন অঙ্গে মানাইবেক ? কিন্তু শুন গ পিতিমে, আমি গরীব লসকাদার। একখানি তাজমোল লসকা বালুচরী হাজার টাকা দাম। লসকা জানি, বানি জানি, টাকা দেখি নাই।'

'উ সব কথা শুনতে চাই না গ লসকাদার। তাজমোল না হকগা, তোমার লতুন লসকার শাড়ি একখানি আমাকে বুনা কর্যে দিবেক, উটি গায়ে লিয়ে আমি সাধের সাধ খাবক।'

হুঁ, উটি করা যায় বটে। ঈশ্বরদাসের যতগুলান চাই, উয়ার বেশি আর একখান বুনা করা চলে। কেউ জানতে পারবেক নাই। পাঁচু রাজহাঁসের মেলে ধরা পাখা দুখান ধরে, নিজের গলায় জড়িয়ে বলেছিল, 'হুঁ, দুব গ পিতিমে, দুব। তুমি বালুচরী পরে সাধ খাবেক।'

হুঁ, ইয়ার মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। যোগেন কোতলপুর থেকে ফিরে এলো শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। ভাদ্রমাসের পয়লা বাইরে থাকতে নাই। তাঁত ঘরের কাজ দেখবার জন্য তার লোকজন আছে। অন্দরে আছে এক বিধবা বুড়ি পিসী। কানে ভালো শুনতে পায় না, চোখে ভালো দেখতে পায় না। আর একজন আছে, সেও বিধবা। যোগেনের সম্পর্কে জ্ঞাতি ঘরের দাদার বউ। ছিল কড়ের্ঁাড়ী, এখন বয়স প্রায় চল্লিশ, বিটা বিটি নেই। যোগেনের সংসারে গোয়াল থেকে সব কাজকর্ম করে। ঘরের আসল মালিকানী

ট্রাক। জ্ঞাত ঘরের জায়ের সঙ্গে তার মাখামাখি ভাব। ট্রাক আর পাঁচু লসকাদারের ব্যাপার-স্যাপার সে যেন দেখতে পায় না। ঘোমটা টেনে থাকে। টুকি তাকে দিদি ডাকা করে। বলতে পারো, আসলে সখী। পিসীকে নিয়ে এমনিতে কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু সাঁজ-বেলায় প্রায়ই বলে, বউ, যগীন এল্য কী? ক্যানে এমন জিজ্ঞেস করে? না পিসী বলে, যগীনের গন্ধ পাইচি যেন।···হুঁ, লসকাদার ঘরকে এলেই, পিসী নাকে গন্ধ পায়। পিসীর আর কোনো সাড় নেই, গন্ধে সাড় আছে। পুরুষ মানুষের গন্ধ, ওর সঙ্গে চেলা মূলার গন্ধ।

হুঁ, ছোটঠাউরদা বলেছিল, কুন মাগীর এমন বুকের পাটা দেখি নাই। কথাটি জবর বুল্যা করেছিল। ক্যানে? না, যোগেন ফিরে আসার পরেও, টুকি সাঁজবেলাতে চন্দ্রবোড়ার যাতায়াতের সময় পথে উঁকিঝুঁকি ডাকাডাকি কিছু করতে বাকি রাখেনি। হুঁ, শিয়ড়-চাঁদার ডাক, চন্দ্রবোড়া বিষে দপদপ করে। উয়ার ভয় ভিত নাই। ক্যানে? না, যিয়ার সঙ্গে মন বেঁধেছে, পান গেইলেও ছাড়বক নাই।

কিন্তু ভাদ্র মাসের পাঁচ তারিখে, রাত্রে ঘটনা ঘটলো বাউরি-পাড়ায়। বাউরিপাড়া তখন জমজমাট। ইদিকে উদিকে টেমি লণ্ঠন জ্বলছে। গুচ্ছ গুচ্ছ বসে সবাই চেলামূলা গিলছে। ই সময়ে যতো ঘুগনিওয়ালা, তেলেভাজার ফিরিয়ালা, চানাচুরের টিন কাঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উয়াদের বিচা কিনা ভালো জমে, চেলামূলা গিলা ওয়ালা-দিগের কাছে। ই সময়টিতে ভয় কেবল আবগারি পুলিশদের।

গোগার ঘরের নিচু পিড়ার সামনে, চটের ওপর বসে, ছোট-ঠাউরদার সঙ্গে পাঁচু চেলা গিলা করচিল। নেশা বেশ জমে উঠেছে গোগার পাত্তা নেই, সুবলি দিয়া থুয়া করছে। তার মধ্যেই ঘরকন্ন

বিটাবিটিদিগে দেখা, সকলেব সঙ্গে হাসি কথাবার্তা চলছে। যতো ফিসফিস কথা আর হাসি, কুঞ্জ ঠাউব আর পাঁচুর মধ্যে। ছোট-ঠাউরদা খালি পাঁচুকে হাঁটু দিয়ে গুঁতা মারে, আর নিচু গলায় ফোঁসায়, 'বুল শালা, বুল ক্যানে, আজ কী করেচু? তোর রোপসী কী বুলা করলেক, বুল শালা।'

হুঁ, ফোঁসায় না, উ সবই হলো ছোটঠাউরদার জিগির করা। জিগির করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঁচু আর টুকির পীরিতের বাখান শোনা। অভিসারী পাঁচুব পীরিত-বৃত্তান্ত বলবার একমাত্র লোক ছোটঠাউরদা। আজও চেলা গিলার সঙ্গে উসব জিগির বাখান চলছিল। নেশা যখন জমে উঠলো, ছোটঠাউরদা পাঁচুর গেলাসটা টেনে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'শালা, পরের জমমে যেন তোর মতন অদ্ধপুত্তা হয়ে জমমাই র‍্যা পাঁচু।' বলেই লাফ দিয়ে উঠে কোমরে হাত দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো, আর চিৎকার করে গান গেয়ে উঠলো,

অই তু য্যাতই কর না পেট
আমার বাঁজা ভাতাব আছে ঠেস।

সুবলিই কেবল খিলখিল করে হেসে উঠলো না। আরও কেউ কুঞ্জা ঠাউরের নাচ দেখতে ঘিরে এলো। কিন্তু পাঁচুব মনটা বিজলাই উঠলো। ছোটঠাউরদা কথাটাকে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে। আসলে লোকে বুলা করে, তুই য্যাতই কর না পেট / আমার বুড়া আছে ঠেস। উ সব হলো বুড়া ভাতারের যোবতী বউয়ের জিগির বাখান। কিন্তু ঠাকুর বলছে, আমার বাঁজা ভাতার আছে ঠেস। সুবলিই হাসতে হাসতে বলে উঠলো, 'বাঁজা ভাতার কোথাকে পেলে গ ঠাউরকত্তা?'

পাঁচু জানে, টুকুস দূরেই গুপী বাউরির দরজায় যোগেন উয়ার দলবল নিয়ে চেলা গিলচে। সে তাড়াতাড়ি উঠে, ছোটঠাউরদার হাত টেনে ধরে বললো, 'অই ছোটঠাউরদা, কী করচা গ। বস বস।'

'বসবক ক্যানে র‍্যা শালা অদ্‌ধপুতা ?' ছোটঠাউরদা লাচ থামিয়ে বললো, 'আমার এখন লাচ গান করত্যে ইচ্ছা হইচে।'

পাঁচু হেসে ছোটঠাউরদাকে বসিয়ে, চেলার গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, 'পরে হবেক গ। আমার কথা টুকুস শুন।'

ছোটঠাউরের নেশা তখন, এক পা বাড়ালে সোনামুখী, দু পা বাড়ালে বাঁকুড়া। উয়ার মেজাজই আলাদা। গেলাসে ঝুপুস চুমুক দিয়ে বললো, 'তু শালা তাঁতীদিগের কথা রাখ। কথায় বলে, আবর তাঁতী গোবর খায় / মাগীর কথায় মরতে যায়।'

'অই, অই গ ছোটঠাউরদা, মাগী লয় গ, মাগের কথা বুল ক্যানে' পাঁচু প্রকৃত প্রবাদটি ধরিয়ে দিল।

ছোটঠাউরদা হেসে কিছু বলবার আগেই, যোগেন একেবারে ক্ষ্যাপা মোষের মতো টাল খেয়ে এসে দাঁড়ালো, 'কুন বরার বাচ্চা আমাকে উ কথা বুলা করেচে, আবর তাঁতী গোবর খায় ? অঁ, কুন বুন-মেগো, মা-মেগো ?'

ছোটঠাউরদা যেন অন্য মানুষ, সিরসিরিয়ে বললো, 'তু আমাকে গালি বকচু কী র‍্যা যগীন ?'

'তোমাকে ক্যানে গালি দুব ? আমি কি জানি নাই, কুন শালা আমাকে গোবর খাওয়া, মাগের কথা শুনাইচে ?' বলেই সে এক লাথি মারলো পাঁচুর চেলা ভরা গেলাসে। তারপরে কিছু বলবার করবার সুযোগ না দিয়েই, পাঁচুর পাঁজর ঘেঁষে কষালো এক লাথি 'শালা বরার বাচ্চা, বড় লসকাদার হঁয়েছু তু ?'

পাঁচু আনখা লাথি খেয়ে, খানিক দূরে ছিটকে পড়েছিল। উঠে দাঁড়াবার আগেই, যোগেন ছুটে গিয়ে আবার উয়ার পাছায় লাথি কষালো, 'শালা, তু আমাকে মাগের ভেড়ুয়া বলেচু!'

পাঁচু গোগার ঘরের পিছে, ডোবার ধারে মুখ থুবড়ে পড়লো। সবাই হই হই করে উঠলো, 'অই অই যগীন, শুন, পাঁচু একটাও রা কাড়ে নাই।'

উদিকে গ্যাখ, ছোটঠাউরের এক পা ফেলে সোনামুখী যাওয়া মাতলামি কেটে গিয়েছে, উ ইয়ার উয়ার পিছে গা ঢাকা দিয়া করচে। যোগেন তখন শিং বাগানো ক্ষ্যাপা মোষ, হাঁকোড় দিল, 'উসব কথা আমি শুনত্যে চাই না। আমি জানি, উ শালা মাগুনির বিটা আমাকে গালি বক্যেচে।' বলে সে অতি ভয়ংকর মারমূর্তি ধরে পাঁচুর দিকে ছুটে গেল।

পাঁচুও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। হঁ, উয়ার আংরা জ্বলা চোখ দুটোও এখন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো লাল। যোগেন ছুটে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই, সে দু হাত এগিয়ে মাথা নিচু করে ছুটে গেল। বাঁ হাতে মারলো যোগেনের নাকের ওপর, ডান হাতে পাঁজরে। বাজ হাঁকা করলো, 'শালা তু আমনাকে বড় বীর ঠাউরেচু?'

যোগেন এমন আনখা আক্রমণের আশা করেনি। নাকের আঘাতটা জোর চোট দিয়েছে। সে নাকে হাত বুলিয়ে, চোখের সামনে এনে দেখলো, রক্ত বেরাইচে। রক্ত দেখে সে যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো, 'অই শালা, তু আমার রকত বের করেচু? তু শালাকে আজ কাঁচা খাবক।' বলেই পাঁচুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁচুও তৈরি ছিল। প্রথমে যোগেনের ঘাড়ে গর্দানের মোটা মাংসে জোরে থাপ্পড় কষালো। তারপরে পা তুললো লাথি কষাবার

জন্য। যোগেন ঘাড়ে আঘাত পেয়ে, টেরে পড়ে যেতে গিয়ে পাঁচুর পা ধরে ফেললো; এক হ্যাঁচকা টানে, উয়াকে পেড়ে ফেললো মাটিতে। লাফিয়ে পড়লো বুকের ওপর, টিপে ধরতে গেল গলা। পাঁচু উয়ার পাছার ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে, দু হাতে দু হাত ধরলো। ইদিকে তখন গোটা বাউরিপাড়া, গোগার দরজায় ভিড় করেছে। সকলেই হই হই করছে, কিন্তু মল্লদেশের দুই মল্লবীর তখন মহারণে মত্ত।

হঁ, যোগেন পাঁচুর গলা টিপতে না পেরে, উয়াকে দু হাত দিয়ে বুকে পিটাই করতে লাগলো। পাঁচু মার খেতে খেতে শেষ চেষ্টা করে, যোগেনের পাছামোড়া পায়ের চাপে, উয়াকে কাত করে ফেললো। তারপরে ই উয়ার নিচে যায়, উ ইয়ার নিচে। খামচা-খামচি, জামা-কাপড় ছেঁড়াছেঁড়ি। দেখতে দেখতে, দুজনেই গড়িয়ে গিয়ে ডোবার জলে পড়লো। দুই কাড়ার লড়াই এখন কোমর ডোবা জলে। কাড়া নয় হে, জলে ঢেউ তুলে, ছিটকিয়ে লড়ে যেন দুই মত্ত হাতী।

উয়াদিগে ধর হে, জলে ডুবে্য মরবেক। বাতি আনা কর, বাতি আনা কর। নানা স্বরে নানা চিৎকার, পুলিশ আসবেক, অই গ তোরা উঠে আয়।

হঁ, যাদের বলা তারা তখন ডোবার জল তোলপাড় করছে। দু জনেরই চেষ্টা, কে কার মাথা জলে ডুবিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারে। পাঁচু বুঝতে পারছে, যোগেনের দশাশায়ী শরীরের ওজন বড় বেশি, উয়াকে সামলানো দায়। কিন্তু তার নিজের শরীর হালকা, সে পাঁকাল মাছের মতো বারে বারে পিছলে যেতে লাগলো। আর যোগেনের শরীরের ওজন উয়ার শত্রুতা করলো। নিচের পাঁকে কাদায়

পায়ের তাল সামলাতে না পেরে, বারে বারে শরীরের ওজন নিয়ে জলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। পাঁচু তাক বুঝে উয়ার চুলের মুঠি চেপে ধরে জলে ডোবাবার চেষ্টা করলো। চুবানি খেতে খেতে, শরীরের ওজন নিয়ে, যোগেন হাঁপিয়ে পড়লো। পাঁচু ক্রমে ক্রমে ডোবার ধারে, ডাঙায় সরে যেতে লাগলো। তবু ছাখ, যোগেন যেন জেদী মাছমারার মতো পাঁচুকে জলে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে ক্রমে তার শরীর অবশ হয়ে এলো। এখন আর তার গলায় হাঁকোড় নেই, ফ্যাস ফ্যাস করে বলছে, কোথাকে গেল শালা, অঁ—কোথাকে? সে ডাঙার ওপরে ভিড়ের দিকে ফিরে দু হাত বাড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলো, অই বদনা, শালা পলাইচে। আমাকে ধর।

তালগাছের মতো লম্বা শিড়িঙে, মাথায় বাবড়ি চুল, যোগেনের চেলা বদনা জলে নেমে এল। না, পাঁচু পলায় নাই, উ তখন বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে। 'হুঁ, পলাইচি না হে, আমি পাঁচু কীত। হেথাকে খাড়া রঁইচি। আমাকে মাগুনির বিটা বুল্যে আবার মারতে আয়, তোকে আর আঁক্যুড়া ঘরে ফিরে যেতে হুব নাই।'

'অই, অই গ পাঁচু দাদা।' সুবলি কোথাক থেকে ছুটে এসে পাঁচুর হাত টেনে ধরলো, 'ই বাগে দাঁড়াই রইচ ক্যানে। যাওগা, ঘরকে যাওগা।' বলে টানতে টানতে বেড়াবনের দিকে পাঁচুকে নিয়ে গেল, 'হুঁ, পা হাত কাটে নাই ত? এখনো আট দশখান চেলার বতল গোড়ার জলে ডুবাই রাখচি।' সুবলি নিজেই নিচু হয়ে পাঁচুর পা দেখলো, হাত তুলে দেখলো। 'না, পা কাটে নাই, কিন্তু গটা মুখে রক্তের দাগ। যাওগা, ঘরকে যেইয়ে ই পচা গোড়ার জলে ভিজা জামা-কাপড় ছাড়া করগা।'

পাঁচু গোঙানো স্বরে বললো, 'হুঁ, যাবকগা, সুবলি, তু আমাকে এক বতল চেলা দিয়া করগা।'

'হুঁ, তুব, তুব, ইখানেই থাক।' সুবলি বেড়াবনের অন্ধকার ঘেঁষে ছুটে গেল।

ইয়ার পর দিন থেকেই লোকের মুখে মুখে শোনা গেল, বাউরিপাড়ায় দেখ্যে এলম / কাড়া লড়াই লেগ্যেচ্যে, বাগে তুই শিং পড়্যেচে / রক্তে বান বয়েচে।···না, পাঁচুকে শুনিয়ে কেউ বলেনি। তাকে বলেছে ছোটঠাউরদা। পাঁচু বুঝেছে, যোগেন জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই, তাকে মারতে এসেছিল। ও একটা ওজর খুঁজছিল মাত্র। ক্যানে? যোগেন কি কিছু শুনেছে?

অই, সেই রাত্রে পাঁচুর মূর্তি দেখে মোতি শুধু কেঁদেছে। বিটা-বিটিদের তাঁত ঘর থেকে ভিতর বাড়ির ঘরে পাঠিয়ে, পাঁচুকে নিজেব হাতে, ইদারার ধারে নিয়ে গিয়ে, ধোয়া মোছা করেছে। গোটা মুখে যোগেনের খামচানো রক্তের দাগ মুছে দেয়নি শুধু; টেমি হাতে ঘরের বাইরে গিয়ে, দূর্বাঘাস ছিঁড়ে এনে, দাঁতে চিবিয়ে, উয়ার রস লাগিয়ে দিয়েছে। হুঁ, কাটা ঘায়ে মুখের রসও ওষুধের কাজ দেয়। জামা কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। পাঁচু চাইবার আগেই, চেলার বোতল খুলে, গেলাসে ঢেলে এগিয়ে দিয়েছে। পাঁচু বলেছিল, 'আমি ত উয়াকে কিছু বুলি নাই, আমার কি দোষ ছোট বউ?'

অই, মোতির গলার স্বরে জলের ঝাপটা, চোখে বিঁড়াইয়ের বান, 'দোষ কারু লয় গ, পুনির বাপ। ই তোমার লসকার মতন। যেমনটি গড়বেক তেমনটি বুনা হবেক।'

পাঁচু মোতির কথাগুলান মনে মনে আউড়িয়েছিল। মোতি কি কর্মফলের কথা বলেছিল? কিন্তু তারপরেই মোতির মীনা মাকুটানা ভিজা চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলে উঠেছিল, 'ত পুনির বাপ, আমি যদি কাছকে থাকতাম, তবে উ যোগিন খাঁসীটার গলায় দাঁত বিঁধা করো্য উয়ার রক্ত খেতম।...'

বলেই আবার হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

হঁ, মোতিকে বুঝা যায় না। উয়ার হাসি কান্না রাগ কখন কোন বাগে চলে, পাঁচু সব সময় বুঝতে পারে না। পারলো না টুকিকেও। বাউরিপাড়ার ঘটনার পরে কয়েকদিন পাঁচু আঁকুড়্যা বীটদের ঘরকে যায় নাই। ক্যানে? না, দরজা খোলা থাকে না। কিন্তু চন্দ্রবোড়াটা ফোঁস ফোঁস করে, ফুলে ফুলে ওঠে। তারপরে একদিন যখন দরজা খোলা পেল, পিতিমেকেও সেদিন দেখা গেল। অথচ সে পাঁচুর হাত ধরে বাড়ির ভিতর বাগে নিয়ে গেল না। ক্যানে? উয়ার বুকের পাটা কি ধস্যে গেঁইচে?

না গ লসকাদার, উয়াকে আমি মানি না। টুকি বললো, আমি দুতলার পুবের নারাণের ঘরকে থাকি, বঁটি থাক্যে আমার কাছকে। উ আমাকে ছুঁত্যে এল্যে, গলায় বঁটির চোপ দিয়া করবক। উ কাড়া বলদটা তোমার সঙ্গে লড়ত্যে যায়, আমাকে ডরায়। কিন্তু লসকাদার, তুমি আর এস্য নাই গ।

পাঁচু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ক্যানে গ পিতিমে?

টুকি পাঁচুর বুকে হাত রেখে বললো, আমার ডর লাগে লসকাদার। তুমি আমার কাছকে এল্যে আমার পেটের ছানাটা লষ্ট হয়্যা যাবেক।

পাঁচু এমন অবাক কথা কখনো শোনেনি। পোয়াতি বউ

নিয়ে সে পনর বছর ঘর করছে। মোতি বিয়োবার পনর বিশ দিন আগেও পাঁচুর কাছে রাতে শুয়েছে। উয়ার ভরা পেটের ছা নষ্ট হয়নি। টুকির তো তিন মাসও হয়নি। সে হেসে বললো, 'উ তোমার মিছা ডর গ। পেটের নাড়ির ধন কি এত সহজে নষ্ট হয়?'

না না, লসকাদার, মিছা ডব লয়। টুকি পাঁচুব কাছ থেকে দু পা সবে গিয়ে বললো, আমার জ্ঞাতি ঘরের জা আমাকে বুলা কবেচে খালাস না হওয়া তক, তুমি আমার কাছকে এস্য নাই। ই ধন গেল্যে আমি আর পাবক নাই গ। বলতে বলতে টুকি উঠান পেরিয়ে চলে গেল।

হুঁ, ই কি জীবনের ধর্ম হে। উয়ার সব কিছুই কি আনখা বাগে চলে? না, টুকি তার সঙ্গে ঘুগিগিরি করে নাই, উটি উয়ার ভয়, ধর্ম বিশ্বাস। অই, যে-টুকি পাঁচুকে একদিনের তরে ছাড়তে চায় নাই, পেটেব নাড়ির ধন বাঁচাবার জন্যে, সে তার লসকাদারকে বিদায় করে দিচ্ছে। এও এক লসকা বটে।

ইয়ার পরেই দেখতে দেখতে শিয়াল শুকনি পরব এসে গেল। ভাদ্র মাসের জীতাষ্টমীতে শিয়াল শুকনি পরব। মোতি, পুন, সোনা, নোটো সবাই মিলে মাটির শিয়াল শুকনি গড়লো। নিয়ম হলো, ই দিনটিতে তাঁতী বউ বিটা বিটি সঙ্গে লিয়ে শিয়াল শুকনি যমুনা বাঁধের জলে ভাসাবে। ভাসিয়ে বিটা বিটি বউকে নিয়ে নাওয়া ধোয়া করে, উখানকে বসেই শশা মুড়ি খাবেক। তারপরে ঘরে ফিরবেক। ই দিনটিতে তাবত তাঁতীর তাঁত বন্ধ।

হুঁ, ছ্যাখ, জীবন কেমন আনখা বাগে চলে। যমুনায় যাবার আগে মোতি বললো, তুমি বিটা বিটিদিগে লিয়ে যমুনায় যাও, আমি যাব নাই।

ই কী বলচু গ ছোট বউ? পাঁচু যেন আকাশ থেকে পড়লো, ই কখনো হয়? তু ই ঘরকে আসার পরে, কুন শিয়াল শুকনির পরবে, তোকে ছাড়া যমুনা গেঁইচি?

মোতির মুখে যেন এক অচেনা হাসির লসকা, যাও নাই, ই বছরে যাও পুনির বাপ। আমি যমুনায় যাব নাই। বলতে বলতে উয়ার হাসি মুখখানি কেমন শক্ত হয়ে উঠলো।

হঁ, মোতির সেই কথাটি মনে পড়লো, কাঁধের গামছা কাঁধকে রইল, নিংড়াতে গ পেলাম নাই।···পাঁচু তবু মোতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মোতি কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বললো, বাবাকে সঙ্গে লিয়া যেইও।

পাঁচুর বুকের ভিতর বাগে একটা মোচড় লাগলো। বিটাবিটি-গুলান উয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কেবল পুনি মনে মনে বলছিল, যাবকগা, চল্যে যাবকগা।···পাঁচু বললো, যা সনা, তোর কত্তাদাদাকে ডাকা করে লিয়ে চল যাই।

হঁ, তাঁতী ঘরের বিটি মোতি, তাঁতী ঘরের বউ, উয়ার কাছে কি আজ পরবের দাম নেই? পাঁচু বাপ বিটা বিটিদের লিয়ে যমুনার বাঁধে এলো। মাধবগঞ্জের যাবত তাঁতী বউ বিটা বিটি সঙ্গে শিয়াল শুকনি ভাসাতে এসেছে। অই, ছ্যাখ গ, টুকি যোগেনের সঙ্গে শিয়াল শুকনি ভাসাতে বাঁধকে আইচে। যেন আঁকুড়্যা বাটদের ঘর থেকে বড় একখানি মিছিল নিয়ে এসেছে। সঙ্গে বিস্তর লোকজন। উয়াদের মাঝখানে টুকি, মাথায় লাল পাড় শাড়ির ঘোমটা। যোগেন যেন পিতিমের পাহারাদার। না, টুকি পাঁচুর দিকে ফিরে দেখলো না। সোহাগীটি আমনার মনে হাসি মুখে চলেছে।

পাঁচু দেখতে পেল না, তার চোখের দিকে তাকিয়ে পুনির চোখের

লসকা বুটি ছুটো ভিজে উঠছে। পাঁচু বিটাবিটিদের সঙ্গে মাটির শিয়াল শুকনি জলে ভাসালো। বাপকে ধরে নাওয়ালো। তারপরে বিটা-বিটিদের লিয়ে নিজে নেয়ে, ধোয়া জামা-কাপড় পরে, গাছতলায় বসে শশা মুড়ি খেতে বসলো।

অই পাঁচু, আমি তোর ঘর থেক্যা ইখানকে আইচি। ওস্তাদের বড় ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে দাঁড়ালো, বাপের নিদান আইচে র‍্যা পাঁচু, তোকে একবার দেখতে চায়।

পাঁচু শশা মুড়ি ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওস্তাদ মারা যাঁইচে? অই, ই কি আনখা বাগে দিন চলে গ? সে একবার নিজের বাপের দিকে দেখলো। না, উয়ার কোনো খেয়াল নেই। মুখের ভিতর মাড়ি দিয়ে শসার টুকরো বাগাচ্ছে। ছুই কষে লালা গড়াচ্ছে। পাঁচু বললো, অই র‍্যা সনা পুনি, তোরা শশা মুড়ি খেয়্যা ঘরকে যা, আমি ওস্তাদের ঘরকে যাইচি। সে অবিনাশের সঙ্গে ছুট দিল।

হুঁ, পাঁচু ভেবেছিল, শিয়াল শুকনি পরব সেরে, ওস্তাদের ঘরকে গিয়ে, উয়ার শোষ ঘা ধোয়া মোছা করে ওষুধ লাগাবে। ইয়ার মধ্যেই নিদানকাল উপস্থিত। পাঁচু যখন ওস্তাদের বাড়ি ঢুকলো, দেখলো, ওস্তাদকে তার বিছানায় বাইরের পিড়ায় শোয়ানো হয়েছে। বিটারা, বিটার বউয়েরা, লাতী লাতীনরা সব ভিড় করে ঘিরে আছে। বড় বউদি একখানি কোষায় করে, ওস্তাদের ঠোঁটের কষের ফাঁক দিয়ে টুকুস টুকুস জল দিয়া করচে। আর বুলা করচে, 'হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে... ।'

পাঁচুকে দেখে সবাই উয়ার পথ করে দিল। হুঁ, ওস্তাদের চোখ ছুটো আধ খোলা, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হঁইচে। পাঁচু মাথার কাছে বসে, নিচু হয়ে ডাকলো, আঁজ্ঞা, আমি পাঁচু আইচি আঁজ্ঞা। বলতে

বলতেই উয়ার গলা ধরে এলো, তবু বললো, হুঁ, এমন আনখা কোথাকে চললেন আঁজ্ঞা ? আমার লসকাখান যে হয় নাই। দেখে যাবেন নাই আঁজ্ঞা ?···উয়ার গলা বন্ধ হয়ে গেল, চোখের জলের টলটলানিতে দেখলো, ওস্তাদের মুখখানি কাঁপছে।

ওস্তাদের চোখের আধখোলা পাতা টুকুস খুললো। বিছানায় পড়ে থাকা ডান হাতখানি একবার নড়লো। ঠোঁট নড়লো, কিন্তু ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। পাঁচু নিজেই ওস্তাদের ডান হাতখানি হাতে নিয়ে নিজের মাথায় রাখলো। আর তখনই যেন ওস্তাদের গলায় স্পষ্ট শোনা গেল, অঁই এয়েচু র‍্যা ! পাঁচু···। বলতে বলতেই বুকটা যেন বড় উঁচু হয়ে উঠলো। গলার শিরাগুলো কাঁপতে কাঁপতে থির হয়্যা এলো আর উঁচু হয়ে ওঠা বুকখান আস্তে আস্তে নেমে গেল। চোখ দুটো রইল তেমনি আধ খোলা।

বড় বউদি ফুঁপিয়ে উঠলো, অই গ, বাবা বোধায় যাত্রা করলেক।

পাঁচু দেখলো তার মাথায় রাখা ওস্তাদের হাত গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করলো না। ক্যানে ? না, গলায় স্বর নেই, কেবল গুঙিয়ে বললো, হুঁ, ই কি আনখা চল্যে যাঁইচেন আঁজ্ঞা, কোথাকে যাঁইচেন আঁজ্ঞা !··· লাতী লাতীন বিটার বউয়েরা সবাই চিৎকার কবে কেঁদে উঠলো।··

পাঁচু কাছা ধারণ করলো না বটে। পায়ে জুতো পরা ছাড়লো। ঘরে নিরামিষ খেল। চেলামূলা খেল নাই। হুঁ, আজকাল তাঁতী ঘরেও কেউ এক মাস অশৌচপালন করে না। পনেরো দিনেই শ্রাদ্ধশান্তি মিটায়। ওস্তাদ মারা যাবার তিনদিন পরেই অবিনাশ পাঁচুকে ডেকে

বললো, শুন র‍্যা পাঁচু। তোর লসকার মালপত্তর গুলান তোর ঘরকে লিয়ে যা। বাপই য্যাখন গেলেকগা, উসব পাট আর রাখব নাই।

পাঁচুর বলবার কিছু নেই। কথাটাও ঠিক। ওস্তাদই যখন নেই, তখন আর তার ঘরে পাঁচুরই বা কাজে মন বসবে কেমন করে। ওস্তাদি তো আর কোনোদিন ঘরের বাইরে এসে পাঁচুর কাজ দেখবে না। সে কয়েক খেপে বড় ঘরকাটা কাগজের লসকা পাটা, জালিপাটা মগুর টবনা পাকিং বাকসা সব বই করে নিজের তাঁত ঘরকে এনে তুলা করলো। তার বাপ জগতবুড়ার কদিন ধরে কী হয়েছে, আর তেমন ইয়াকে উয়াকে ডাকাডাকি করে না। থেকে থেকে গোঙানো গলায় গলা ফাটিয়ে গান করে! 'লসকার ফুল ফুটবেক আমার সেই লদীর কূলে। যখন চার কাহারে লিয়ে যাবে হরি বল বল বুলো।'...

হুঁ, লসকার ফুল ফোটবার এমন গান বাপ কখনো গায়নি।

ওস্তাদের শ্রাদ্ধের পাঁচ দিন আগে, ঈশ্বরদাসের গদী থেকে উয়ার চাকর লক্ষ্মণ ডাকা করেছে, কী নাকি কাজের কথা আছে। বেলা তখন অনেক। কিন্তু ঈশ্বরদাসের ডাক শুনলে বসে থাকা যায় না। উয়ার ডাক মানেই, নতুন কাজ। পাঁচু মোতিকে বলে গেল, দেবি হল্যে তোরা খেয়্যা লিস গ!...

ঈশ্বরদাস সামনের গদী ঘরের ভিতর বাগে আর একখানি ঘরে, তক্তপোশের গদীতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। পাঁচু দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, ডাকা করচেন আঁজ্ঞা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বস পাঁচু। ঈশ্বরদাস সোজা হয়ে বসলো।

পাঁচুদের বসবার জায়গা মেঝেতে। সে উপুড় হয়ে বুকের কাছে হাত রেখে বসলো। ঈশ্বরদাস বললো, তোমাকে একটা সুসংবাদ দিই হে পাঁচুবাবু। আমাদের গদীতে তোমার তাজমহল নকশার বালুচরী

একখানিই মাত্র ছিল। কলকাতার গদীতে বিক্রিব জন্য পাঠাব ভেবে-ছিলাম। কিন্তু উদয়ভিলা থেকে শাড়িখানি চেয়ে পাঠিয়েছে। বোমবাই মিউজিয়ামে শাড়িটি রাখা হবে। তোমাব নামটাও থাকবে।

হুঁ, সুসংবাদ বটে। ওস্তাদ নেই। কাকে শোনাবে! তবু পাঁচু হাসলো। সে মনে মনে একবার ভেবেছিল, শাড়িটা গদী থেকে চুবি কবে টুকিকে দেবে। শাড়িটা কোথায় রাখা আছে, সে জানে।

এব জন্য তোমাকে আমি বাড়তি একশো টাকা দেব। ঈশ্বরদাস বললো আর উয়ার সামনে পিতলের বাটায় রাখা, কী সব মশলা লিয়ে মুখে দিল, হ্যাঁ আর ওই নতুন যে নকশাটা করছো ওটা আর করো না। বন্ধ কবে দাও।

পাঁচুব বুকে যেন সাপে দংশন কবলো, আজ্ঞা?

হ্যা, ওসব বাল্চরী শাড়িটাড়ি আজ কাল আর লোকে কিনতে চায় না। ঈশ্ববদাস মশলা চিবোতে চিবোতে বললো, পড়তায় আসে না, দাম বেশি। ছোটখাটো নকশা হলে আজকাল ম্যাকসির জন্য বোনা যায়। ও কাজটা তুমি বন্ধ করে দাও, আর দরকার নেই।

পাঁচুব মনে হলো, উয়ার বুকের রক্তে বিষে জমাট বেঁধে যাচ্ছে, বললো, আঁজ্ঞা জালিপাটার কাজ পেরায় শেষ কর্যে লিয়ে আইচি এখন—।

সে তোমার মালের খরচটা আমি দেব। ঈশ্বরদাস বললো, নকশার দাম তো দিতে পারব না, ওটার আর দরকার নেই। সে মুখ নেড়ে নেড়ে মশলা চিবিয়ে আবার বললো, তবে নাইলন টেরেলিনের ওপরে কিছু নকশার কাজ করা যাবে। সে পরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, খাবার সময় হলো, তুমি এখন যাও পাঁচু।

পাঁচু উঠে দাঁড়ালো। গদীর বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু

একটা গোটা সাজানো তাঁত এলোমেলা ভেঙে পড়লে যেমন হয়, উয়ার সেই রকম মনে হলো। অই, জীবনের আনখা বাগে চলারও একটা নিয়ম নাই, নাই কী? ভাদ্র মাসের আংরা জ্বলা রোদে, ভূত-গ্রস্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে পাঁচু ঘরে ফিরলো। তাঁতঘরে বাবা তালাইয়ের ওপর ঘুমাচ্ছে। মোতি চরকায় নলিতে মীনা ভরাচ্ছে। বিটা বিটিরা কেউ নেই। অজাটাও বাইরে গিয়েছে।

পাঁচু ঘরে ঢুকে, নতুন লসকার জালিপাটাগুলানের সামনে এসে দাঁড়ালো। মোতি পাঁচুকে দেখছিল। দেখতে দেখতে আনখা উয়ার বুকটা কেঁপে উঠলো। ঝটস্যে উঠে পাঁচুর সামনে এসে দাঁড়ালো, অই গ পুনির বাপ, কী হঁইচে? তোমার মুখখান এমন বিষপোড়া দেখাইচে ক্যানে?

পাঁচু মুখ না ফিরিয়ে বললো, হঁ ছোট বউ, আমি বিষ খাইচি।

মোতি পাঁচুর বুকের জামা টেনে ধরে মুখের দিকে তাকালো, উয়ার মীনা মাকুটানা চোখ ভয়ে বিজলাইচে, কী বুলচ্য গ? কী হঁইচে বুল ক্যানে? কী হঁইচে?

পাঁচু বললো, ঈশ্বরবাবু ই লসকাটা বানাইতে বারণ করলেক, উয়ার আর দরকার নাই। বালুচরী আর চলচে নাই। সে মুখ ফিরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালো, কোথাকে চল্যে গ্যালেন আজ্ঞা। ই লসকাটা ক্যানে লিয়া গেলেন নাই?...পাঁচুর গলার স্বর যেন টুপুস করে জলে ডুবে গেল।

মোতি পাঁচুর দু হাত টেনে বললো, বস পুনির বাপ, টুকুস বস।

পাঁচু বসলো। জালি পাটাগুলানের গায়ে হাত দিল। গোটানো লসকার কাগজখানি বুকের কাছে টেনে নিল। মুখ না তুলে বললো ছোটবউ, তু কি আমাকে ভুল্যে গেইচু গ?

মোতি মুখ এগিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে ভুলব ক্যানে গ? উ কি হয়? উয়ার মীনা মাকুটানা চোখের কোলে বুটি লসকাব মতো জলের ফোঁটা টলটলিয়ে উঠলো।

জানি নাই গ ছোটবউ। পাঁচু বললো, তো, আমি আমনাকে ভুলতে লারছি। ওস্তাদ বুলা করত, ছাখ র‍্যা পাঁচু জেবনে সুখ আস্যে দুখ আস্যে। কিন্তু তু থামতে লারবি। হঁ, আমি থামতে লাবনক, থামতে লারবক ছোটবউ। থান বুনা করবক। খটখটি তাত চালাবক, কিন্তু হঁ, ই লসকার শাড়ি আমি বুনা করবক। ক্যানে? না ·। বুক জলে দাঁড়িয়ে যেন পাঁচুব মাথা ডুবে গেল। স্বব শোনা গেল না। কেবল কানে বাজতে লাগলো, হঁ, বড় সোন্দর এঁকেচু র‍্যা পাঁচু, বড় সোন্দর লসকা হঁইচে।···

হঁ, জীবন বড় আনখা বাগে চলে, তুমি থেমে থাকতে পাব নাই। চল হে লসকাদার, চলত্যে হবেক। জীবনটা বুনা হইচো, টানাভরনায় বুনা হঁইচে। জীবন বুনে চল্ রই হে, জীবন বুনে চল্ রই।

—